ভূমিকা

সাহিত্য, সংগীত এবং অন্যান্য শিল্প মানুষের মনকে নন্দিত করে। মানুষের মনকে যা নন্দিত করে, তাই নন্দন। মানুষ প্রকৃতির জগতে একদা ছিল অসহায় জীব, সদা ভীত, শুধু ক্ষুন্নিবৃত্তি ও আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত। তারই মধ্যে ধীরে ধীরে প্রথম সৌন্দর্য চেতনার উন্মেষই মানুষের মনকে উন্নীত করেছিল। সংগীত, সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্পসৃষ্টি সেই সৌন্দর্য চেতনারই অভিব্যক্তি। তার বিভিন্ন রূপ, রূপাধার ও ক্রমবিকাশের পথই নন্দনতত্ত্বের বিষয়।

উল্লিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করার সময়ে পূর্বসুরীদের মতামতগুলি কখনও আংশিকভাবে, কখনও বা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছি, বিশ্লেষণ করেছি। সে ক্ষেত্রে তাঁদের দেশ বা কালের বিচার করিনি, যে ক্ষেত্রে যাঁর মতামত গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে বিনা দ্বিধায় সেই মুহূর্তে তা গ্রহণ করেছি।

আমার তৃতীয় অধ্যায়টির অন্তর্ভুক্তি অনেকের কাছে নূতন মনে হতে পারে বা বিস্ময়কর লাগতে পারে।

শিল্প বা প্রধানত সংগীতের মাধ্যমে যে ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয় সেই শিল্পসৃষ্টির উৎস কোথায়, মনের গহনে, নাকি মনের বাইরে, নাকি মন এবং দেহের মধ্যবর্তী কোনও স্থানে অথবা জন্ম জন্মান্তরের প্রতিভাই কি কোনও বিশেষ মুহূর্তে এই ব্যঞ্জনা সৃষ্টির অধিকারী হয় ; কেননা হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী আত্মা অবিনাশী, প্রতিভাও হয়ত সেই ধারাতেই প্রবহমান, একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে গিয়ে হয়ত তার পরিসমাপ্তি ইত্যাদি নানা তথ্যের বিন্যাস ঘটেছে আমার এই অধ্যায়টিতে।

আমি আশা করি, সংগীত ও শিল্পানুরাগী প্রত্যেকেই এই বই পাঠ করে নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে আগ্রহান্বিত হবেন, এবং তাহলেই আমার এই বইয়ের সার্থকতা।

ডঃ সুধীর নন্দী, প্রেসিডেন্সী কলেজের দর্শনের অধ্যাপক এই পথে আমাকে এগিয়ে দিয়েছেন—প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োজনমত তাঁর সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড আমার বইটি সুচারুরূপে ছেপেছেন। এই সংস্থার পরিচালকবর্গ ও তার কর্মীবৃন্দকে আমার ধন্যবাদ জানাই।

ছোটমাসীর স্মরণে

বিষয় সূচী

প্রথম অধ্যায়

শিল্পের নন্দনতাত্ত্বিক স্বরূপ, শিল্প হিসাবে সংগীতের আত্যন্তিক ধর্ম

জগতে বুদ্ধিবৃত্তির অস্তিত্ব যেমন উপেক্ষণীয় নয় তেমনই এক সর্বশক্তিমান মহাকালের অস্তিত্বকেও আমরা কেউই উপেক্ষা করতে পারি না। সংগীত কিন্তু সবার্থসাধিকাব মতই এই উভয়বিধ অস্তিত্বের পূর্ণতা সাধন করে চলে।

সংগীতের তত্ত্ব এবং তার সাধনা বহুযুগের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মিলন সাধনা।

সংগীতের সৃষ্টিতত্ত্বে প্রাচ্যজগতের বা ভারতবর্ষের সংগীতবিদেরা লয়, ত্রিসপ্তক, ছন্দ, তালকে একটি বৃত্তে সংগঠিত করেছেন। যার মধ্য দিয়ে কোন না কোন সংগীতের ধারা বা ঢং রূপায়িত হয়। এই ঢং-এব মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন মানুষের সহজাত আবেগ প্রমুখ চিত্তবৃত্তি অন্যদিকে তেমনই নৈতিক গুণগুলিও পরিস্ফুট হয়েছে। সেই সংগীত কোথাও প্রতীক ধর্মী কোথাও বা ভাবের আবেগে উচ্ছ্বসিত। পাশ্চাত্যের সংগীত রচয়িতারাও মধ্যযুগ থেকে সংগীতসৃষ্টিব এই ধারা অনুসরণ করেছেন। এই সব কারণেই সংগীত পূর্বাপর একটি অর্থ জনসমাজে বহন করে।

তবে শুধুমাত্র পূর্বসম্পর্কিত অর্থসমূহ বহন ক্রিয়াই সংগীতেব একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। পরম ব্রহ্ম বা অসীমের রূপচর্চায় বিশুদ্ধ সংগীতেব অবদান যেমন মেনে থাকি তেমনই জাগতিক অন্যান্য ক্রিয়াসমূহের অর্থবোধ্য ভাব ভাষা পরিবহণের কাজেও বিশুদ্ধ সংগীতের প্রয়োজন।

রীতিনিষ্ঠ (ফর্ম্যালিস্ট), অভিব্যক্তিবাদী (এক্সপ্রেশনিস্ট) উভযেই অসীমের রূপচর্চায় মগ্ন হন, কিন্তু রীতিনিষ্ঠরা প্রথম থেকে শেষ অবধি চিরন্তন বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভরশীল। অপরপক্ষে অভিব্যক্তিবাদীরা বোঝাতে চান কি করে সংগীত জনচিত্তে অনুভূতি জাগ্রত করতে ও ভাব সঞ্চার করতে সক্ষম হয়। কাজেই অভিব্যক্তিবাদীরা পূর্বসূরীদের রীতি বা ঢং সর্বক্ষেত্রে মেনে চলতে সক্ষম হন না বা ইচ্ছুক থাকেন না।

শিল্প তাত্ত্বিকরা এই দুই রীতিতে সংগীতের আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখে সংগীতসমালোচকদের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। এর মধ্যে হ্যানস্লিকের মত পথ ও যুক্তি সৌন্দর্যতাত্ত্বিকেরা খণ্ডন করতে পারেননি বলে প্রায় অভ্রান্তরূপে তা দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

হ্যানস্লিক সম্পূর্ণ অভিব্যক্তিবাদীও নন তেমনই অত্যাধুনিক বিমূর্তবাদীও (কনফিগারেশনিস্ট) নন। বিমূর্তবাদীদের ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য হল শৈল্পিক উপাদান (রঙ, রেখা, শব্দ, মাটি, পাথর ইত্যাদি) সমূহ সাজিয়ে উপস্থাপিত করে তার নির্মাণ কৌশল দেখান।

সংগীতের ক্ষেত্রেও তার উপাদানগুলি যেমন লয়, ধ্বনি, সুর ইত্যাদিকে সুসমঞ্জসভাবে একত্রিত করে সংগীতের অন্তরস্থিত ভাব (মিউজিক্যাল আইডিয়াস)-এর স্বরূপ দেখান যায়। বিমূর্তবাদীদের এই বক্তব্যের সঙ্গে হ্যানস্লিক সম্পূর্ণ একমত হতে পারেননি। আবার শ্রুতি, স্বর, ধ্বনি কীভাবে অনুভূতির এবং আবেগ সমূহের জাগরণ ঘটায় এই নিয়েও মতবিরোধ এবং সমস্যা। কিন্তু ব্রহ্মবাদী এবং অভিব্যক্তিবাদীদের মধ্যে মতের মিল আছে যে সুর, ধ্বনি লয় ইত্যাদি সংগীতের উপাদান সমূহ সম্মিলিতরূপে শ্রোতার মনে আবেগ জাগাতে সক্ষম হয়। পরীক্ষামূলকভাবে দেখা যায় সংগীতের অর্থই অবশেষে সঞ্চারিত হয় শ্রোতার মনে। সংগীতের ফলশ্রুতি তিনটি 'রূপে' ক্রিয়াশীল। এই 'রূপ' তিনটি মতবাদ অনুযায়ী গ্রহণ করা হয়েছে। (১) ভোগসুখবাদী (হেডনিস্ট) (২) পরমাণুবাদী (এ্যাটমিস্ট) (৩) নিখিলসৃষ্টবাদী (ইউনিভার্সালিস্ট)।

সুসেন ল্যাঙ্গার এই মত তিনটিকে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি হেডনিস্টদের সম্পর্কে বলেছেন, ওরা বিশ্বাস করে যে, সংগীতের উদ্দেশ্যই হল আবেগকে জাগ্রত করা বা আনন্দময় অনুভূতির জন্ম দেওয়া।

যাঁদের মতে সংগীতের বিভিন্ন সুর, ধ্বনি ইত্যাদি বিচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ করে তা থেকে রস গ্রহণ করতে হয়, তাঁরা এ্যাটমিস্ট রূপে চিহ্নিত।

ইউনিভার্সালিস্টদের মতে সংগীত যে অনুভূতি শ্রোতার চিত্তে জাগিয়ে তোলে তা বিশ্বজনীন প্রাকৃতিক এবং আবশ্যকীয় এবং সেই জন্যই সংগীতের গঠন বৈচিত্র্য, বিন্যাস কুশলতা ইত্যাদি বিশ্লেষণের যোগ্য। কাজেই এদের সঙ্গে উপাদান বিশ্লেষণে এবং ব্যক্তকরণে আস্থাশীল বিমূর্তবাদীদের একটি সাদৃশ্য স্থাপন করা যেতে পারে।

প্লেটোর সময় থেকে বর্তমান কালের সৌন্দর্যতাত্ত্বিকদের কাছে একটি মত

স্বীকৃত যে সংগীত শ্রোতার আবেগ জাগাতে সক্ষম সেই কারণে সংগীতের উদ্দেশ্য নির্ণয়ের জন্য কখনো বেশি কখনো কম অনুভূতি এবং আবেগকে কেন্দ্র করেই আলোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে[১]। ওয়েলড নামে একজন শিল্পতাত্ত্বিক শ্রোতাদের আবেগপূর্ণ অভিজ্ঞতা বলতে তাঁদের মেজাজকে বুঝেছেন কোন বিশেষ ধরনের আবেগকে বুঝাতে চাননি।

এই মেজাজটি মস্তিষ্কে স্থায়ী ভাবে বাসা বাঁধে, আবেগ এক্ষেত্রে ক্ষণস্থায়ী। সংগীতের উপজীব্য বিষয়টি যে অন্তর্দৃষ্টি দান করে, শ্রোতা স্রোতে গা ভাসিয়ে চলার মত সে রসে নিমজ্জমান হয়ে চলেন মাত্র

সংগীতের প্রভাব চোখে দেখা যায় না তবে আবেগের প্রতিক্রিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রোতার আচরণে প্রকাশ পায়। যদিও প্রকৃত সৌন্দর্যপিপাসুরা এক্ষেত্রে নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের মত স্থির হয়ে রসগ্রহণ করে থাকেন।

শ্রোতার আচরণের মাধ্যমে যখন সংগীত অনুধাবনের ফলাফল প্রকাশ পায় তখন বুঝতে হবে সেই সংগীত শ্রোতার মনে মিশে গেছে নানা বিশৃঙ্খল চিন্তা সমবায়ে, যে চিন্তা থেকে মুক্ত হবার ক্ষমতা শ্রোতার নেই। কারণ অনেক আবেগঘটিত আচরণ স্বয়ংক্রিয় এবং অনৈচ্ছিক পেশীদ্বারা সংঘটিত হয় যেগুলিকে শিক্ষার দ্বারা আয়ত্তে আনতে হয়। এই আচরণকে বলা হয়েছে কার্যপ্রণোদিত বা অর্থসূচক আচরণ (ডেসিগনেটিভ বিহেভিয়ার)। কেন না আবেগের আচরণ যতই তীব্র হয়, মানুষের অহংবোধ সে ক্ষেত্রে ততই শিথিল হয়ে আচরণের প্রভাবে ধরা দেয়। এইগুলি স্বতঃপ্রণোদিত এবং জৈবিক। এই তীব্র আবেগগুলির প্রতিক্রিয়া পৃথকভাবে বোধগম্য করান দুষ্কর।

মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে বিচার করলে বলা যায় সংগীত শ্রোতার চিত্তে, স্নায়ুতে, শ্বাসপ্রশ্বাসে, রক্তচাপে শিহরণ তোলে সুরের মায়ায় এবং শ্রোতা অভিভূত হয়। কিন্তু সংগীতের দ্বারা সৃষ্ট আবেগ প্রাথমিক স্তরে শ্রোতাকে অনুপ্রাণিত করলেও এবং স্পন্দনগুলি বিভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়াশীল হলেও সংগীতের সামগ্রিক ফলশ্রুতির সঙ্গে তার পার্থক্য অনেক।

বিভিন্ন রস শ্রোতাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় তখনই যখন শ্রোতা প্রতিটি ক্ষেত্রে বুদ্ধি ও অনুভূতির দ্বারা অনুধাবন করে তাকে গ্রহণ করেন।

শিল্পতাত্ত্বিক ক্যাসিরার শিল্প আবেদনে সামগ্রিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন শিল্প অর্থাৎ সংগীত, চিত্র ভাস্কর্য ইত্যাদি মানবচিত্তের গভীরে এবং সর্বস্তরে গতিবেগ সৃষ্টি করে। কিন্তু তার বিভিন্ন উপাদানগুলি যেমন ছন্দ, সুর,

রং, রেখা ইত্যাদির কোন একটি এককভাবে কোন আবেগকে ফুটিয়ে তুলতে অক্ষম।

আমরা যেটি অনুভব করি তা হল সহজ আবেগময়তায় আচ্ছন্ন একটি রূপ যা শিল্পকর্মের কোনও বিশেষ ধর্ম নয়, বলা যায় চলমান জীবনের গতিময়তার রূপ।

সংগীত গ্রহণের ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে সংগীতজ্ঞের, সুন্দরের উপাসকের, অথবা শ্রোতার ক্ষেত্রে যে অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন তার দ্বারাই যে সংগীতের প্রকৃত উদ্দীপক বস্তু সমূহকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যাবে তা ঠিক নয়। এই উদ্দীপক বস্তুগুলি ধারণাগ্রাহ্য। প্রভাব বিস্তারকারী উদ্দীপক বস্তু উপলব্ধির জন্য জাগ্রত চেতনা এবং জ্ঞান প্রয়োজন কেননা সংগীতের অভিজ্ঞতা সমূহ সব ক্ষেত্রেই পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে বিচার করা যায় না। কোন বিশেষ ধরনের গান গাওয়ার পর ভিন্ন রীতির গান গায়কের কণ্ঠে আসে না বা শ্রোতা তাকে গ্রহণ করতে অসমর্থ হন, তার একটি কারণ হল, সৌন্দর্যগত বিচারে উভয় শ্রেণীর গীতরীতি উচ্চাঙ্গের হলেও এই বাধা প্রদানের প্রবণতা বিবেক প্রসূত। কারণ আত্মসচেতনতার ঝোঁক সর্বদা কাঙ্ক্ষিত (এক্সপেকটেশন) রস সংগ্রহেই তৎপর হয়ে থাকে।

সংগীত যখন পরিবেশিত হতে থাকে, তখন শিল্পী কি ভাবে সেটিকে শেষ পর্যায়ে রূপায়িত করে তুলবেন এ নিয়েও ক্ষণে ক্ষণে আশা, নিরাশার দ্বন্দ্ব চলে শ্রোতার মনে।

গায়ক যখন 'সাতটি সুর যেন সাতটি পোষা পাখিকে'[২] নিয়ে নীড় রচনায় মগ্ন থাকেন শ্রোতা তখন কোনও একটি বিশেষ প্রত্যাশায় আকুল হন যতক্ষণ পর্যন্ত না শিল্পীর দক্ষতা সমস্ত প্রকার অনিশ্চয়তা দূর করে জয়ের আনন্দ লাভের পথকে প্রশস্ত করে তোলে। এই অনিশ্চয়তা বোধই উৎকণ্ঠা সৃষ্টির জনক। শিল্পীর মনে শিল্পের ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্বন্ধে অজ্ঞানতা যেমন উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে, তেমনি করেই সে উৎকণ্ঠিত হয় তার মনের সন্দেহ, আশা ইত্যাদি চিহ্নগুলিকে যথাযোগ্যভাবে শিল্পের উপজীব্য করে তুলতে পারবে কি না ? তবে ঐগুলি সবই সচেতন মনের চিন্তা : যে চিন্তা প্রকৃত শিল্পী অনায়াসে অতিক্রম করতে সক্ষম হন। শ্রোতার উৎকণ্ঠাও অনেক ক্ষেত্রে শিল্পীকে স্পর্শ করে, ফলে শিল্পী আবেগের মাধ্যমে সংগীতে সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস করে থাকেন, দেখা যায় এই অস্থিরতা অনেক ক্ষেত্রে শিল্পীর অন্তরে প্রেরণা স্বরূপ হয়। এবং অস্থিরতার সমাপ্তি তখনই যখন সৃষ্ট সংগীতরস গায়ক ও শ্রোতা উভয়ের ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য হয়।

শিল্পতাত্ত্বিক রাডলফ্ অয়কেন এই অবস্থাটিকে বলেছেন বিশ্বাস ও উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি সুনিয়ন্ত্রিত প্রণালী। (এ্যান অর্ডিনারি সিস্টেম অব বিলিফ অ্যাণ্ড এটিচিউড) তাই, সংগীতের প্রত্যাশা ধর্মটি একাধারে যেমন অচিন্তনীয়ও নয় তেমনই আবার অনিয়ন্ত্রিত কোনও প্রক্রিয়াও নয়।

প্রত্যাশা অভ্যাস জাত এবং বিশেষ ধরনের রীতিব উপর এর ক্রিয়া প্রতিফলিত। মানসিক ক্রিয়া সংগীতের অভিজ্ঞতা হতে সম্ভূত। আবার সচেতন মনের প্রতিটি স্পন্দনের উপরেও সংগীতের রূপ ও ছায়া কোনও না কোনও রেখাপাত করে। সংগীত তার রীতি নীতির প্রভাবে ধীরে ধীরে অবুঝ শ্রোতার মনেও ক্ষণস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব গড়ে তুলতে পারে। প্রকৃতপক্ষে 'শোনা' যাকে বলে তাই যদি শ্রোতা করে থাকেন, অর্থাৎ সে দায়িত্ব তিনি যদি কণামাত্রও পালন করেন, তবে আনন্দের সাগর হতে তিনি এক বিন্দু আনন্দও অন্তত সংগ্রহ করতে পারবেন একথা নিশ্চিত, কারণ তাই হবে ঈশ্বরের অযাচিত দান।

শিল্পী মাইকেল এঞ্জেলো বলেছেন, অঙ্কনে হাত অপেক্ষা মস্তিষ্কের প্রয়োজন বেশি। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি নৈশভোজের ছবি অঙ্কন করতে গিয়ে দিনের পর দিন স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছিলেন মানুষ যত প্রতিভাবানই হোক না কেন, সেই সময়েই তার মস্তিষ্ক সর্বাপেক্ষা বেশি ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে যখন বাইরের প্রকাশের কোন কাজই সে করে উঠতে সক্ষম হয় না। শিল্পীরা সৃষ্টির মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির সর্বজনীন ভাবধারা ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পান, এতে কাজ করে ইন্দ্রিয়ানুভূতি (সেনসেশন্), প্রত্যয় (ইম্প্রেশান), অনুভব (ফিলিং), প্রেরণা (ইমপাল্‌স্) ও আবেগ (ইমোশন্)। এইগুলি বলা যায় শিল্পজগতের উপাদান, যা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পক্ষে কার্যকরী রূপে দেখা দেয়।

মনের জটিল দিকগুলি সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশের দক্ষতা দেখা যায় যখন তখনই তাঁরা শিল্পী পদবাচ্য হতে পারেন এর জন্য চাই অনুভব ক্ষমতা। কারণ অনুভূতিই প্রথমে দ্বিমুখী চিন্তাধারার (বাইপোলারিটিস্ অব্ থট্) মধ্যে দ্বন্দ্ব বা সামঞ্জস্য এনে থাকে। সৎ ও অসৎ চিন্তার দ্বন্দ্বের মধ্যে বিবেক তার নিজের পথটিই বেছে নেয়, যেমন মানুষ বুঝে নেয়, সাদা কালো, ঠাণ্ডা গরম, মনোরম ও দুঃখদায়ক অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য।

দ্বিতীয়ত অনুভূতির মধ্যে ব্যক্তিসত্তার আর এক অংশ লুক্কায়িত থাকে প্রকাশ বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে যা অন্যলোকের চাহিদা অনুযায়ী পরিবেশিত নাও হতে পারে। কোন উত্তপ্ত স্থানে দাঁড়িয়ে কিছু লোক গরম অনুভব করল। ফলে তারই

প্রভাবে কোন ব্যক্তির আবেগ সৃষ্টি হল সাহারার দৃশ্য চিত্রণের জন্য। কিন্তু তার দ্বারা শুধু ব্যক্তি বিশেষেরই মানসপট প্রকাশের জন্য ভাবাবেগে আন্দোলিত হতে পারে। এই অনুভূতি যদিও স্থান, কাল, দেখা ও শোনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তথাপি সত্যকার শিল্পে এমন কিছু এসে যায় যা স্থানকালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না এবং সেই কারণেই জনসাধারণ সেই মুহূর্তেই শিল্পের প্রকৃত মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয় না।

অনুভূতির তারতম্য ভালমন্দ অভিজ্ঞতা সৃষ্টির পরিপোষক। সুতরাং অনুভব ক্ষমতা চিন্তাশক্তির নিকটে থেকেও সমগোত্রীয় নয়।

কোন স্থলে সংগীত পরিবেশিত হলে দর্শক আনন্দে হাততালি দিতে পারে এবং সে অভিব্যক্তি আনন্দের স্বচ্ছ প্রকাশের মধ্য দিয়েই ব্যক্ত হয়। কিন্তু ওই আনন্দের উৎস বিভিন্ন মনে বিভিন্নাকারে থাকতে পারে, অনেকে অনুভবে আনতে পারেন শিল্পীর কণ্ঠ, অনেকে বুঝতে পারেন যন্ত্রীর কলাকৌশল, অনেকে বিষয়বস্তুর অলংকরণের মাধ্যমে তার সার্থক রূপায়ণে তৃপ্তি লাভ করতে পারেন। কিন্তু সমবেত ভাবে বাইরে যে উচ্ছ্বাসটি বিদ্যমান সেটি আনন্দেরই পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি।

সংগীত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়ে সাড়া জাগায় সত্যিকথাই, তাকে উচ্ছ্বাসপ্রবণ করে তোলে, এবং তার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়, তবে শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ সমাজ এবং কোনও শিল্পী স্বয়ং এই ইন্দ্রিয়গত প্রেরণা যেমন অনায়াসে আয়ত্তে আনতে সক্ষম হন, তেমনিই আবেগও। ফলে তাঁরা সকলেই শিল্পীর সৃজনী প্রতিভাকে নির্লিপ্তভাবে ভাল বা মন্দ রূপে গ্রহণ করতে সক্ষম হন। সুতরাং সর্বপ্রকার অনুভূতির জন্ম যেমন স্বতঃস্ফূর্ত তেমনই চিন্তাকে নিজের আয়ত্তে এনে তাকে স্বাধীনতা দেওয়াও অভ্যাসের দ্বারাই সম্ভব। তখন অনুভূতি আপনা হতেই প্রকৃতির মধ্যে সক্রিয় হয়। চিন্তার জন্ম তার পরে। সঠিক চিন্তাই সংগীত ও অন্যান্য শিল্পের সার্থকতার সোপান। সাধারণত সংগীতের বিচার হয় পূর্বতন অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতেই। আহৃত জ্ঞানই ক্রমে অভিজ্ঞতায় পর্যবসিত হয়। কান্টের মতে চিন্তাশক্তির আর একটি প্রকাশ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা। বা জ্ঞান অভিজ্ঞতা প্রসূত চিন্তা শক্তির বাহন। শিল্পতাত্ত্বিক হিউম ইন্দ্রিয়গুলির কার্যকারিতা অর্থাৎ সংবেদন শক্তির বিচারে ভাব (আইডিয়া)-কে স্থান দিয়েছেন। মনের উপর রেখাপাত করা আর মনে কোনও ভাবের উদয় হওয়া ভিন্ন ব্যাপার। মনের আর একটি শক্তি আছে তা হল যথেচ্ছ কল্পনা করবার শক্তি। এই কল্পনা না ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না বুদ্ধিবিচারের উপর নির্ভরশীল।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের মারফৎ সংবেদন ক্ষমতা (সেনসেশন্) ক্রিয়াশীল হয়। সংগীত ইন্দ্রিয়কে যেভাবে সচেতন করে, অভিজ্ঞতাকে যেভাবে কাজে লাগায়, চিন্তাশক্তিকে সক্রিয় করে, পাশাপাশি আর কোন শিল্পই মস্তিষ্ককে সেই পরিমাণে জাগ্রত করতে সক্ষম হয় না। কাজেই সংগীতের প্রকৃত অর্থ কি এটি একটি তর্কমূলক বিষয়। কখনও দেখি সংগীত কোন পুরাতন ভাবধারার সঙ্গে মানুষের যোগসূত্র স্থাপন কর্মে নিয়োজিত আবার কখনও কোন পরমানন্দ বিষয়কে নূতন আলোকে উদ্ভাসিত করে সংগীত। তাই সংগীতের পরিণতিতে যদি সুন্দরের অস্তিত্বকেই স্বীকার করে নিতে হয় তবে দেখা যায় সংগীতের অর্থ হয় অকর্মবাচক। তাহলে কীভাবে অচিন্তনীয়, অনির্বচনীয় সংগীত স্পন্দনগুলি সংগীতের অর্থ বা তাৎপর্য বহনে সক্ষম? সংগীতের অর্থ ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। কেননা সংগীতের ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ ভাষার মাধ্যমে বোঝান যায় না এবং ভাষায় যখন বোঝান যায় না তখনই সংগীতের আবির্ভাব। ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল হলে সংগীতের দুটি অর্থ মানা যেতে পারে।

(১) সংগীত সংযোগ স্থাপনের ক্রিয়ার উপরই নির্ভরশীল।

(২) সংগীত প্রতীকাকারে কোন নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনে নিয়োজিত কিন্তু সংগীতকে কোনও বিশিষ্ট সম্পদরূপে আমরা গণ্য করতে পারি না, এবং স্পন্দন জাগানোর মধ্যেই এর ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ একথাও আমরা মানতে পারি না। হিমালয় পর্বতের অবস্থিতি শুধু রাষ্ট্রসমূহের সীমানা নির্ধারণের জন্য এ সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়; আবার এ কথা চিন্তা করাও বাতুলতা হিমালয় পর্বতকে উচ্ছেদ করে সেখানে কৃষিকার্য সম্ভব। হিমালয় সম্বন্ধে প্রথম কথা এটি প্রাকৃতিক সৃষ্টি। বহুযুগ পরে এটিকে কাজে লাগান হয়েছে। কাজেই শুধুমাত্র পর্বতের অস্তিত্বের সঙ্গেই শিল্পের তুলনা করা যেতে পারে।

অনেকে সংগীতের অর্থ নির্ণয়ের জন্য তিনটি সম্পর্ক স্থির করেছেন। প্রথমত এটি উদ্দেশ্যমূলক অথবা স্পন্দন প্রকাশরত, দ্বিতীয়ত গতিময়তার দ্বারা স্পন্দন লক্ষ্যের প্রতি ধাবমান, তৃতীয়ত সচেতনশীল পরিদর্শকের ভূমিকা। কিন্তু সংগীতে স্পন্দনগুলি তো এমন ঘটনা বা ফলাফল প্রকাশের জন্যও তাড়িত হতে পারে যা সংগীতের ধর্ম হতে পৃথক অথবা যে স্পন্দনগুলি অভিব্যক্ত হল সেগুলি স্পন্দনের অন্য একটি রূপ।

শোনা, ভাবা এবং বোঝার মধ্যে ব্যক্তির সৌন্দর্য অভিজ্ঞতার পরিপূর্ণ উপলব্ধি সম্ভব নয়। সৌন্দর্য উপলব্ধির জন্য কল্পনার আশ্রয় নেওয়ারও প্রয়োজন হয় এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতি কল্পনার পথটি প্রশস্ত করে তুলতে সাহায্য করে। আবার

কোনও সমঝদার ব্যক্তি সংগীতের বা কোন শিল্পের মূল্যায়ন করতে সমর্থ হলেও প্রকৃত অর্থ যে সর্বদা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হন তাও নয়, কেননা প্রকৃত অর্থ অনেক ক্ষেত্রে বুদ্ধিগম্যতার স্তরের বাইরে থেকে যায়। একটি অর্থ অন্য অর্থের সঙ্গে যুক্ত থাকে সুতরাং সর্বার্থ গ্রহণে সমর্থ হতে কেউই পারেন না। কারণ সীমাহীনতার মধ্যেই অর্থের পরিব্যাপ্তি। হেগেলের মতে কোনও শিল্পীকে যদি দর্শক বা শ্রোতাদের প্রভাবিত করতে হয় তবে তাঁর নিজেকে বুঝবার জন্য চিন্তার জগতে নগণ্য ব্যক্তিরূপে প্রবেশ করতে হয়।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

'আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না,
সেই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা'[৬]

সঙ্গীতের অর্থ আমরা প্রত্যাশার ফললাভ বলতে পাবি। কোনও উদ্দীপক স্পন্দন যদি সংগীতের সঙ্গে ব্যক্তির অতীতের কোনও এান ধারণার যোগ সাধন করতে সক্ষম হয় : তবে সেই উদ্দীপক স্পন্দন প্রকৃতরূপে অজ্ঞাতসারে অর্থপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। আবার শ্রোতার প্রত্যাশামত যদি গায়ক শ্রোতার সম্মুখে সংগীত স্পন্দনগুলি উপস্থিত করতে অক্ষম হন তাও সমগ্ররূপে অগ্রহণযোগ্য এবং অর্থহীন।

সংগীতের অর্থ নিরূপণের জন্য আর একটি বিষয় যুক্ত করা যায়, তা হল অনুগামী সংগীত ধারণা (কনসেকুয়েন্ট মিউজিক্যাল্ আইডিয়াস্)। সংগীতের প্রথমেই বোঝা যায় কি আশা করার আছে, কোন উদ্দীপক স্পন্দন এটি জাগাতে সক্ষম, কোন রীতি এখানে উপস্থাপিত করা হচ্ছে যা অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্য বহন করে। সংগীতের প্রকল্পিত অর্থ (হাইপোথেটিক্যাল মিনিং) বলতে বুঝায় মানুষের মনের বহু প্রকার রীতি, চিন্তা, ভাবনার মধ্যে কোনও পরিচিত রীতির সঙ্গে সংগীত একাত্ম হয়ে কি আশা তুলে ধরে। এই আশাও বিভিন্ন ভাবনার মধ্য থেকে উদ্ভূত হয় ফলে প্রকল্পিত অর্থটিও দ্ব্যর্থ বোধক হয়ে যায় কিন্তু তারপর সংগীতের অনুগামী অংশ ক্রমেই পরিস্ফুট হয়ে দ্ব্যর্থভাব দূর করে এবং সদ্যলব্ধ অর্থ (এভিডেন্ট মিনিং) পূর্বাপর ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চিত্তে দানা বাঁধতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ যে অবস্থাটিকে চিনি জ্বাল দেওয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন যে ঘন হতে থাকলে দানা জমবে। ফলে তখন যে অর্থে সংগীত গ্রহণীয় সেটি সিদ্ধান্তকর অর্থ (ডিটারমিনেট মিনিং) রূপে গ্রহণীয় হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাই স্মৃতিপটে কালজয়ী হয়ে দাঁড়ায় এবং সমগ্র শিল্প সৃষ্টিকে

ধারণাক্ষম করে তোলে। আবার অর্থোপলব্ধির দ্বারা সংগীতের রসগ্রহণ এবং আত্মসচেতনতার দ্বারা সংগীতের রসগ্রহণ এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। কারণ প্রথমটির জন্ম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, দ্বিতীয়টির জন্ম উপলব্ধির মধ্য দিয়ে।

বার্ট্রান্ড রাসেল ভাষা সম্পর্কে বলেন, ভাষা ব্যক্তির অভ্যাস দ্বারা আয়ত্ত করতে হয়। লেখক ও পাঠক উভয়ের ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য সেই রকম সংগীতের ক্ষেত্রেও মনোযোগের দ্বারা অর্থ, অনুভূতির দ্বারা তাৎপর্য অনুধাবনের প্রয়োজন।

সংগীতের অন্তর্নিহিত অর্থ যে ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করবার জন্য ব্যক্ত হয়, তখনও সে প্রভাব বিস্তারকারী রূপে বিবেচ্য হতে পারে। কাজেই প্রভাববিস্তারকারী সংগীত যেমন বিবেক-বুদ্ধির উপর নির্ভর করে, তেমনই ধারণা শক্তির উপরেও, কেননা উভয় অবস্থাই বোধগম্যতার অন্তর্গত।

সংগীতের অর্থ ও প্রভাব আবার সংযোগ সৃষ্টি ছাড়াও দেখা দিতে পারে। অর্থাৎ সংগীত মাত্রেই যে শ্রোতার নিকটে গ্রহণযোগ্য হবে এমন কোনও কথা নেই যদিও সে সংগীত খুবই সুন্দর হতে পারে। এক্ষেত্রে শ্রোতার মধ্যে একটি নির্লিপ্ত ভাব দেখা যায়, যদিও সেখানে বুদ্ধির সচেতনতা থাকে তথাপি কিন্তু শ্রোতা সেখানে উদাসীন ভাবে সংগীতার্থকে উপেক্ষা করেন সে সুর যত মধুরই হোক না কেন। তবে সে শ্রোতার কথা এখানে বিচার্য নয়।

কারণ :

> "একাকী গায়কের নহে ত গান মিলিতে হবে দুইজনে—
> গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেকজন গাবে মনে'।

সংগীত শ্রবণের মধ্যে বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার যোগ যত বৃদ্ধিপায়, ততই শ্রোতা এবং শিল্পীর মধ্যে আদান প্রদান ক্রিয়া সৃষ্ট হয়।

শ্রোতার মানসিক ক্রিয়া তখনই সম্পূর্ণ যখন সংগীতের সুচিন্তিত ক্রিয়া শেষ স্তরে পৌঁছে শ্রোতার মনে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়। চিন্তাশক্তি তখন দ্বিধাহীন ভাবে উচ্চস্তরে ধাবিত হতে থাকে এবং সমস্ত ভাবাবেগ স্তব্ধ হয়ে যায়। সংগীতের অভিজ্ঞতায় একই স্পন্দন যেমন প্রতিক্রিয়াশীল তেমনই সেই

স্পন্দনই বাধাদানকারী হয়ে প্রতিপক্ষ হয়। এই অবস্থাটিও প্রকৃত অর্থ যাচাইয়ে এবং অভিজ্ঞতার বিচার বিশ্লেষণে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে সাহায্য করে। বিপরীত দিকে কোনও স্পন্দনই যদি বাধার সম্মুখীন না হয় বা প্রতিক্রিয়াশীল না হয় সে ক্ষেত্রে শ্রোতার পক্ষে প্রভাবিত হয়ে কোনও প্রকার ভাবকে গ্রহণ করাও সম্ভব হয় না।

সংগীতের যাত্রা শব্দ বিস্তারের মধ্যে এবং এইটিই প্রাথমিক মাপকাঠি হিসাবে ধরা হয়। সুরের উত্থান পতনে যে রীতি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে তার কোনও পরিবর্তন হলে শ্রোতার চিন্তা হয় পথভ্রষ্ট। সুতরাং এই পথভ্রষ্ট হওয়ার ক্রিয়াও সংগীতের প্রভাবান্বিত স্পন্দন হতেই ধরা পড়ে। অবশ্য তাল, লয় গুলি পূর্ণ মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত রাখার অলিখিত দায়িত্ব থাকে শিল্পীর এবং তাল, লয় রাখার জন্য যদি কোনও যন্ত্র সহযোগিতা করে তবে তারাও সংগীত পরিবেশনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে এবং সংগীতের অত্যাবশ্যাক ক্রিয়াগুলি এই সহযোগী যন্ত্রের মধ্য দিয়েও সাধিত হয়। তবে উপরোক্ত কথাগুলি কেবলমাত্র ত্রুটিপূর্ণ সংগীতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

সম্পূর্ণ বাস্তব এবং ব্যবসায়িক দিক হতে বিচার করলে শ্রোতার পরিবেশ ও আচরণ শিল্পীকে বুঝে নিতে হবে। সেইজন্য শিল্পতাত্ত্বিক লিওপোল্ড ম্যাজটি বলেছেন শিল্পীর সংগীত উপস্থাপনা এমনভাবে হবে যাতে সে নিজেই মোহিত হয়ে উঠতে পারে, এতে সংগীতও একাধারে হয়ে উঠবে আত্মসচেতন ও উদ্দেশ্যমূলক। ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সহজ সাবলীল পথে সংগীতের বিভিন্ন স্পন্দনগুলি এবং সংগীতের রীতিনীতিগুলি শ্রোতা যখন বুঝতে সক্ষম হন তখনই প্রভাব বিস্তারকারীর অভিজ্ঞতা শ্রোতার মনে আপনিই বাসা বাঁধে। এছাড়াও স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যে (মেডিয়েশন্ অব্ কনশাস্ কনোটেশান্) শ্রোতার মস্তিষ্ক আপনা হতেই সংগীতের অজানা বৈশিষ্ট্যে আত্মনিয়োগ করতে পারে।

সংগীতের কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। সেগুলি যে কোনও ব্যক্তি, সমাজ বা সংস্কৃতিই রক্ষা করে চলে যেমন সর্বত্রই শোকসংগীত ধীর সুরে নীচু পর্দায় গাওয়া হয়। পাশ্চাত্যে বীরত্ব

ব্যঞ্জক গানে একটি নির্দিষ্ট সুরই বাঁধা আছে।

কয়েক ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ যন্ত্র কোনও বিশেষ রীতিনীতি ব্যক্তকরণে প্রয়োজন হয়। অনেক ক্ষেত্রে সেতারের প্রয়োজন হয় প্রাকৃতিক চঞ্চলতা পরিস্ফুটনের জন্য। বেহালার প্রয়োজন হয় অনেক ক্ষেত্রে ভাবগম্ভীর বা করুণ পরিস্থিতিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য। একতারা ব্যবহার হয় বৈরাগীর মনের উদাসভাব ব্যক্তকরণের জন্য।

তবে বৈশিষ্ট্য সমূহ বোঝানোর জন্য সর্বদাই শিল্পী দায়ী থাকতে পারেন না। শ্রোতারই বৈশিষ্ট্যের আকার হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হওয়া উচিত। সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়, ভাষার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সংগীতের অভিজ্ঞতা সমূহের অনুগামী নয়। এই অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগত রুচি অথবা রসানুভূতি সম্পর্কিত। যেমন মানুষের ব্যবহারিক আচরণকে অনুকরণ করে দুঃখের ঘটনা বর্ণনায়, জয় ঘোষণায়, উৎসবে, ঋতুবন্দনায় বিশেষ ধরনের গানের রীতি ধীরে ধীরে প্রবর্তিত হয়েছে, ফলে ঐগুলির সুরের বৈশিষ্ট্য শুধু প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করে তা নয়, অতিরঞ্জিত করে প্রভাবান্বিত অভিজ্ঞতাকে কেননা এর থেকেই সংগীতের নির্দিষ্ট ধারা প্রবর্তিত হয়।

আনন্দবর্ধন দার্শনিক ছিলেন। তাঁর মতে কাব্যের আত্মায় আছে ধ্বনি অর্থাৎ বস্তুধ্বনি অলংকারধ্বনি ও রসধ্বনি। এবং রসধ্বনিতেই অন্য ধ্বনিদ্বয়ের পর্যবসান।

তাই সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ বলেছেন ধ্বনি নয় রসই কাব্যের আত্মা। কারণ রস হতেই লোকোত্তর আনন্দময় মানসিক অবস্থার আবির্ভাব সম্ভব হয়। শ্রোতা বা দর্শক কাব্যপাঠে, নাট্যাভিনয় দর্শনে, সংগীত শ্রবণে—চরিত্র, পরিবেশ, চিত্তবৃত্তি দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিকারগুলির সঙ্গে পরিচিত হন, সেই অনুভূতিই তখন প্রধান হয়, ফলে অহংবোধের বিনাশ ঘটে। সর্বজনীন সত্তার উপলব্ধি ঘটে এবং ভাবতন্ময় চিত্তে আত্মানন্দের যে প্রকাশ ঘটে তা-ই-বস্তু রস।

যখন অনুভূতির আত্মপ্রকাশ সম্পূর্ণ হয় না, অর্থ প্রকাশে অপূর্ণতা থেকে যায়, কাব্য তখনই অলংকারকে আশ্রয় করে।

ঠিক একইভাবে সংগীতশিল্পেও যদি রস পরিবেশনের দিকে লক্ষ্য রাখা যায়, তাহলে সংগীতের সমস্ত উপাদানে আপনিই সামঞ্জস্য সাধিত হয়। লোকোত্তর আনন্দময় অভিজ্ঞতা অখণ্ডরূপে শিল্পী ও দর্শকের নিকট গ্রহণীয়।

কাব্যের সাধারণ অর্থ ও প্রতীয়মান অর্থ ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু সংগীতের ক্ষেত্রে সেই ভিন্ন অর্থের ক্ষেত্র এড়িয়ে সুরের সমগ্র প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে অবশেষে মূল লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হতে হয়।

যেমন জাতীয় সংগীত "জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে, ভারত ভাগ্য বিধাতা।' এখানে ধরা যায় ভারতের ভাগ্য বিধাতা রূপ কোন শক্তির জয় ঘোষিত হচ্ছে। অথবা কোনও ব্যক্তি বিশেষ যাকে ভারতের মহামানবরূপে কল্পনা করে অভিনন্দন জানানো হচ্ছে, কিন্তু প্রকৃত অর্থ জনগণমনই উন্নীত হয়ে উঠেছে ভারত বিধাতার রূপকাদর্শে, সুরে ও ভাষায়।

যেমন রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "অয়ি ভুবনমনোমোহিনী" সংগীতটি পূজা মণ্ডপের যোগ্য নয়'।

অর্থের এই রূপান্তরীকরণ গানকে তার নৈর্ব্যক্তিক সত্তায় উন্নীত করে। ব্যক্তি বিশেষের নিকট অনুভূতির পরিচয় প্রদানের কাজে যে রূপ ব্যঞ্জনার প্রয়োজন, সংগীতেও তেমনই রয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ রস পরিবেশনে সুরের ব্যঞ্জনা সৃষ্টির অবকাশ।

কাব্য ও সংগীতের শব্দের অর্থ সম্পূর্ণতার জন্য প্রয়োজন হয় অলংকার, সুর, তাল ও ছন্দ। এর মধ্যে কারও স্থানই কম বা বেশি নয়। শাস্ত্রে সংগীতের এই রূপকেই বলা হয়েছে 'ধ্বনিরূপ' কিন্তু এর অর্থ ব্যাপক, অলংকার, সুর, তাল ছন্দ সমস্তই ধ্বনির অন্তর্গত। সমস্তই কাব্য বা সংগীত গঠনের উপাদান মাত্র, মুখ্য নয়।

অনেকক্ষেত্রে অলংকাররাজি কাব্যে রসসঞ্চারে প্রতিবন্ধকরূপে দেখা দেয় এবং সাহিত্যে প্রকৃত রস সৃষ্টির অন্তরায় হয়। এর কোনও প্রকৃত ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। যেমন নজরুলের একটি কবিতা।

'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিস্‌নে আজি দোল'

কবিতারূপে যখন পঠিত হয় তখনই এর সাধারণ অর্থ অতি পরিষ্কার। কিন্তু প্রতীয়মান অর্থ নির্ণয়ে শ্রোতা বা পাঠকের কিছু স্বাধীনতা থাকে। যখন এই কবিতায় সুর আরোপিত হল, তখন অলংকার, সুর, তাল, ছন্দ সমস্ত কিছুরই প্রয়োজন হল। কিন্তু সব কিছুই উপাদানরূপে ব্যবহৃত হল, কোনটিই মুখ্য রূপে নয়। তা নাহলে রস পবিবেশন নিঁখুত হত না। আবার যেহেতু এইগুলি উপাদান সেইজন্য দুই একটি উপাদান যদি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্তও হয় তাহলেও রস পরিবেশনে বাধার সৃষ্টি হয় না। যেমন 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি'।

রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটিতে সুরারোপিত হয়েছে কিন্তু মাত্রা বেঁধে দেওয়া নেই। সাধারণ ভাবে সংগীতে ছন্দ তালের দ্বারা রক্ষিত হয় একথাই আমরা বলে থাকি। কিন্তু তাল অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত না হলেও সংগীতে ছন্দ থেকেই যায়। এই গানেও সেই ছন্দ উপস্থিত কিন্তু অদৃশ্যভাবে।

অতুলপ্রসাদের

'কত গান তো হল গাওয়া' এই গানেও তাল প্রয়োগ রস পরিবেশনে বিঘ্ন ঘটায় কিন্তু ছন্দ উপস্থিত।

নজরুলের

'চল্, চল্, চল্,
ঊর্ধ্বগগনে বাজে মাদল'

এই গান অলংকার মুক্ত কিন্তু তাল ছন্দ দুইই আছে। শুধু সুর এবং ছন্দের সমন্বয়। সুরেরও বৈচিত্র্য নেই। স্বদেশী আমলে এই গান পরিবেশনের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল যা পূর্ণমাত্রায় সাধিত হয়। উদ্দেশ্য যদি পূর্ণ মাত্রায় সাধিত হয় তবে তাও শিল্প পর্যায়ে পড়ে।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গানটি সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য।

উপরোক্ত গানগুলির দ্বারা আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে সংগীতে কোন একটি উপাদান যদি মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় তবে রসপ্রকাশে সুস্পষ্টরূপে বিঘ্ন ঘটে। বর্তমান কালের সংগীতে যদিও সুর সমন্বয়ের পরীক্ষার অন্ত নেই তথাপি রস প্রকাশ সব ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ হয় না তার প্রধান কারণ উপাদান গুলির সামঞ্জস্যের অভাব। আবার 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি' এই গানটিতে উপযুক্তরূপে তাল

প্রয়োগ করলে তার রসপ্রকাশে বিঘ্ন ঘটে কি উন্নতি ঘটে তারও পরীক্ষার প্রয়োজন। কারণ শ্রোতার সফল রস গ্রহণের প্রধান বাধা হল অভ্যাস। অভ্যাসকে অতিক্রম করা কষ্ট সাধ্য।

আমরা দেখি সংগীতের লয় রক্ষার জন্য যে উপাদান তাহল তাল, কিন্তু তাল এবং অলংকার বর্জন করেও সংগীত সম্ভব। তাহলে প্রধান হল সুর যা ছন্দে গীত হয়। সংগীতে ভাষার ব্যবহার ভিন্ন প্রসঙ্গ।

সুরই যদি প্রধান হয়, তবে সমস্ত কোমল এবং শুদ্ধ সুরগুলি পর পর আমরা বাজাতে পারি কিন্তু তা শ্রোতার মন দূরে থাক্ কানকে আকৃষ্ট করবে কি ? এবং মানুষকে আকৃষ্ট না করলে তা শিল্প পদবাচ্যই হবে না।

কোনও মানুষ দূরবর্তী আরেকজনকে আহ্বান জানাতে পারে কোন বিশেষ আওয়াজের দ্বারা, তাকেও ধ্বনি বলা যায় কিন্তু সেই ধ্বনিদ্বারা কোনও সম্পূর্ণ শৈল্পিক সৃষ্টি সম্ভব নয়।

যে কোনও স্বরই ধ্বনি, কাজেই কতকগুলি স্বরের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে যদি তা আবৃত্তি করা যায় তবে তার দ্বারাই যে নিখুঁত শিল্পসৃষ্টি হবে একথা জোর করে বলা যায় না।

কাজেই আমরা দেখি শুধু সুরকে আশ্রয় করে বা শুধুমাত্র ধ্বনিসাম্য বজায় রেখে কোন শিল্পসৃষ্টি সম্ভব নয় কারণ তারা কোনও অর্থই প্রকাশ করে না বা মানুষের মনে কোনও প্রতিক্রিয়া জাগায় না।

এখন বিচার্য বিষয় মানুষের মনে প্রতিক্রিয়া কখন জাগে এবং কেন জাগে।

ধরা যাক কোনও স্থানে একটি লোক একটি বাচ্চা ছেলেকে প্রচণ্ড প্রহার করছে। এই দৃশ্য প্রথম অবস্থায়ই কোন লোক যখন দেখে, সে যদি দয়ালু হয় তবে তার মনে প্রথমেই ছেলেটির প্রতি করুণা জাগবে। যদি সে নিষ্ঠুর হয় তবে তার মনে আনন্দ জাগবে, অথবা সে দৃশ্য দেখে আরও নির্লিপ্ত হবে। যদি সে অহেতুক দয়ালু বা নিষ্ঠুর না হয় তবে তার মনে কৌতূহল জাগবে। দেখা যাচ্ছে কোন দৃশ্য দেখে সকলের মনে একই প্রতিক্রিয়া জাগছে না, এবং যে প্রতিক্রিয়া হয় তা সৃষ্টি করার দায়িত্ব দর্শকের অজান্তেই তার নিজের মনে থেকে যাচ্ছে, কিন্তু কোন না কোনও প্রতিক্রিয়া মানুষের মনে হয়ই। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়ার কোন মূল্য নাও থাকতে পারে কারণ বাচ্চাটিকে প্রহার করার উদ্দেশ্য বা অর্থ দর্শকের অজানা। যদি এমন হয় বাচ্চাটি কোন গুরুতর অন্যায় করেছে তাহলে দয়ালু দর্শকের মনেই হয়তো জেগে উঠবে ঘৃণা। তবে কি কোনও কাজের অর্থই প্রধান ? অর্থাৎ অর্থ জেনে যে প্রতিক্রিয়া হবে তাই আসল। শিল্পও তো

দৈনন্দিন কর্মের সঙ্গে ও দৈনন্দিন জীবন ধারণার সঙ্গে যুক্ত। সেখানে কি ভাব লাবণ্য, সামঞ্জস্যের কোনও প্রয়োজন নেই ? শুধুমাত্র অর্থ প্রকাশ করছে যে সংগীত তাই হল শিল্প। এবং যে 'প্রকাশ'ই অর্থ প্রকাশ করবে তাকেই শিল্প আখ্যা দেওয়া হবে।

তাহলে তো প্রিয়জনের মৃত্যুতে অনেক জাতি কান্নার মাধ্যমে তাদের মনের কথাগুলি প্রকাশ করে তবে তাকেও শিল্প আখ্যা দেওয়া যেতে পারে. কারণ তা প্রকাশ করছে অর্থ। দর্শককে বোঝাতে সক্ষম হচ্ছে। তাহলেতো রূপকেরও কোনও প্রয়োজন নেই।

আমরা জানি ভাষা হল অর্থ প্রকাশকারী মাধ্যমের মধ্যে অন্যতম। তাহলে ভাষার দ্বারা যা প্রকাশিত হবে তাই বলা যায় শিল্প। অর্থাৎ বক্তৃতাকেই বলা হবে শিল্প। কিন্তু বক্তৃতা কিছুক্ষণের মধ্যেই অধিকাংশ শ্রোতাব অনীহা জাগায় যদিও সে তা বুঝতে সক্ষম হচ্ছে। কিন্তু তার কানকে তা আকৃষ্ট করে না। ভিক্ষুকের ভিক্ষাবৃত্তি মানুষের মনে দুঃখের পরিবর্তে বিরক্তি জাগায় কেন, সে ত অর্থই বুঝতে পারছে ? অভিজ্ঞতার দ্বারাই আমরা জানি যে একঘেয়ে সুরের গান কিছুক্ষণের মধ্যে শ্রোতার কর্ণকে বধির করে তোলে।

পক্ষান্তরে ঘরের মেঝেতে যে আল্পনা দেওয়া হয়, তা কোনও অর্থই প্রকাশ করে না শুধুমাত্র সামঞ্জস্যের মাধ্যমে অঙ্কিত রেখাচিত্র, কিন্তু মানুষের মনকে তা তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট করে। অর্থ বোঝার কোনও আগ্রহই শ্রোতার মনে দেখা যায় না।

অর্থাৎ আমরা দেখি যে মানুষের মন সর্বদা অর্থ সংগ্রহের জন্য ব্যাকুল থাকে না, শুধু সুর সমষ্টি শুনবার জন্য অধীর হয় না বা শুধু ধ্বনির দ্বারা তার কানকে আকৃষ্ট করা যায় না।

মানুষের মনের চারিটি দরজা যদি অর্থ বোঝার জন্য, বাস্তব জগৎকে গ্রহণ করবার জন্য প্রতিদিনের অভ্যাসে নিজেকে ব্যাপৃত রাখার জন্য প্রস্তুত থাকে তবুও তার মনের একটি দরজা সর্বদাই খোলা থাকে ভাবের জন্য। সেই ঘর বিনা বিচারেই কাউকে প্রবেশ করতে দিতে পারে, আবার কাউকে বিনা কারণেই সরিয়ে দিতে পারে। সেই ভাবের ঘরেই শিল্পের যাতায়াত। মানুষের মনের এই অন্যতম বৈশিষ্ট্য তার চেতনার অংশীদার এবং তার সঙ্গেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

মানুষ যদি কোনও অর্থ না জেনে কোনও শিল্পকে গ্রহণ করে এবং শিল্পীর প্রকাশ ক্ষমতা যদি মানুষের মনে কোনও ভাব জাগাতে সমর্থ হয় এবং সেই ভাব যদি শিল্পীর ভাবনার সঙ্গে মেলে তবেই শিল্পীর প্রকাশনা সার্থক।

তবে ভাবজাগরণের সঙ্গে বুদ্ধির সম্বন্ধ থাকলে শিল্প বিচার সঠিক পথে হওয়ার সম্ভাবনা, কারণ আশাপূর্তির হতাশাই বুদ্ধিসহযোগে পরিবর্তনশীল সংগীতের সৌন্দর্যবিচারের পথ উন্মোচন করে থাকে। এর উপসিদ্ধান্তরূপে প্রত্যাশা লাভের নিয়মতান্ত্রিক পথগুলোই বা কি এবং সংগীতের গূঢ় অর্থই বা কি হতে পারে ইওরোপের সংগীত জগতে এই নিয়ে চাঞ্চল্য দেখা দিল। মানুষের মনোজগতের প্রত্যাশা একটি ধারা অনুসারে গড়ে ওঠে। একই সংগীত শুধু ধ্বনি ব্যঞ্জনার তারতম্যের গুণে সমাদর বা অনাদর লাভ করতে পারে। কোনও বিশেষ রীতি সম্বলিত সংগীত শ্রবণের ক্ষেত্রে শব্দ ব্যঞ্জনার স্থানগুলি যেমন বিচার্য তেমনই আবেগ অনুসারে সংগীতের বিভিন্ন অর্থ, মিল ও বৈষম্যগুলিও লক্ষণীয়, কারণ আমরা জানি দ্ব্যর্থবোধক অবস্থা কাটিয়েই সংগীতের গভীর আলোড়ন এবং শক্তিশালী প্রত্যাশা জাগান হয়। সংগীত সর্বদাই অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনা করে। সংগীত শ্রবণের ক্ষেত্রে সেই অতীতকেই গ্রহণ করা হয় যা একটি বিশেষ রীতি বা সংস্কৃতি পরিবেশনার্থে এগিয়ে দাঁড়ায় এবং সাহায্য করে কোনও একটি নির্দিষ্ট প্রত্যাশাকে স্থির লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে।

সংগীত ধারা তাই একটি গতিশীল অভিজ্ঞতা, অনন্তকালের জন্য প্রবহমান। সংগীত কোনও একটি রীতি গ্রহণ করে শব্দ এবং সুর সহযোগে গতিশীল হয়ে থাকে। সংগীতের আকার নির্ভর করে বস্তুনিরপেক্ষ বিমূর্ত শিল্পচেতনার প্রথানুসরণ এবং সেই পথের পুনঃ সম্প্রসারণের উপরে।

শিল্পতাত্ত্বিক হিউগ রিম্যান বলেছেন জটিল সংগীতকলা আয়ত্তে আনতে হলে অভ্যাস চাই ও সদিচ্ছা প্রয়োজন।[৫] কারণ সাধারণভাবে দেখা যায় যে ব্যক্তিসচেতনায় সৌন্দর্য মাত্রেই সর্বদা ক্রিয়াশীল হয়ে উঠতে পারে না, কিন্তু সংগীতের সৌন্দর্য অর্থপূর্ণ হয়েঁ ওঠে সর্বস্তরে যে কোনও ব্যক্তির নিকটে। বলা বাহুল্য, এর মধ্যে কোনও সংক্ষিপ্ত পথের ইশারা থাকে না। রীতি সর্বজনগ্রাহ্য করতে হলে, যেমন সংগীতের বিশিষ্ট রীতির অনুধাবন প্রয়োজন, সংগীতের ভাষা সর্বজনের ভাষায় পরিগণিত করতে হলে শিল্পীর পক্ষে প্রয়োজন হয়ে পড়ে বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির অনুধাবন এবং নিজ দেশের পুরাতন সংগীতের ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় স্থাপন। প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্যে নিষ্ঠাবান সংগীতজ্ঞেরা সংগীতের ক্রিয়াকলাপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপে বর্ণনা করলেও অনেকক্ষেত্রে এমন ধরনের সংগীত সমাজের একটি বৃহৎ অংশের হৃদয় জয় করেছে যা নিতান্তই স্থূল। এর নির্দিষ্ট কোনও কারণ ব্যক্ত করা সংগীত গবেষকদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এর কারণ যদি খুঁজতে চাই তাহলে আবেগের দ্বারস্থ হতে হবে। এই

সংগীত শুধুমাত্র প্রমোদ উপকরণ রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন ইওরোপের 'জ্যাজ্' বর্তমানে ভারতীয় সংগীতে অনুপ্রবেশ করেছে এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সংগীতের বিশেষ রীতি বলতে যা বুঝায় তা থেকে এ ভিন্ন। পক্ষান্তরে সংগীতকে একটি বিশেষ রীতিতে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত করেছেন যেমন বাক্, বিটোফেন, মোসার্ট, ম্যাসট্, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, নজরুল প্রভৃতি আরো অনেকে তাঁরাও প্রত্যেকে স্মরণীয় হয়ে আছেন সংগীতের ক্ষেত্রে।

এতে যে উপতত্ত্বের মধ্যে আমরা উপস্থিত হলাম তাতে বলা যায় যে এইগুলি সংগীতের সৌন্দর্য চর্চার আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনগুলির পর্যায়ভুক্ত। সংগীতের এই বিভিন্ন প্রয়োগ যা 'একস্প্রেসন্' রূপে প্রচারিত হয় পরবর্তীকালে সেগুলি আদর্শরূপে গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে।

পাশ্চাত্য সংগীতে 'ভাইব্রেটো'র উন্নতিসাধন বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই ভাইব্রেটোর ব্যবহার ছিল খুবই সীমায়িত। কোনও বিশেষ রীতির জন্য হয়ত ভাইব্রেটোর ব্যবহার হত। পরে রীতিগত ভাবে এটি স্বীকৃত হল সর্বত্র। যার জন্য এরপর ভাইব্রেটো ব্যতীত প্রদত্ত অভিব্যক্তির প্রকাশ গৌণ হয়ে দাঁড়াল। বর্তমানে ভাইব্রেটো দুইভাবে সংগীতে স্থান পেয়েছে কোথাও দ্রুত বাজনায় কোথাও বা বিস্তৃতভাবে। আবার স্থানান্তরে এই রীতি বর্জিত হয়েছে। আবার এমন অনেক রীতি যা সংগীত চর্চায় ঘৃণ্যরূপে পরিত্যক্ত হত সে রীতিও ধীরে ধীরে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে এবং ভাব প্রকাশের কাজে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পাশ্চাত্যে সুর ও ছন্দের পরিবর্তন সংগীতের একটি রূপ। মধ্যযুগে এই স্বর প্রকাশের নিয়মাবলীর পরিবর্তন ঘটানোর প্রয়োজন স্বাভাবিকরূপেই দেখা দিল, রেনেসাঁসের সময়ে ধীরে ধীরে এই অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটতে লাগল পরে বর্তমান শতাব্দীতে ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বরের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী রূপে বিবেচিত হচ্ছে।

সেইভাবে ক্লাসিক্যাল এবং পূর্বরোমান্টিক সংগীত যুগে বিশুদ্ধ স্বরের প্রয়োগ ছিল স্বাভাবিক গুণ। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে এর প্রয়োগের পরিবর্তন প্রবণতা দেখা দিতে লাগল।

পরিবর্তন ঘটাবার তাগিদ চলেছে সেই আদিযুগ থেকেই যখন সংগীত ছিল মূলত সমবেত কণ্ঠের উপর নির্ভরশীল। সংগীতের স্বরে ওঠানামা চরিতার্থ হত দুটি চরম বিপরীত কেন্দ্রকে উপলক্ষ্য করে।

সংগীত এবং চিত্রকলা সর্বত্রই এই সহজ একঘেয়েমি ভরপুর ছিল

মানুষের অভিব্যক্তি প্রকাশের রূপ। মধ্যযুগে খ্রীষ্টধর্ম প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংগীতও ধর্মের সঙ্গে নিকট বন্ধনে আবদ্ধ হল অর্থাৎ উপাসনা ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলির সঙ্গে সংগীত অবিসম্বাদী ভাবে যুক্ত হল।

কিন্তু সংগীতের উদ্দেশ্য তো ধর্মপ্রচার নয়। সে নিজের প্রকাশের পথ তখনও খুঁজে পায়নি বটে কিন্তু সংগীতের পথ পরিক্রমণের শেষ কোথায়? অনুভূতির সঙ্গে সংগীত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। আবার অনুভূতি থেকে পৃথক করলে সৌন্দর্য অস্তিত্বহীন। কাজেই সংগীত তো জগৎ থেকে বিলুপ্ত হলই না উপরন্তু ধর্মকে আশ্রয় করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়ে সে জয় যাত্রায় বেরিয়ে গেল। কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে কোথাও তার ব্যবহারের তারতম্য নেই।

সুন্দরকে সৃষ্টি করে মানুষের অন্তঃকরণ। 'নেশা' কথাটির উৎপত্তি স্থলও সেইখানেই। ভাল লাগা থেকেই নেশার উদ্ভব। রসপিপাসুর রসেই নেশা। কিন্তু পৃথিবীর রস বলতে তো শুধু একটি রসই নয়। কেউ বা বীভৎস রসের পূজারী, কেউ বা বীর রসের। যে বীভৎস রসের মধ্যে সুন্দরকে খুঁজে পায় এবং যে শান্তরসের চর্চার মধ্যে সুন্দরের সন্ধানে ব্যাপৃত তারা একটি রেখার দুটি প্রান্তে বাস করে।

যুদ্ধোন্মাদনার নেশায় যে মানুষ চঞ্চল তার কাছে মৃত্যুপথযাত্রীর যাতনা একটি অপরূপ দৃশ্য। সে তার মধ্যেই সুন্দরকে খুঁজে পায়। তাই কোন বস্তুই যে নিখুঁত সুন্দর তার প্রমাণ কোথায়! পৃথিবীতে এমন কোনও সুন্দর সৃষ্টি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি যাকে প্রত্যেকটি মানুষ সমর্থন জানিয়েছে দ্বিধাহীন চিত্তে। তবে সেই মানুষ কোনও সাধারণ মানুষের পর্যায়ে পড়বে না। তাকে হতে হবে নির্লোভ, কোনও ধর্মমতই তাকে আচ্ছন্ন করবে না। পৃথিবীর কোনবস্তুই যেন তার কাছে বাঞ্ছনীয় না হয়। কোনও পার্থিব ভালবাসা বা রাজনীতি তাকে পীড়িত করবে না। কিন্তু এই মানুষ দুর্লভ। অথচ পৃথিবীতে একটি অলিখিত রীতি এবং নীতি চলে আসছে সৌন্দর্য প্রসঙ্গে, এবং সব মানুষই প্রায় যা মেনে চলে তা হল অধিকাংশ মানুষের সমর্থনের দ্বারাই সৌন্দর্যের মাপকাঠিটি চিহ্নিত হয়। ফলে দেখা যাচ্ছে সমস্ত সৌন্দর্য নির্ণয়ের পূর্বেই কাজ করছে অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতা কোনও মানুষের একলার অর্জিত নয়। পৃথিবীর সব মানুষের সব দেশের যুগ যুগ বাহি অভিজ্ঞতা। যা মানুষকে উত্তেজিত করে তাই সৌন্দর্য নয়, যা মানুষকে আনন্দিত করে তাই সৌন্দর্য নয়, যা মানুষকে শান্তি দেয় তাই সৌন্দর্য নয়। এবং যা কিছু সুন্দর, যার মধ্যে সৌন্দর্য পরিপূর্ণ রূপে বিদ্যমান তাই শিল্প নয়।

অভিজ্ঞতা শুধু শিক্ষাতেই হয় না, আপন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা উপলব্ধি করা যায় তাও অভিজ্ঞতা। আবার শিল্পকে, সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতেও মানুষকে শেখান যায়। মনে করা যাক্, কবির মনে সবুজ পাতায় ঘেরা লাল গোলাপ স্থান পায় না, তার পরিবর্তে সকালের শিশিরে ভেজা ঘাসের ডগায় একটি ছোট্ট বেগুনী ফুল দেখা যায় কি যায় না, তাই কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করল : কবি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন ; সৃষ্টি করলেন অপরূপ কবিতা, যার মধ্যে মুখ্য স্থান পেল সেই বেগুনী ফুলটি। সেই কবিতা পাঠ করল শত শত পাঠক। তাদের চোখে কবির অভিজ্ঞতার আলোকে আলোকিত হয়ে গোলাপের চেয়ে সেই ক্ষুদ্র বেগুনী ফুলটিই অপরূপ সৌন্দর্যময় হয়ে উঠল। প্রত্যেক মানুষের মনই সৌন্দর্যপ্রবণ। সুন্দর জিনিসকে সুন্দর দেখা এই অভিজ্ঞতাকে শৈল্পিক আখ্যা দেওয়া যায় না। গোলাপ ফুল সুন্দর, তাকে সকলেই সুন্দর দেখে, এই সুন্দর দেখার মধ্যে কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। অসুন্দরের মধ্যে সুন্দর দেখে যে মানুষ তাকে ব্যক্ত করে তার প্রকাশ করবার বাহনের মাধ্যমে এবং অপর মানুষকেও অর্থাৎ শ্রোতা বা পাঠককেও তাকে সুন্দর বলতে মনস্থ করায় সেইই শিল্পী এবং সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতা প্রকৃত তারই।

মানুষের মনের দুটি স্তর আছে, একটি চেতন মন, যার মধ্যে মানুষের প্রত্যক্ষ সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা খেলা করে, এবং তাদেরই প্রভাবে আমরা হাসি কাঁদি। এই সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনারই আরেক নাম অনুভূতি। অনুভূতির দুটি মেরুই প্রধান ; তার একদিকে আনন্দ অন্যদিকে বেদনা। এরই মধ্যে বাকী স্তর। মানুষের শিশু বয়সেই ঐ জ্ঞান চৈতন্যের স্তরের উন্মেষ হয়। এই স্তরকেই বলা হয় মানসিক অবস্থা। এই মানসিক অবস্থা যে কোনও সময়ই পরিবর্তিত হতে পারে। এই পরিবর্তন সাধিত হয় প্রধানত পাঁচটি পথে ; এদের বলা হয় পঞ্চরিপু। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য। প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ রূপ আছে এবং প্রত্যেকের কার্যধারা স্বাধীন। শিল্পের ক্ষেত্রেও এই পাঁচটি রিপু কাজ করে পরোক্ষভাবে। ইংরেজ শিল্পতাত্ত্বিকরা শিল্পীর সঙ্গে সাধারণ মানুষের মানসিক ভাবধারা এবং তার সঙ্গে শিল্পের সম্বন্ধ নির্ণয় করবার প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত রয়েছেন।

মানসিক প্রবণতা এবং তার সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক বিচার করতে গেলে প্রথমেই তিনটি শব্দের ব্যবহার হয়। প্রকাশ (এক্সপ্রেশন্), আবেগ (ইমোশন্) এবং জ্ঞাপন (কমিউনিকেশন)। এক্সপ্রেশন্ বলতে বুঝায় মানসিক প্রবণতার বাহ্যিক প্রকাশ। মানুষের প্রথম প্রকাশ ভাষার দ্বারা, অতঃপর শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্য

দিয়ে এবং প্রধানত মানুষের মুখের রেখায়, অর্থাৎ তার চোখের দৃষ্টিতে ওষ্ঠের কুঞ্চনে, ভ্রূর উত্তোলনে ইত্যাদি। প্রধানত এই পরিবর্তন মানুষের সচেতন মনের কার্যকলাপ নয়। এগুলি মানুষের আদি ও অকৃত্রিম ভঙ্গি। এইগুলির জন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই, শিক্ষার প্রয়োজন নেই। পঞ্চরিপুর যে কোনও একটির কবলে পড়লেই মানুষের এই পরিবর্তন সাধিত হয়। এই পঞ্চরিপুর কবলে শুধু মানুষই নয় পশুও অসহায়, বিশেষ করে প্রথম চারিটির। জন্তুর মধ্যেও পরিবর্তন হয়। একে বলে প্রকাশ। এই প্রকাশভঙ্গিমাকে কখনই আমরা শিল্পপর্যায়ের বলে গণ্য করি না। কিন্তু প্রকাশের সঙ্গে আরেকটি কথা সংযুক্ত তাকে বলে জ্ঞাপন। এর সঙ্গেই আছে শিল্পীর সম্পর্ক। প্রকাশ ক্ষমতা মানুষ এবং পশু দুইয়েরই আছে। কিন্তু জ্ঞাপন প্রক্রিয়া শুধু মানুষের পক্ষেই সম্ভব।

প্রকাশের ক্ষেত্রে দেখা যায় বাহ্যত মানুষের সঙ্গে পশুর কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু পার্থক্য অন্য জায়গায়, একটি পশুর ভাবভঙ্গি বা কার্য কলাপ অন্য পশুর মনে কোনও চিন্তা জাগায় না। কিন্তু মানুষের স্বভাবের বৈলক্ষণ্য ভঙ্গিমা, কখনও কখনও অন্য মানুষের চিন্তার খোরাক যোগায়। এবং এই চিন্তা যে মানুষের মনে ক্রিয়া করে, সে কিছু পরিমাণে শৈল্পিক মনোভাব সম্পন্ন ত বটেই, এবং সে কি পর্যায়ের শিল্পী তা বিচার হয় তার প্রকাশ ক্ষমতার মধ্য দিয়ে।

এই প্রকাশ ক্ষমতার মধ্য দিয়েই একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয়। মানুষের মুখের ক্রোধের যে ভঙ্গি তা কখনোই সুন্দর নয়, কিন্তু সুন্দর হয় তখনই যখন চিত্রকর তাঁর তুলিতে নিখুঁত করে ফুটিয়ে তোলেন সেই ক্রোধের ছবি। পশুর মনের কাতরতা, বা আনন্দের আকুলতা সাধারণ মানুষের চোখে পড়ে না কিন্তু চিত্রকর সেই ক্ষণিক মুহূর্তকে শাশ্বত করে তোলেন তাঁর অঙ্কন ক্ষমতায়। তখনই সেই ছবি হয় নিখুঁত শিল্প এবং তিনি হন প্রকৃত শিল্পী। ভাস্কর নীরস পাথরের কোণে কোণে হাতুড়ির আঘাতে আঘাতে গড়ে তোলেন অপরূপ মূর্তি। মূর্তির চোখে লোভের আকুতি, সর্ব অঙ্গে সেই লোভের ছাপ। সাধারণ মানুষ সেই মূর্তি থেকে চোখ ফেরাতে পারে না।

যিনি মূকাভিনেতা, তিনি এই ক্ষণিক মুহূর্তগুলিকে ফুটিয়ে তোলেন নিখুঁতভাবে তাঁর মুখের রেখায়, শরীরের অঙ্গ সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে। সাধারণ মানুষের দেখার মধ্যে এবং শিল্পীর দেখার মধ্যে এখানেই তফাত। সাধারণ মানুষ দেখার জিনিস দেখে এবং অনেক কিছুই তার চোখ এড়িয়ে যায়। কিন্তু শিল্পীর চোখের দেখা ত দেখা নয় তা হল পর্যবেক্ষণ। উপরে বর্ণিত শিল্পকার্যগুলির মধ্যে কথা অনুপস্থিত। শুধু ভাবের পরিবর্তন ফুটে উঠবে শরীরের রেখার

পরিবর্তনে। বড় কঠিন এবং দুরূহ, তাই বলতে হয় শৈল্পিক মনোভাব অনেকেরই থাকে কিন্তু শিল্পী সকলেই নয়। শিল্পীর এই প্রকাশ ক্ষমতা এবং জনসাধারণের মধ্যে সেই বোধ জাগিয়ে তোলাকেই বলে জ্ঞাপন (কমিউনিকেশন) ক্রিয়া। শিল্পী যখনই কোনও কিছু ভাবনাকে প্রকাশ করলেন, তখনই তা জ্ঞাপন করা হল, শিল্প পদবাচ্য হল কিনা, তা পরে আলোচ্য বিষয়। গায়ক যখন গুনগুন করেন তখনও তিনি জ্ঞাপন করেন, শ্রোতা তিনি নিজেই। চিত্রকর যখন পেন্সিলের রেখায় কোন ভাবনার আবছা রূপদান করেন তিনিও জ্ঞাপন করেন যদিও হয়ত দর্শক তিনি নিজেই। এইভাবে সাহিত্যিকও গল্প লেখেন, কবি রচনা করেন কবিতা, নাট্যকার নাটক রচনা করেন। সেই গল্প পাঠ করে, কবিতা পাঠ করে পাঠক কখনো বা দুঃখিত হন, কখনো বা আনন্দিত অর্থাৎ মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হয়। রচয়িতা যখন রচনা করেন তখন তাঁর মনে কিন্তু কোনও ভাবান্তর হয় না। দুঃখের গল্প লেখার সময়ে তাঁর মন যদি দুঃখে ভরে যায় তবে তা গল্পই হয় না। প্রত্যেক শিল্পই তাই। আবার দেখা যায় অনেক সময় কবি তাঁর কবিতা যথার্থ পাঠ করতে পারেন না ; কিন্তু কোনও আবৃত্তিকার সেই কবিতা যদি সুন্দর ভাবে পাঠ করে শ্রোতার মনেও সেই ভাবটি জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হন তাহলে আবৃত্তিকারই তখন শিল্পী, কারণ তিনি সঠিক ভাবে জ্ঞাপন করেছেন। কবির ভাবনা ও তাঁর মানসিক প্রবণতাকে তিনি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন যথার্থ ভাবে।

প্রত্যেক নাট্যকারই প্রকৃত অভিনেতা হতে পারেন না, কিন্তু নাট্যকারের রচনাই অভিনেতা তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে মূর্ত করে তোলেন। পঞ্চরিপুর যে কোনও একটির দ্বারা কবলিত মানুষের বিশেষ মানসিক অবস্থাকে ফুটিয়ে তোলেন ভাস্কর, সাহিত্যিক, চিত্রকর, যন্ত্রী, সংগীতজ্ঞ, কবি, নাট্যকার। কিন্তু শিল্পী যখন কোনও রিপুর দ্বারা আচ্ছন্ন হন, তিনি আর কিছু সৃষ্টি করতে পাবেন না। অনেক সময়ে দেখা যায় প্রেমিক রচনা করেছেন অপূর্ব প্রেমের কবিতা। কিন্তু তাই বলে ঠিক রচনার মুহূর্তে তিনি কিন্তু আর প্রেমিক নন,এক অন্য জগতে বিচরণকারী ধ্যানমগ্ন সৃষ্টিকার। এই ভাবনার দ্বারাই পৃথিবীর প্রথম শ্লোক রচিত হয়। ক্রৌঞ্চ মিথুনের একটিকে নিহত দেখে অপরটি শোকাকুল। দ্বিতীয় পাখীর চিন্তায় বাল্মীকির চিত্ত শোকে আচ্ছন্ন হয়। বাল্মীকির কণ্ঠে তখন ধ্বনিত হয় 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং **ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ**' কিন্তু তখন তিনি শোকার্ত ঋষি নন, অনুভূতির তীক্ষ্ণতাই তাঁকে আবেগে আচ্ছন্ন করে, সেই আবেগই পরোক্ষভাবে তাঁকে শ্লোক রচনায় প্রদীপ্ত করে। এবং যেই মুহূর্তে শ্লোক তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হল,

তখন তিনি আবেগমুক্ত নিরাসক্ত এক কবি বা শিল্পী। প্রত্যেক শিল্পীরই জন্ম এই ভাবে। কাজেই সৃষ্টির মুহূর্তে কোনও চঞ্চলতাই শিল্পীকে স্পর্শ করতে পারে না। কবিতা কবি কোনও একটি সময়ে লেখেন, সংগীতকারের সংগীত যখন বাতাসেও সংগীতের রেশ রেখে যায়, সেই সমস্ত মুহূর্তগুলি বিশেষ সময়। কিন্তু শিল্পীর মনের বিশেষ সময়ের সঙ্গে বস্তুতান্ত্রিক জগতের বিশেষ সময়ের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। তাই পাশ্চাত্যের শিল্পতাত্ত্বিকরা শিল্পীর সৃষ্টি প্রসঙ্গে একটি শব্দকে স্বীকার করে নিয়েছেন তা হল আবেগ (ইমোশন), আবেগ কথাটির সঙ্গে সঙ্গেই আসে আরেকটি শব্দ তার নাম অনুভূতি (ফিলিং)। আবেগ এবং অনুভূতি কথাটি প্রায়শই এক অর্থে ব্যবহৃত হলেও এর মধ্যে পার্থক্য দুস্তর। অনুভূতি যাদের প্রখর হয় আবেগের প্রবলতাও তাদেরই বেশি। অনুভূতির তীক্ষ্ণতার জন্যই আবেগের প্রবেশাধিকার ঘটে। শিল্পী যখন সৃষ্টি করেন তখন সেই সৃষ্টির চরিত্র হন তিনি নিজে। সেই সৃষ্টির পরিবেশ এবং ভূমিকা কাজ করে শিল্পীর মনে এবং তখনকার সেই চিন্তাই শিল্পীর মনে প্রবল হয়ে দেখা দেয়। কোনও চিত্র শিল্পী পথ চলেছেন, হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল চৈত্রের ভরা দুপুরে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা একটি রিক্তশূন্য গাছের উপরে একটি কাক নিঃসঙ্গভাবে ডাকছে। এই পরিবেশ আবহাওয়া, নিসঙ্গতা শিল্পীর মনেও ছড়িয়ে পড়ে তাঁর মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলল এবং এক নূতন আবেগের সৃষ্টি হল, এবং এই আবেগটিই শিল্পীর মনে স্থায়ী হয়ে রইল। এই আবেগ মিশ্রিত বিশেষ অনুভূতি শিল্পীর মন থেকে দূর হল না। যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই অনুভূতিকে প্রকাশের প্রচেষ্টায় শিল্পী নিজেকে নিয়োগ করলেন এবং অঙ্কনের মাধ্যমে শিল্পী যখন অন্য দর্শককেও এই অনুভূতির অংশীদার করলেন তখন কিন্তু সেই অনুভূতির তীব্রতা তত তীক্ষ্ণ হয়ে রইল না শিল্পীর মনে। মেলায় কলরবে মুখরিত ছেলে মেয়েদের অবিমিশ্র আনন্দও শিল্পীর মনে রেখাপাত করে। অন্য অনুভূতির জন্ম দেয়। অর্থাৎ দেখা যায় প্রত্যেকটি শৈল্পিক প্রকাশের নেপথ্যেই আবেগ এবং অনুভূতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই পৃথিবীর যে কোন শিল্পকার্যের মূল ভিত্তিই সৌন্দর্যানুভূতি। কোন শিল্পকার্যে রেখা ও বর্ণের অপরূপ সমাবেশ কখনো বা শুধু সুশৃঙ্খল ধ্বনি সমাবেশ, কখনো বা বর্ণ এবং ধ্বনির সুচতুর লীলাখেলা। এবং এই আনন্দলোক সৃষ্টির মূলে আছে এক ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি। সৌন্দর্যানুভূতি এবং সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতার সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত কল্পনা এবং বোধশক্তি। কল্পনা না থাকলে শিল্পসৃষ্টি যেমন সম্ভব নয় তেমনই বোধশক্তি না থাকলেও শিল্পসৃষ্টি সম্ভব নয়। এই বোধ শুধু মনুষ্য সৃষ্ট শিল্পের মধ্য দিয়েই

নয় পৃথিবীর নিজস্ব সৃষ্ট শিল্প কর্মের উপরেও এই বোধ জন্মগ্রহণ করে।

মানুষ যখন পরস্পরকে সম্পূর্ণ বোঝে, তখনই আসে দয়া, মমত্ববোধ এবং সহানুভূতি। তেমনই প্রকৃতির সঙ্গেও থাকা চাই একান্তভাবে চেনা জানা। যখন বোঝাবুঝির পালা সাঙ্গ হয় তখনই আসে সহানুভূতি বোধ। এই সহানুভূতি না থাকলে শিল্পীর সৃষ্টিকে শিল্পবলে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। কারণ শিল্পার্থ এবং সমঝদারের নিকট গ্রহণীয় অর্থ দুটির অনেক ক্ষেত্রে আছে পৃথক ভূমিকা।

বার্ডস্‌লে তাঁর প্রবন্ধে এই বিষয়টিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন যে, কবিতা কি অর্থ বহন করে এবং কবি কি বোঝাতে চান (হোয়াট এ পোয়েম মিনস্ এ্যান্ড হোয়াট দি পোয়েট মিন্‌ট্ অর্ মিন্‌স্)

এ. জে. অ্যালিস্ তাঁর প্রবন্ধে[৮] 'সিওফি'র সঙ্গে এই মন্তব্য করেছেন যে সাহিত্য সৃষ্টি ক্ষুদ্র বিষয় (লিটারেচার ইজ্ এ মটলি) তাই সাহিত্য পাঠ ও কবিতাপাঠের উপর অর্থাৎ পাঠকের উপরই এটি অধিকাংশ নির্ভরশীল। তেমনি গায়কের চেয়েও সংগীত শ্রোতার উপরই অধিকতর নির্ভরশীল। অনেকে বলে থাকেন কবিতা পাঠ করা হয় কবির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য। তবে এই ক্ষেত্রে মতদ্বৈধের অবকাশ আছে কারণ কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া এই তত্ত্ব ফলপ্রসূ নয়।

এ্যালিস্-এর মতে ইয়েট্‌স-এর কবিতা হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য ইয়েট্‌স-এর জীবনী পাঠের প্রয়োজন কিন্তু চসার-এর ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন নেই। প্রাচ্যে ঋষি অরবিন্দর সৃষ্ট কবিতা 'সাবিত্রী' পাঠের জন্য অরবিন্দর জীবন সাধনার সম্যক উপলব্ধির প্রয়োজন, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তা নয়। কবি জসীমউদ্দীনের কবিতা পাঠের জন্য তাঁর জীবনী পাঠ না করলেও চলে। কবিতার মধ্য দিয়েই তাঁর সবকথা বলা হয়ে যায়।সেইজন্য অ্যালিস্ কবির নিজস্ব ধারণার (পোয়েট'স ওন্ আন্ডারস্ট্যান্ডিং) উপর জোর দিয়েছেন। কিন্তু একথাও অনেক ক্ষেত্রে সত্য হয় না। তাহলে ভ্যান গগের চিত্র তাঁর ইহলোকে বসবাসের সময়েই সমাদৃত হত, কিন্তু তা হয়নি। সর্বাপেক্ষা সুপ্রযুক্ত কথা অ্যালিসের ভাষায় লেখকের অভিপ্রায় কখনো সীমায়িত করে বোঝা যায় না (নো থিওরি অ্যাবাউট দি অথর'স্ ইনটেনশন্স্ উইল হেল্প ড্র দোজ্ লিমিটস্) কাজেই সহানুভূতি বোধের কথাই ঘুরে ফিরে আসে যার কোন সীমারেখা নেই, শুধুমাত্র দুজনের উপস্থিতি দ্বারাও প্রকাশ এবং জ্ঞাপন সম্ভব এবং তাও শিল্প পদবাচ্য হয়। চেনা যখন সম্পূর্ণ হয় তখনই সৃষ্টি হয় অপরূপ শিল্প। কারণ অনুধাবন করলে তখনই আসে যথার্থ রূপ চেনবার প্রয়াস। মনশ্চক্ষে তখন দৃষ্টি গ্রাহ্য রূপ বিলুপ্ত হয়ে ফুটে ওঠে দৃষ্টির

অতীত রূপ। শিল্পী তখন তাঁর ধ্যানের রূপটিকেই চিত্রিত করেন তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এবং জগতকে সেই রূপ চেনাবার প্রয়াসী হন। কিন্তু চেনা যখন সম্পূর্ণ হয় না, তখন সহানুভূতি অনুপস্থিত ফলত কল্পনা অসম্পূর্ণ, ধ্যানের জগতে অন্য ছায়াও পড়ে তখন যে শিল্প সৃষ্টি হয় তা যথাযথ নয়, কারণ তার মধ্যে সত্য এবং সুন্দরের প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপিত হয় না। কাজেই সেই শিল্প হয় অনুকরণ (ইমিটেশন্)।

শিল্পতাত্ত্বিক এখার্টের মতে মানুষের জ্ঞান তিনটি পথের মাধ্যমে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। প্রথমত বস্তু জ্ঞান যা স্বাভাবিক পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধ, প্রতিদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ যা নিতান্ত আক্ষরিক।

দ্বিতীয়ত সমব্যবহারিকা, প্রত্যক্ষ যুক্তিতর্কের দ্বারা উপলব্ধ বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রতীক সম্বলিত কখনো বা প্রচলিত ধ্যানধারণার দ্বারা সীমায়িত।

এই দুটি পথ যে অতিক্রম করতে পারে সেই পৌঁছায় পথের শেষে। যাকে বলা হয়েছে অপরোক্ষ, অর্থাৎ পরমার্থকে তিনি তখন প্রত্যক্ষ করেন শিল্পের মাধ্যমে বা জ্ঞানের মাধ্যমে। সেই জ্ঞান প্রচলিত ধারণার বশীভূত হবে না। অর্থাৎ সেই শিল্পই হবে লোকোত্তর। প্রথম দুটি অবিদ্যার পথ এবং সেই পথ অতিক্রম করে তবেই আসে বিদ্যা।[৭]

একটি নিয়মের দিক থেকে সমস্ত শিল্পই সর্বজনীন তা হল বিন্যাস বা সামঞ্জস্য।

মূলত শিল্পের সৌন্দর্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্ভর করে সামঞ্জস্যের উপর। সামঞ্জস্যের সৃষ্টি হয় প্রধানত বস্তু—তার আকৃতি অতঃপর রেখা, বর্ণ, ধ্বনির বিন্যাসে। সংগীতের ক্ষেত্রে সুরে সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন এবং এই সুরের সামঞ্জস্য রক্ষার প্রকল্পে কতকগুলি নিয়ম থাকে এবং সেই নিয়মের সামঞ্জস্যের উপর প্রধানত সংগীতই সর্বাপেক্ষা 'সর্বজনীন' (ইউনিভার্সাল) হওয়ার পথে অগ্রসর হয়। উদয়শংকরের নৃত্য যা সম্পূর্ণ ভারতীয় ভাবধারায় প্রতিষ্ঠিত তা বিদেশী রাষ্ট্রেও প্রবলভাবে সমাদৃত। রবীন্দ্রনাথের কবিতার অসংখ্য অনুবাদ হয়েছে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের ভাষায়। রবিশংকর, আলী আকবর ইত্যাদি অনেক বাদ্যযন্ত্রী বিদেশে শিক্ষকতা করেন এর মূলেই রয়েছে সহানুভূতির বোধ, প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য, ফলে বাজনার মধ্য দিয়ে যখন সেই সামঞ্জস্যের রূপটি ফুটে ওঠে তখনই শুরু হয় ভাল লাগা। সামঞ্জস্য রয়েছে মানুষের মনের সঙ্গে প্রকৃতির পরিবর্তনের। তাই 'মিয়া কি মল্লার' রাগ পরিবেশন করলে অনভিজ্ঞ বিদেশী শ্রোতাও বৃষ্টির ধ্বনি শোনেন।

মানুষ যখন কোন বস্তুকে বা বিষয়কে সুন্দর বলে সচরাচর তার মধ্যে গুরুত্ব থাকে না। সেইজন্য সৌন্দর্য বা সুন্দরের যথার্থ সংজ্ঞাও আবিষ্কৃত হয় না। কোন বিষয় যখন নয়ন মনোহর বা শ্রবণ সুখকর লাগে তখনই মানুষ তাকে সুন্দর রূপে' অভিহিত করে। সেই প্রকার সুগন্ধ বিশিষ্ট মনোরঞ্জক যা কিছু সবই সুন্দর পদবাচ্য হয়। রুচি কথাটি এর সঙ্গে যুক্ত থাকে। প্রকৃতপক্ষে নিজের যা পছন্দ হয়, তাকেই সুন্দর বলা হলে তা যথার্থ রুচির পরিচায়ক নয়,এর বিপরীতে সকলে যাকে সুন্দর বলে তাকেই সুন্দর বলাও রুচির পরিচায়ক নয়। মানুষের প্রাথমিক বহিঃপ্রকাশ হাসি এবং কান্না দুইই আবেগের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আবেগের প্রকাশ মাত্রই তা সুন্দর নয়। হাসিমুখ দেখলে আনন্দ হয় কিন্তু তাই বলে তাকে সুন্দর বলে অভিহিত করা যায় না। কিন্তু অন্যক্ষেত্রে এই আবেগের প্রকাশকেই সুন্দর বলা হয় কিন্তু তার সঙ্গে কায়দা এবং কৌশল সংযুক্ত। তাই সুন্দরের শ্রেণীবিভাগ করা যায় না।

এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"শুধুমাত্র রসকে ভোগ করা নয় কিন্তু আপনাকে প্রকাশ করা যখন মানুষের অভিপ্রায় হয় তখন সেই বিশেষত্বের বৈচিত্র্যকে ব্যক্ত করার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে তখন সে নিজের আশা, আকাঙ্ক্ষা, হাসি, কান্না সমস্তকে বিচিত্র রূপ দিয়ে আর্টের অমৃতলোক আপন হাতে সৃষ্টি করতে থাকে। আত্মপ্রকাশের এই সৃষ্টিই স্বাধীনতা।"[৮]

দেখবার চোখ এবং শুনবার কান থাকা চাই। তার সঙ্গে মিশ্রিত হবে কল্পনা। সূক্ষ্ম ভাবে ব্যঞ্জনা মণ্ডিত হয়ে যখন শিল্পীর কাজের মধ্য দিয়ে তা ফুটে উঠবে। যেমন মানুষের অন্তরের ভালবাসা তার চোখের ভাষায়,প্রতিদিনের চলার পথের দুঃখ তার মুখের রেখায়, আশা পূর্ণতার আনন্দ তার শরীরে, এর সঙ্গে সংযুক্ত হবে উপযুক্ত ভাষা এবং দর্শকেরও মনে গিয়ে ঠিক সুরে আঘাত করবে তখনই তা হবে সুন্দর। আবেগের প্রধান সহায়ক রূপক এবং অলংকার। মানুষের প্রতিদিনের আনন্দ-বেদনা অর্থাৎ পঞ্চরিপুর অন্তর্গত যে ক্রিয়াকলাপ তাই গভীর ভাবে অনুশীলন করতে হবে দিনের পর দিন, অতঃপর শিল্পী প্রকাশ করবেন তাঁর প্রকাশ করবার ভাষা দিয়ে এবং যে দর্শক বা শ্রোতা সেই 'প্রকাশ' কে যথার্থ বুঝে নিয়ে গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন তিনিই তখন শিল্পীর সেই 'প্রকাশ' ক্ষমতাকে অভিহিত করবেন সুন্দর বলে।

শিল্পী বিভোর হয়ে নিজের মনের ভাবনাটিকে নিখুঁত করে রূপদান করার চেষ্টা করেন। যতক্ষণ এই রূপ কল্পনার ধ্যানের সঙ্গে মূর্ত রূপ এক হয়ে যায় ততক্ষণ

শিল্পীর চিত্ত শান্ত হয় না। তাই সাধারণ মানুষের সঙ্গে শিল্পীর মনের অবস্থা তুলনামূলক ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সাধারণ মানুষ যত সহজে তৃপ্ত হয়, যত তাড়াতাড়ি সুখী হয়ে ওঠে শিল্পীর চিত্তে কখনই তা সম্ভব হয় না। শিল্পীর চিত্ত সদা অসহিষ্ণু, সর্বদাই মনের মধ্যে অপূর্ণতার গ্লানি। কিছু সৃষ্টি করতে না পারার ক্ষোভ সদা জাগ্রত।

মাঝে মাঝে আপন সৃষ্টির পূর্ণতায় আসে ক্ষণিকের তৃপ্তি। পরিপূর্ণ তৃপ্তি যদি কারও মনে আসে তিনি আর তখন শিল্পী থাকেন না। শিল্পী তখন হবেন সাধারণ মানুষ। কারণ নতুন সৃষ্টির প্রেরণাই কখনো কোন শিল্পীকে স্থির থাকতে দেয় না। তাই সত্তর বৎসর বয়সেও উদয়শংকর নতুন সৃষ্টির চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে থাকেন। আটাত্তর বৎসর বয়সেও রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছেন স্মরণীয় নৃত্যনাট্য শ্যামা। নব্বুই বৎসর বয়সেও পিকাসো সৃষ্টি করেছেন ঐতিহাসিক ছবি।

শিল্পী যখনই কিছু দেখেন তখনই তা থেকে কিছু সৃষ্টি করেন তা কিন্তু নয়, অনেক সময়ে দেখা যায় শিল্পী যা দেখলেন তা তাঁর অবচেতন মনে গাঁথা হয়ে রইল, অবশেষে দীর্ঘদিন পরে সেই দেখার স্মৃতি আসে সচেতন মনে, এবং তখনই তা রূপ পরিগ্রহ করে। এর উদাহরণ দেখা যায় অনেক যেমন প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শংকর ছোটবেলা অতিবাহিত করেছেন ঝালোয়ারে। সেখানকার গ্রামে তিনি দেখেছেন নৃত্য। বহু বৎসরে পরে সেই নৃত্যরূপ পরিবেশিত হল বহু অভিজাত দর্শকের সম্মুখে। বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রমণ করতে গেলেন সঞ্জীবচন্দ্রের বাড়ি। সেখানে দেখে এলেন প্রাসাদ, সেই প্রাসাদই ফুটে উঠল দুর্গ হয়ে দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে।

প্রত্যেক শিল্পীর মনেই আছে একটি নিজস্ব জগৎ। আবার অধিকাংশ শিল্পী হন সেই জন্য স্পর্শকাতর। দর্শকদের সঙ্গে, শ্রোতাদের সঙ্গে তাঁদের একটি সম্বন্ধ স্থির হয়ে যায়।

সে সম্বন্ধ হল দেওয়া এবং নেওয়ার। শিল্পী চেষ্টা করবেন কিছু দিতে। দর্শক বা শ্রোতা চেষ্টা করবেন নিতে।

শিল্পীর মনের ক্রিয়া এবং দর্শকের মনের ক্রিয়া কিন্তু একদিক থেকে বিপরীত, কারণ আমরা দেখছি শিল্পীর মনে আগে আসে ভাবনা অতঃপর তারই প্রকাশ হয় কোন মাধ্যমের সাহায্যে অর্থাৎ প্রথমে তা আলোড়ন সৃষ্টি করে অন্তর্লোকে, অতঃপর তা রূপ পরিগ্রহ করে মূর্ত হয় বহির্জগতে। দর্শক কিন্তু প্রথমে শিল্পকে গ্রহণ করেন চক্ষু কর্ণের সাহায্যে। অতঃপর তা ভাবনার সৃষ্টি করে মনের গহ্বরে এবং কিছু চিন্তা করার প্রেরণা যোগায়।

শিল্পীর চিন্তা সব সময়েই প্রকাশের পথ খোঁজে। তাই অনেক সময়েই দেখা যায় অধিকাংশ শিল্পীই যিনি গাইতে পারেন তিনি বাজাতেও পারেন। বা যিনি অঙ্কনশিল্পী তিনি একাধারে ভাস্করও বটে।

যিনিই অভিনেতা তিনিই আবার গায়ক, এসবেরই মূল কথা শিল্পীর মানসিক অতৃপ্তি, এবং তা-ই তাঁকে স্থির থাকতে দেয় না।

অনেক সময়ই দেখা যায় কেউ বা বহু বৎসরের সাধনায় আয়ত্ত করেছেন সংগীত। এবং আরেকজন শুধু নিজের আগ্রহে কোনও রকম অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা ছাড়াই পরিবেশন করছেন সংগীত। তার মধ্যে হয়ত তাল লয়ের সূক্ষ্ম কারুকার্য নেই, তানের ক্ষিপ্রতা নেই। কিন্তু তাই দর্শককে আকৃষ্ট করছে বেশি। এর কারণ কি ? এর থেকেই বোঝা যায়, তাল, লয়, রূপ, রেখা, ধ্বনি সবকিছু ছাড়িয়ে প্রত্যেক শিল্পের মধ্যেই একটা কিছু আছে যা সেই শিল্প সৃষ্টিকে উজ্জ্বলতর করে তোলে। তা হল প্রাণ। মানুষের মধ্যে যেমন প্রাণ আছে, জড় পদার্থের মধ্যেও সেই প্রাণের স্পন্দন যিনি সৃষ্টি করতে পারবেন তিনিই যথার্থ শিল্পী।

শিল্পের প্রথম ধারাটির পরিব্যাপ্তি ঘটে প্রধানত ধর্মবিপ্লব এবং শিল্প বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে। শিল্পতাত্ত্বিক ই. এফ্. ক্যারিট বলেছেন শিল্প দুই প্রকার—জিওমেট্রিক্যাল আর্ট এবং ভাইট্যাল আর্ট।

তাঁর মতে আশাবাদের যুগে, বিশ্বাসের যুগে শিল্প হবে বাস্তব, প্রাকৃতিক এবং প্রয়োজনীয়। কিন্তু মানুষ যে যুগে হতাশার দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে তখন শিল্পও হবে জ্যামিতিক ও দুর্জ্ঞেয়। আশাবাদের যুগে শিল্প হবে মানবিক, হতাশার যুগে শিল্প হবে হেঁয়ালি পূর্ণ, ধর্মীয় এবং কঠোর।[১] কথাকটি প্রণিধানযোগ্য।

প্রত্যেক মানুষের জীবনে সর্বাপেক্ষা বড় প্রভাব পড়ে সমাজের। সেই সমাজ যদি চলমান না হয়, তখন কোন না কোনও সংস্কারের দ্বারা সেই সমাজ স্থিতিশীল এবং কিছুদিন পরে সেই সংস্কারে আচ্ছন্ন সমাজ ব্যবস্থা মানুষের দৃষ্টিকেও আচ্ছন্ন করে তোলে। মানুষের জীবনেও নেমে আসে হতাশা, দিন যাপন হয় গতানুগতিক, ফলে মানুষের সৃষ্টিও হয়ে যায় সীমাবদ্ধ। শিল্প তখন মেনে চলে অনেক আইন, অনেক সংস্কার। ফলে তা নতুন কিছুই সৃষ্টি করে না। তাই শিল্প সৃষ্টির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কোন যুগের শিল্প জিওমেট্রিক্যাল এবং কোন যুগের শিল্প ভাইট্যাল। ষোড়শ শতাব্দীতে ধর্মবিপ্লব হয় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই দুই ধরনের শিল্পের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। দ্বন্দ্ব বলতে এখানে এই অর্থই বোঝায় একের থেকে অপরের উন্নতি

করার প্রয়াস। তখন শিল্প দুটি ধারায় প্রকাশিত হল প্রথমত ক্লাসিক্যাল, দ্বিতীয়ত তারই পাশে পাশে আরেকটি ধারা প্রবাহিত হল তাকে বলা হল রোমান্টিক।

সংগীত, নৃত্য, ভাস্কর্য, সাহিত্য শিল্পের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে দুটি ধারার সৃষ্টি হল।

শিল্পের শ্রেণীবিভাজনে ক্লাসিক্যাল কথাটি পুরাতন। রোমান্টিক কথাটি তার পরবর্তী। ক্লাসিক্যাল অর্থে আমরা সাধারণ ভাবে দেখে থাকি, অতি প্রাচীনকাল থেকে যে প্রথা চলে আসছে, তাকেই আরো উন্নত করে প্রতিষ্ঠিত করা।

সপ্তদশ শতাব্দীতেই রোমান্টিক কথাটির আবির্ভাব। যুগের পর যুগ যখন প্রবাহিত হয় জনসংখ্যা যখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, শিল্পও তখন বহু শাখায় বিস্তৃত হয়। পুরাতন প্রথাকে অতিক্রম করে নতুন কিছু সৃষ্টি করার প্রেরণা যোগায়, যার আদিতে রয়েছে আবেগের ভূমিকা। তাকেই বলা হয়েছে রোমান্টিক।

দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হল দুইয়ের মধ্যে, সৌন্দর্য এবং মহত্বের মধ্যে, যুক্তি এবং ভাবের মধ্যে, নাগরিকতা ও গ্রাম্যতার মধ্যে, ক্লাসিক্যাল ও রোমান্টিক ধারার মধ্যে, নিয়মানুবর্তিতা ও প্রকৃতির মধ্যে, বিশেষ ও সামান্যের মধ্যে।[১০] দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে একই দ্বন্দ্ব।

এই দ্বন্দ্বের প্রয়োজন ছিল বহুদিন থেকেই। কারণ দ্বন্দ্ব না থাকলে নতুন কিছু সৃষ্টি সম্ভব হয় না।

এইভাবে দ্বন্দ্বের পরিণাম হল ঊনবিংশ শতাব্দীতে সংগীতে এবং শিল্পের বিভিন্ন শাখায় রোমান্টিকতার আবির্ভাব।

এই রোমান্টিক কথাটির ব্যাখ্যা কবি করেছেন "রোমান্টিক দিকটা বিচিত্রতার দিক, প্রাচুর্যের দিক, তাহা জীবন সমুদ্রের তরঙ্গলীলার দিক। তাহা অবিরাম গতি চাঞ্চল্যের উপর আলোক ছায়ার দ্বন্দ্ব সম্পাতের দিক। ইহা মানব জীবনে বিচিত্রতাকে গানের সুরে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছে।"

রোমান্টিক শিল্পকলার মধ্যে সংগীতের স্থান মুখ্য। কারণ রোমান্টিক শিল্পের সৃষ্টি প্রধানত 'ভাব'কে কেন্দ্র করেই। আবার সংগীত সৃষ্টিরও প্রধান অবলম্বন ভাব। একথা তর্কাতীত রূপে স্বীকার করা যায়।

রবীন্দ্রনাথও দ্বিধাহীন চিত্তে বলেছেন

"সংগীতের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাব প্রকাশ। ভাবের সঙ্গে সুরের মিশ্রণই ভারতীয় সংগীতের বৈশিষ্ট্য। গান শুধু সুর নয় সুরের সঙ্গে কথার মিলনেই তার পূর্ণতা ; বিচ্ছেদে নয়।"[১১]

তাঁর মতে সংগীত দুই রকম ভাব প্রকাশ করে। প্রথমত বিশুদ্ধ সংগীতের আকারে আর কাব্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে। মানুষের মধ্যে প্রকৃতি ভেদ আছে,

সেই ভেদ অনুসারে সংগীতের দুই রকমের অভিব্যক্তি হয়। হিন্দুস্থানী সংগীতের ক্ষেত্রে বাক্য অতি তুচ্ছ। সংগীত সেখানে স্বতন্ত্র, সে আপনাকেই প্রকাশ করে। রাগ সংগীতের ভাব রাগের দ্বারাই প্রকাশিত হয়। আবার ভাবকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য আলাপে বা তানে অনেক ক্ষেত্রে রাগের শৈথিল্য দেখা যায়। রাগ সংগীতে রাগ মুখ্য হলেও সেই রাগের পরিবেশনার প্রথম উদ্দেশ্যই হল রাগের ভাবমূর্তিকে প্রকাশ করা।

অনেক শিল্পীর মন হয় আশাবাদী। শত লাঞ্ছনাতেও তাঁরা সৃষ্টি করেন। গোপনে এবং প্রকাশ্যে তাঁরা আশা করেন তাঁদের শিল্প আজকের নয়, শতবর্ষ পরে তাঁর সৃষ্টি বুঝতে সক্ষম হবে পৃথিবীর মানুষ। এ সত্য স্বীকার করেছেন ভবভূতি বহু যুগ আগে, যে শিল্পীর শিল্পসৃষ্টি তাঁর জীবিত থাকাকালীন অনাদৃত হতে পারে, কিন্তু কয়েক যুগ পরে হলেও এমন কেউ জন্মগ্রহণ করবে পৃথিবীতে যে শিল্পীর সৃষ্টির সঙ্গে একাত্ম বোধ করবে, সহানুভূতির দ্বারা আচ্ছন্ন হবে। এবং তখনই শিল্পীর সৃষ্টি স্বীকৃতি লাভ করবে। তাই কবি রবীন্দ্রনাথেরও এই আশাই ছিল যে শতবর্ষ পরেও তাঁর কবিতা কৌতূহল ভরেই পঠিত হবে।

শিল্প-সৃষ্টি যেহেতু একান্তভাবেই মানসিক ব্যাপার তাই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরেই শিল্পের সংজ্ঞা পরিবর্তিত হচ্ছে।

দ্বাদশ শতাব্দীতে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শিল্প বলতে বোঝাত একটি ধরনকে যাকে বলা হয় প্যাটার্ন। সেই নির্দিষ্ট পথে কে কত সুন্দরভাবে নিজের শিল্পকে ফুটিয়ে তুলতে পারে তাই সার্থক শিল্প। সর্বদেশের শিল্পের পরিচয় হয়ত পাওয়া যায় না কারণ তখন একদেশের মানুষের সঙ্গে অপর দেশের মানুষের সম্পর্ক সৃষ্টি এত সহজ ছিল না। তবুও প্যাটার্নই যে শিল্প এই কথাটি চীনে বেশ স্থায়িত্ব লাভ করেছিল। ফলে তখন শিল্পীর সৃষ্টিশীলতা প্রকৃত শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি। তা কিছুটা ছিল ঐতিহাসিক, কিছুটা ধর্মীয় ভাবাপন্ন, অর্থাৎ সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি তাঁদের ছিল না এবং অধিকাংশই ছিল পরিবেশ নির্ভর, ফলে সেই শিল্প দেশ কালকে অতিক্রম করতে পারেনি।

তবুও দেখা যায় প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির চিন্তাও এক জায়গায় থেমে থাকে না। তাঁদের চিন্তাধারা পরিবেশ এবং সমাজকে অতিক্রম করে গড়ে ওঠে। ফলে সাধারণ মানুষ তাকে গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না। বুঝতে না পারলে, হৃদয়ে গ্রহণ করতে না পারলে নিজের মনের সঙ্গে না মিললে সেই সৃষ্টি কখনো আদরণীয় হয় না। সেইজন্যই রবীন্দ্রসংগীত যতদিন যাচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে ততই আদরণীয় হচ্ছে। বিটোফেনের শিল্পসৃষ্টির প্রকৃত মূল্যায়ন হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর

শেষে। অতএব আমরা দেখছি শিল্প কথাটির জগৎ পরিব্যাপ্ত। মানুষের যে কোন একটি কৃতকার্যতাকে শুধুমাত্র শিল্প বলে অভিহিত করা যায় না। শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি এই তিনটি পর্যায়কেই প্রকৃতপক্ষে শিল্পের অঙ্গীভূত করা হয়। আমাদের দেশে শিল্পসৃষ্টি এবং যোগাভ্যাসকে একই পর্যায়ে ধরা হয় তার কারণ দুইয়ের পিছনেই চিন্তার গভীরতা, একতা এবং সামঞ্জস্যের প্রয়োজন। এমনকি ভাস্কর্য, মূর্তিশিল্প ইত্যাদিও শুধুমাত্র দেখার চোখ থাকলেই সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। প্রকাশ ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত হয় চিন্তার সমতা এবং একাগ্রতা।

ভারতীয় শিল্প ঈশ্বরের ধ্যান মূর্তিই রচনা করে তিনটি ধারায়। রসব্রহ্ম, নাদব্রহ্ম এবং বস্তুব্রহ্ম অর্থাৎ নাট্যশিল্প, সংগীতশিল্প এবং স্থাপত্যশিল্প। শ্লীল, অশ্লীল, অযৌক্তিক সমস্ত পথই শিল্পের সামনে খোলা কিন্তু সেই পথ অতিক্রম করে এক পরিণতিতে পৌঁছতে হবে তাই হবে শিল্পের অলিখিত দায়িত্ব। যে শিল্প পৌঁছবে তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে তার পথের কথা লেখা থাকবে না। কিন্তু যা অসম্পূর্ণ ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাল না তার পথই সীমাবদ্ধ হয়ে প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। শিল্পসৃষ্টি সেখানে গৌণ।

সুন্দরের সংজ্ঞা এবং শিল্পের সংজ্ঞা এক নয়। পৃথিবীর কোন সৃষ্টিকে শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত হতে গেলেই তাকে সুন্দর হতে হবে এমন কোনও কথা নেই। দেখা যাচ্ছে কোন সংজ্ঞাই শিল্পের পক্ষে সন্তোষজনক হচ্ছে না। যুগে যুগে মানুষের জীবন দর্শন ও শিল্পচেতনার উপরই শিল্পের সংজ্ঞা নির্ভরশীল। কাজেই কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছান মাত্র কয়েকটি কথায় শিল্পের ভবিষ্যৎ নির্ণয় করা কষ্টকর। ধর্ম যেমন মানুষের সমাজ ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, শিল্পও তাই। মানুষের প্রকৃতিকে মার্জিত করে তুলতে একটি জাতিকে সুসভ্য করে তোলার জন্য ধর্মের সঙ্গে শিল্পেরও সমান অবদান আছে। তাই কোন রাষ্ট্রে যখন ধর্মবিপ্লব ঘটে তখন সেই সঙ্গে শিল্পবিপ্লবও ঘটে যায়। অনেকটা সেই কারণেই শিল্পের সঙ্গে পবিত্রতা, সৌন্দর্যময়তা কথাগুলি যুক্ত আছে। এবং অনেকটা সেইজন্যই শিল্প মাত্রেই যে সুন্দর হবে এই মতটি বহু পুরাতন কাল থেকে চলে আসছে।

বিটোফেন শিল্পসৃষ্টির আগের মানসিক অবস্থার সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন। শিল্পভাবনা তাঁর মনে আসে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে, প্রত্যক্ষ রূপে, অপ্রত্যক্ষরূপে হাওয়ায় ভেসে, রাত্রির স্তব্ধতায়, উষালগ্নে বিরাজ করে, সেই ভাবনাকে কবি তাঁর শব্দে সাজিয়ে ফেলেন, অতঃপর সুরে এবং যতক্ষণ তা না করেন ততক্ষণ তাঁর মন বিক্ষুব্ধ থাকে অশান্ত প্রকৃতির মতই।[১২] কাজেই ক্রোচে ঠিক কথাই বলেছেন 'আর্ট ইজ এক্সপ্রেসন্' অথবা কলিংউড বলেছেন 'আর্ট ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ'।

ক্রোচের সঙ্গে মতদ্বৈধতা দেখা দেয় তখনই, তিনি যখন শিল্প মাত্রকেই প্রকাশ বলেছেন, তখনই প্রশ্ন মনে জাগে যা কিছু প্রকাশিত হল সবই কি শিল্প ? তা ত নয়, শিল্পী শিল্প সৃষ্টি করেন, তা শিল্প পর্যায়ভুক্ত হয় তখনই যখন তা রস সৃষ্টি করতে সক্ষম। তাই অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতে 'আর্ট ইজ নট্ এ প্লেজার ট্রিপ, ইট ইজ এ ব্যাটল্।' কারণ শিল্প হল 'নিয়তিকৃতনিয়মরহিতা।

সংগীত শিল্পী সৃষ্টি করলেন গান, কবি রচনা করলেন অপরূপ কবিতা, চিত্রকর অঙ্কিত কবলেন চিত্র। দেখা গেল প্রত্যেকটিই অপরূপ। প্রত্যেকটিই অসাধারণ। কারও ভাষার সঙ্গে কারও ভাষার মিল নেই। কোনটিই অস্পষ্টতা দোষে দুষ্ট নয়, প্রত্যেকটিই উত্তমরূপে স্ফুরিত। সেইজন্য প্রত্যেকটিই শিল্প। তার কারণ আগে রচনা করে মন এবং মস্তিষ্ক। অতঃপর তা প্রকাশ পায়, বহির্জগতে। অবনীন্দ্রনাথ প্রথমে সুন্দরকে কয়েকটি রূপ দেওয়ার চেষ্টা করলেন। (১) সুখদ বলেই সুন্দর, (২) কাজের বলেই সুন্দর, (৩) উদ্দেশ্য এবং উপায় দুয়ের সঙ্গতি হলেই সুন্দর, (৪) অপরিমিত বলেই সুন্দর, (৫) সুশৃঙ্খল বলেই সুন্দর, (৬) সুসংহত বলেই সুন্দর, (৭) বিচিত্র অবিচিত্র সম বিষম দুই নিয়ে ইনি সুন্দর। কিন্তু তারপরই বললেন

"সুন্দর সব সময়ে সুখও দেয় না কাজও দেয় না বিদ্যুৎশিখার মতো বিশৃঙ্খল অসংযত উদ্দেশ্যহীন বিদ্রুত এবং বিচিত্র আবির্ভাব সুন্দরের। সুন্দর, এই কথাই তো বলছে আমাদের—আমি এই নই তা নই, এ জন্যে সুন্দর ও জন্যে সুন্দর নই, আমি সুন্দর তাই আমি সুন্দর।"[১৩]

অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, শিল্পশাস্ত্র গভীর, তার চেয়ে গভীর হল শিল্প, আবার শিল্পের চেয়ে গভীর হল শিল্পীর মন।

অর্থাৎ গুরুত্ব সব থেকে বেশি কার ? না শিল্পীর মনের।

কাজেই শিল্পের প্রকৃত সংজ্ঞা লুকিয়ে আছে শিল্পীর মনে যিনি শিল্প সৃষ্টি করছেন। শিল্পী যিনি শিল্প সৃষ্টি করছেন, কল্পনাই তাঁর প্রধান উৎস, কি দৈহিক, কি মানসিক সর্ব অবস্থাতে। জগতের আর সব কিছু তাঁর কাছে তুচ্ছ। শিল্পী নিজেও জানেন না তাঁর সৃষ্টি কি রূপ নেবে এই অবস্থাতেই সৃষ্টি হয় শিল্প। তার কি সংজ্ঞা হতে পারে ? সংজ্ঞায় বেঁধে ফেললেই মানুষ যদি সেই অনুযায়ী চলে তবে তার সৃষ্টি আর শিল্প হবে না। শিল্পের সংজ্ঞা দেওয়া যায় তাহলে এইভাবে, যুগে যুগে শিল্পীদের জীবনযাত্রা তাঁদের পদ্ধতি এবং সৃষ্টির পর্যালোচনা করে। কিন্তু এমনও হতে পারে পরবর্তী যুগে শিল্পীদের ধ্যান ধারণা পরিবর্তিত হতে থাকলে সৃষ্টি হল আরও উচ্চস্তরের শিল্প, তখন শিল্পের সংজ্ঞাও পরিবর্তিত হতে বাধ্য।

প্রাচ্যের মতানুযায়ী শিল্পের সংজ্ঞা যেমন নির্দিষ্ট করা যায় না, সেইরকমই দেখতে পাই শিল্পের স্বরূপ বলেও নির্দিষ্ট কিছু নেই। শিল্পের স্বরূপ ফুটিয়ে তুলতে হবে শিল্পীকেই। তাঁর প্রাণের পথ ধরে যে মন্ত্র তাঁর মনে আসবে সেই মন্ত্রকেই তিনি দেবেন প্রাধান্য এবং শিল্প সৃষ্টি করবেন। শিল্পীকে যদিও কোন পথ নির্দেশ করে দেওয়া যায় না, তথাপি অবনীন্দ্রনাথের মতে শিল্পীর কর্তব্য শিল্পীর যুগের আগে কি ছিল শিল্প তা তাঁকে জানতে হবে এবং সেইমত নিজের পথ প্রস্তুত করতে হবে।

শিল্পীকে সংস্কার মুক্ত হতে হবে। ধর্মভীতি উপেক্ষা করতে হবে। বন্ধন মুক্ত হতে হবে। সেই হিসাবে বর্তমানের সামাজিক পরিবেশ শিল্পীর পক্ষে অনুকূল যা আগে ছিল না। ভারতবর্ষ বিভিন্ন শিল্পের পীঠস্থান। এর প্রধান কারণই হল, ভারতবর্ষ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে আশ্রয় দিয়েছে। ইওরোপে যা সম্ভব ছিল না। শিল্পের যা ক্ষমতা তাই হল শিল্পের স্বরূপ। শিল্প কি করতে পারে 'মধুমৎ পার্থিবং রজঃ, মধুবাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ অর্থাৎ স্থপতির শিল্পে ধূলি হল মধুমান্, গানের সুরে বাতাস হল মধুময়। শিল্প ভাবসিন্ধুতে রসসিন্ধুতে ডুব দিলে, লবণাম্বু পেল মধুর স্বাদ।[১৪]

শিল্পের স্বরূপ লুকিয়ে থাকে শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির মধ্যে। সেই সৃষ্টি এমনই যা শিল্পীর নিজস্ব পরিচয়কে ফুটিয়ে তুলবে না, বড় করে তুলবে না। শিল্পীকে বড় করবে না, করবে শিল্পকে। রবীন্দ্রনাথের একটি গানের মধ্য দিয়ে এই ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে।

রবীন্দ্রনাথ প্রভাতের বর্ণনা করেছেন :

> 'এই যে হেরিলে চোখে অপরূপ ছবি,
> অরুণ গগন তলে প্রভাতের রবি।"

এখানে আমাদের সকলেরই চোখে ফুটে উঠল মুগ্ধতা। কবির দৃষ্টি দিয়েই আমরা অপরূপ ঊষাকে প্রত্যক্ষ করলাম। কিন্তু এই অপরূপ ঊষার সৃষ্টিকর্তা আর একজন যে অদৃশ্য রচনাকারী তার কথা আমাদের মনে হল না, সেই সকালটি আমাদের কাছে কেমন না,

> 'এই ত পরম দান
> সফল করিল প্রাণ
> সত্যের আনন্দরূপ এই তো জাগিছে।"

শিল্পই যখন সত্য, শিল্পী নয় তখনই শিল্প ফুটিয়ে তুলছে তার স্বরূপকে। শিল্পের সংজ্ঞা, শিল্পের স্বরূপ সবই লুকিয়ে রয়েছে শিল্পীর দৃষ্টিতে, তাঁর অনুভূতিতে। তাই ক্বচিৎ কদাচিৎ শিল্পী তাঁর নিজের জগতেব থেকে চোখ তুলে সাধারণের জন্য দুটি কথা বলেন, বুঝতে হবে তাই সত্য। যা তাঁর অনুভবের মধ্য থেকে প্রকাশ পেয়েছে।

শিল্পী হলেন রূপদক্ষ : অবনীন্দ্রনাথ বলেন

"এরা কথা দিয়ে সুর দিয়ে রঙ রেখা ইত্যাদি দিয়ে রূপ ফোটায়, রচনার অপূর্ব কৌশল সমস্ত আবিষ্কার করে চলে, নতুন নতুন সব রূপসৃষ্টি নিয়ে যেন খেলে চলে।" দেবতা সৃষ্টি করেছেন পরমা প্রকৃতি (নেচার)। মানুষ তা দেখে যেই আনন্দ পেল মনে উদ্রিক্ত হল রস, আর্ট সেই রস এবং আনন্দের মিলিত ফল। রূপ, ভাব, লাবণ্য ইত্যাদি সব কিছুই শিল্পী তাঁর নিজের বুদ্ধিতে আনবেন। অবনীন্দ্রনাথ একটি রঙমাখা কাগজের উপর মাত্র দুটি তিনটি রং-এ একবার তুলি চালিয়ে অপরূপ ছবি সৃষ্টি করতেন। এর নাম অনুভব। আত্মার দুটি ভাগ একটি ইচ্ছা এবং অপরটি বুদ্ধি। যদি ইচ্ছা এবং বুদ্ধি দ্বারা কল্পনা পরিচালিত হয়, তবে সেই কল্পনার বিকাশ হয় পরিণত। এর জন্য চাই শিল্পসৃষ্টির জন্য প্রেরণা। ফলত শিল্প সৃষ্টির আগে কল্পনা হল প্রধান কথা, প্রেরণা হল শেষ কথা। এছাড়া শিল্প সৃষ্টি সম্ভব হয় না। উদ্দেশ্য সেখানে গৌণ। উদ্দেশ্যের কথা মনে রাখলে তা শিল্প হয় না। শিল্প সৃষ্টির পরে তার উদ্দেশ্য বা তার ফলাফল নিয়ে বিচার করা যেতে পারে।

প্রত্যক্ষ ফলাফল পাওয়া যায় অধিকাংশ রূপে সংগীতের ক্ষেত্রে। তাই সংগীতের প্রকৃত রূপ কি তা বিশ্লেষণ করা দুরূহ তবু মনে হয় কবি রবীন্দ্রনাথ তা ভাষায় প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন। "গানের সুরে যখন অন্তঃকরণের সমস্ত তন্ত্রী কাঁপিয়া উঠে তখন অনেক সময় আমার কাছে দৃশ্যমান জগৎ যেন আকার আয়তনহীন বাণীর ভাবে আপনাকে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করে, তখন যেন বুঝিতে পারি জগৎটাকে যেভাবে জানিতেছি তাহা ছাড়া কত রকমভাবে যে তাহাকে জানা যাইতে পারিত তাহা আমরা কিছুই জানি না।"[১৫]

ভারতবর্ষের সংগীত সম্পর্কে বলেছেন :

"আমাদের সংগীত জিনিসটাই ভূমার সুর, তার বৈরাগ্য, তার শান্তি, তার গভীরতা সমস্ত সংকীর্ণ উত্তেজনাকে নষ্ট করে দেবার জন্যেই।"[১৬]

"এই সমস্ত চোখে দেখার রাজ্য কানে শোনার মধ্য দিয়ে হঠাৎ একটা কি নতুন অর্থ লাভ করে। হঠাৎ মনে হয় আমরা যে জগতে আছি বিশেষ করিয়া

কেবল তাহার একটি তলার সঙ্গেই সম্পর্ক রাখিয়াছি—এই আলোকের তলা, বস্তুর তলা, এইটিই সমস্ত নয়।"[১৭]

জেরারডাস্ ভ্যানডার লিউ নামে একজন শিল্পতাত্ত্বিক বলেন চিত্রকর এবং কবির কল্পনার প্রয়োজন। কিন্তু সংগীত যেন ইচ্ছা বা কল্পনার প্রত্যক্ষ রূপ। অনির্বচনীয় 'সৃষ্টি'র বিমূর্ত প্রকাশ।[১৮]

পৃথিবী বলে কোন অস্তিত্ব যদি বিরাজ করে তবে সংগীতও একটি পৃথিবী। দুটি পৃথিবী সমান্তরালভাবে পথ চলে।

ভ্যানডার লিউ-এর মতে সংগীতের অস্তিত্ব কখনও দুঃখ কষ্টের সঙ্গে জড়িত, কখনো বা অংশত ভীষণ, কখনো বা অংশত ঘৃণ্য। তথাপি সবকিছু যখন মিথ্যা হয়ে যায় সংগীতই তখন সত্য বলে। সেই গভীরতর সত্য অন্য পৃথিবী থেকে যার আগমন।[১৯]

আমরা দেখি যে কবি রবীন্দ্রনাথ সংগীতের দ্বারা দ্বিতীয় জগতের অস্তিত্বকে অনুভব করেছেন। এটিই সংগীতেব মুখ্য প্রভাব মানুষের উপর। তাই সংগীত হল শিল্পের মধ্যে উৎকৃষ্টতম। সংগীত মানুষের জীবন দান করতে পারে, দুঃখ ভুলিয়ে দিতে পারে, নাস্তিককে আস্তিক করে তুলতে পারে। এককথায় সব মিলিয়ে জগতের কাছে সংগীতের অদেয় কিছুই নেই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিল্পের নন্দনতাত্ত্বিক উদ্দেশ্য, সংগীতের উদ্দেশ্যবাহকতা

যে শিল্পের সঙ্গে উদ্দেশ্যের অপ্রয়োজনীয়তা এবং আনন্দের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তাকে বলা হয়েছে চারুশিল্প (ফাইন আর্ট)। নিত্য প্রয়োজনীয়, প্রকৃতির পরিপূরক যে শিল্প তাকে বলা হয়েছে কারুশিল্প (ইউজফুল আর্ট)। শিল্পের এই শ্রেণীবিভাগ প্রথম করেছিলেন অ্যারিস্টটল্। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী প্রকৃতির অনুসরণেই শিল্প সৃষ্টি এই কথাটি কারুশিল্পের ক্ষেত্রেই অধিকতর প্রযোজ্য। কারুশিল্পকে জাগতিক পৃথিবীর মধ্যে ধরে রাখা যায়। কিন্তু জাগতিক পৃথিবীর উপরে চারুশিল্পের স্থান। কারুশিল্প হল প্রকৃতির অপূর্ণতার পরিপূরক (টু সাপ্লাই দি ডেফিসিয়েন্সিস্ অব্ নেচার)। অ্যারিস্টটলের পূর্বে শিল্প কথাটি প্রচলিত ছিল তবে চারুশিল্প এবং কারুশিল্পের মধ্যে কোনও ভেদসৃষ্টি করা হয়নি।

শিল্পসৃষ্টির মূলে আছে মানুষের কল্পনাপ্রবৃত্তি। কল্পনা চিন্তারই আর এক রূপ। চিন্তা আসে মনে। কাজেই শিল্প হল উচ্চ শ্রেণীর মননক্রিয়া। শিল্প বলতে আমরা ধরেছি এখানে চারুশিল্পকে। শিল্পের উদ্দেশ্য বলতে সচরাচর কয়েকটি মতামত ব্যক্ত করা হয়ে থাকে। যেমন শিল্পী যে রূপ সৃষ্টি করেন তা হল শিল্প। শিল্পী রূপের মধ্য দিয়ে যে সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলেন তাও শিল্প। শিল্পী মনের ভাবটিকে সুচারুরূপে ফুটিয়ে তুলবেন, একথাও বলা হল। শিল্পী শিল্পের মাধ্যমে দর্শক বা শ্রোতার সুপ্ত আবেগকে জাগ্রত করেন আবার শিল্প কখনও কখনও শুধুমাত্র দর্শকদের আনন্দদানও করে। সে রূপের মাধ্যমেই হোক্ বা ভাবের মাধ্যমেই হোক।

শিল্পী সৌন্দর্যসৃষ্টি করেন, সে সৌন্দর্যসৃষ্টি হয় প্রধানত রূপের মাধ্যমে, তবে তা সাধারণ কোনও সৌন্দর্যসৃষ্টি নয়। এ বিষয়ে প্রথম আলোকপাত করেন ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডার গট্‌লিয়েব বোমগার্টেন তাঁর এস্থেটিক নামক গ্রন্থে। তিনিই প্রথম বলেন শিল্পী শিল্পের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করেন এস্থেটিক বিউটি

বা শৈল্পিক সৌন্দর্য। কিন্তু শিল্পী যদি শুধু সৌন্দর্যসৃষ্টি করেন তার সঙ্গে শ্রোতার বা দর্শকের কোনও সম্পর্ক রইল না।

গায়ক আলাপ, বিস্তার, তান ইত্যাদি অলংকার সহযোগে সংগীত রচনা করলেন, তার গঠন ও কলাকৌশল অপরূপ। কিন্তু সেখানে কোনও শ্রোতা উপস্থিত ছিল না। শুধু যদি সৌন্দর্য সৃষ্টিই সেই গানের উদ্দেশ্য হয় তবে তা সেখানেই শেষ হয়ে গেল, দর্শকের মাপকাঠিতে তার কোনও বিচার হল না।

শিল্পী অর্ন্তনিহিত ভাবকে সুচারুরূপে ফুটিয়ে তুললেন, কিন্তু জনসমক্ষে তা প্রকাশ করলেন না কাজেই তা শিল্পরূপে কখনোই বিবেচিত হতে পারে না। অনেকে বলেন শিল্পী দর্শক বা শ্রোতার সুপ্ত আবেগকে জাগ্রত করেন। শিল্পী আবেগ জাগাতে সক্ষম হন সত্যি কথাই। বাক্ তাঁর অর্গানে এমন সুর সৃষ্টি করতেন যা শ্রোতার চোখকে অশ্রুসিক্ত করে তুলত। বাক্ কিন্তু সচেতন মনের প্রয়াসে এই যন্ত্রসংগীত সৃষ্টি করেননি যা শ্রোতার চোখকে অশ্রুসিক্ত করে তুলতে সক্ষম হয়। এই ক্রন্দন আনন্দেরই আর এক রূপ। প্রকৃত শিল্প আবেগকে জাগ্রত করে সত্য কথাই কিন্তু সেই আবেগ কখনোই দর্শক বা শ্রোতাকে ভুল পথে চালিত করে না। শিল্প উপভোগের মধ্য দিয়ে হাসি বা কান্না যে অবস্থাই দর্শক বা শ্রোতা প্রাপ্ত হন না কেন তারই মাধ্যমে তাঁদের মানসিক অবস্থার রূপান্তর ঘটে। এই রূপান্তরীকরণের মাধ্যমে শ্রোতার বা দর্শকের যে উপলব্ধি ঘটে সেই উপলব্ধিরই চরম প্রকাশ হল আনন্দ। অর্থাৎ প্রত্যেকটি প্রকৃত শিল্পসৃষ্টির অন্তিম ফল আমরা পেয়ে যাই। দেখা যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে যেন মনে হচ্ছে শিল্পী শুধুমাত্র জনতার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। তাঁর নিজের কোনও ব্যাকুলতা বা বেদনা এর জন্য ছিল না মনে হয়। কিন্তু তা নয় শিল্পীর মনের বেদনাই শিল্পসৃষ্টি করে সত্য কথাই, কিন্তু শিল্পীর চরম প্রাপ্তি আসে দর্শকের মধ্য দিয়েই। শিল্প যখন সৃষ্টি হয় তখন আনন্দ লাভ করেন দর্শক এবং শ্রোতা। এই আনন্দদানের সংজ্ঞা বিভিন্নজনের কাছে বিভিন্নরকম। বহু শিল্পতাত্ত্বিক এর সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

অনেকেই শিল্প এবং সুন্দরকে সমার্থক করে দেখেছেন, কারণ কালজয়ী শিল্প মাত্রেই সুন্দর সৃষ্টি। এ বিষয়ে প্রথম আলোকপাত করেন অ্যারিস্টটল। তাঁর মতে সৌন্দর্যই শিল্প জনপ্রিয়তার মাপকাঠি, সুন্দর হলেই তবে সেই শিল্প আনন্দদান করতে সক্ষম হয়। অ্যারিস্টটল ঠিকই বলেছেন, সৌন্দর্য নিরূপণের মাপকাঠিটিই আজ পর্যন্ত সর্বসম্মতিক্রমে নির্ধারিত হয়নি। কারণ অনেকে অসুন্দরের মধ্যেও সুন্দর দেখে থাকেন, কি করে দেখেন সেই গূঢ় -তত্ত্বটি ব্যক্ত

করেছেন রবীন্দ্রনাথ মাত্র দু-একটি কথায়—

'অসুন্দরের পরম বেদনায় সুন্দরের আহ্বান।
মর্তের অভিশাপে স্বর্গের করুণা যখন নামে
তখনি তো সুন্দরের আবির্ভাব
প্রিয়ে, সেই করুণা কি তোমার হৃদয়কে
কাল মধুর করেনি ॥[২]"

অর্থাৎ হৃদয় যখন মধুর থাকে তখন জগত সুন্দর। কাজেই সৌন্দর্য বিচারের মাপকাঠি নির্ণিত হতে নাও পারে তবে শিল্প বিচারের মানদণ্ড স্থিরীকৃত করলেও করা যেতে পারে। কারণ শিল্প মাত্রেই তা সুন্দর হতে পারে কিন্তু সুন্দর অর্থেই যে শিল্প হবে এরকম কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। কারণ পৃথিবীতে অনেক কিছুই সুন্দর বলে চিহ্নিত হতে পারে।

নিম্নলিখিত রূপে সুন্দরের শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে।

ক) যা সুনীতিবর্ধক তাই সুন্দর।

খ) যা সামাজিক হিতসাধন করে তাই সুন্দর।

গ) যা বিশেষ উপায়ে প্রকাশের বা ভাব বিনিময়ের প্রয়োজন সিদ্ধ করে তাই সুন্দর।

ঘ) যা প্রতিভার প্রকাশ তাই সুন্দর।

ঙ) যা প্রকৃতির অনুকরণ তাই সুন্দর।

চ) যা প্রকাশ মাধ্যমের বা উপাদানের সুপ্রযোজনার ফল তাই সুন্দর।"[৩]

এর প্রত্যেকটিই কখনোই শিল্প হতে পারে না।

প্লেটো শিল্পকে দেখেছেন 'অনুকরণ' রূপে, সেইজন্যই তিনি শিল্পকে নিকৃষ্টরূপে চিহ্নিত করেছেন, অ্যারিস্টটল অনুকরণ বলে স্বীকার করেছেন, কিন্তু তাকে নিকৃষ্ট বলে কখনোই মনে করেননি। উপরন্তু তিনি সুন্দর বলে তাকে চিহ্নিত করেছেন। কোনও সুন্দর সৃষ্টি মানুষের অন্তরকে প্লাবিত করতে সক্ষম কাজেই যে সৃষ্টি মানুষের অন্তরকে তথা বিবেককে পরিশুদ্ধ করে তা যে কখনও অমঙ্গলসূচক হতে পারে না এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল্ উভয়েই শিল্পের সংজ্ঞা বা উৎপত্তি কেন ও কোথায় এই নিয়েই চিন্তিত ছিলেন কাজেই তার উদ্দেশ্য কি তা নিয়ে কোনও আলোচনা করেননি।

এরপর শিল্পতত্ত্বে উল্লেখযোগ্য মত প্রদানের ক্ষেত্রে এলেন প্লটিনাস।

প্লেটো যেখানে শিল্পকে অনুকরণ বলেই মিথ্যা বলে রায় দিয়েছিলেন, সেখানে প্লটিনাস বললেন এই অনুকরণ প্রক্রিয়াও কখনোই আপন ক্ষমতার দ্বারা সম্পন্ন

করা সম্ভব নয়। এর জন্য দৈবক্ষমতার প্রয়োজন। ফলে তিনি শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে ঈশ্বরের যোগসাধন করলেন। প্লটিনাসের মতে প্রকৃতির অপূর্ণতাকেই শিল্পীরা পূর্ণ করেন শিল্পের মাধ্যমে। ভাবের আবেগে বা যে কোনও চিন্তার দ্বারা এই প্রক্রিয়া যদি সংগঠিত হত তাহলে যে কোনও মানুষই শিল্প সৃষ্টি করতে সক্ষম হত, কিন্তু তা ত নয়। ভাব সর্বদাই দৈব নির্দেশিত, "সেই হেতু শিল্পের সৌন্দর্য নির্ভর করে তার ভাবগ্রাহিতার তথা দৈবসত্তার মাত্রার উপরেই।"

"প্লটিনাস সৌন্দর্যকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন—১) মানবীয় প্রজ্ঞার সৌন্দর্য, ২) মানবাত্মার সৌন্দর্য এবং ৩) প্রাকৃত সৌন্দর্য।

প্লটিনাস তিন শ্রেণীর সৌন্দর্যের নাম করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু সৌন্দর্যের কোনও পরিষ্কার শ্রেণী বিভাগ করেন নাই।"[৪]

আমার মতে প্লটিনাস সৌন্দর্যের শ্রেণীবিভাগ ঠিকই করেছেন। কারণ তাঁর বিচারে তিন শ্রেণীর সৌন্দর্যের মধ্যে প্রাকৃত সৌন্দর্যের স্থান তৃতীয়। তার কারণ প্রকৃতির যে অবাধ সৌন্দর্য থাকে তাকে উপলব্ধি করার জন্য মানুষের বুদ্ধির বা হৃদয়ের বিশেষ কোনও প্রয়োজন নেই। মানুষ তাকে সুন্দর না বললেও সেই 'সুন্দর' সুন্দরই থাকবে। কিন্তু মনুষ্য সৃষ্ট সৌন্দর্য উপলব্ধির জন্য মানুষের বুদ্ধি বা হৃদয় তথা সংবেদনার অর্থাৎ স্বীকৃতির প্রয়োজন।

মানবাত্মার সৌন্দর্য বলতে তিনি বুঝিয়েছেন যে সৌন্দর্য মানুষের হৃদয় দ্বারা উপলব্ধ হয়। রবীন্দ্রনাথের মতে হৃদয়কে মধুর করে তবেই সুন্দরকে উপলব্ধি করা যায়। 'হৃদয়ে হৃদয়ে মিলে যায় যেথা' সেখানেই সুন্দরের উপলব্ধি। মানবীয় প্রজ্ঞার সৌন্দর্য বলতে বুঝিয়েছেন যে সৌন্দর্য উপলব্ধির জন্য মানুষের বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা ফলতঃ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। বুদ্ধি দ্বারা যে সৌন্দর্যের উপলব্ধি সেই সৌন্দর্যই শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য।

যাবতীয় শিল্পসৃষ্টিই এই শ্রেণী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এরপর অনেকেই শিল্পসৃষ্টিকে ঈশ্বরের দয়া বলে অনুভব করলেন। মানুষ জন্মগ্রহণ করার পরই তার প্রথম কর্তব্য হল নিজেকে পৃথিবীতে টিকিয়ে রাখা। প্রতিনিয়তই মানুষ সংগ্রাম করে এক অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে যে তাকে এই পৃথিবীতে এনেছে সে যেন তাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যেতে না পারে। ফলে তাকে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়গুলি তাকে জানবার প্রয়াস করতে হয়। জানার মধ্য দিয়েই সে সংগ্রহ করে অভিজ্ঞতা সেই সঙ্গে উপলব্ধি।ফলতঃ অভিজ্ঞতা যত বাড়ে সংগ্রহের দ্বারও ততই মুক্ত হয়। সেই দ্বারের মাধ্যমে সে রূপ সংগ্রহ করে। রসের মাধ্যমেই সে সংগ্রহ করে আনন্দ। পৃথিবীতে

আনন্দপ্রাপ্তির কোনও শেষ নেই। দুঃখের মধ্য দিয়েও মানুষ আনন্দ পায়, কারণ দুঃখের অবসানেই আসবে আনন্দ। কবিগুরু যে উপলব্ধির দ্বারা লিখেছেন,

'দুঃখ যদি না পাবে ত দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে,
বিষকে বিষে দাহ দিয়ে দহন করে মারতে হবে।'[৫]

আনন্দ মানুষকে সর্বদাই সম্মুখের দিকে এগিয়ে দেয় কারণ আনন্দ ত অশেষ। এই ভাবেই মানুষ সচ্চিদানন্দের সঙ্গে পরিচিত হয়।

শিল্পসৃষ্টির মূলে যাই থাক না কেন শিল্পের অন্তিম পরিণতিতে দেখি তা আনন্দে রূপান্তরিত হচ্ছে। কারণ শিল্পসৃষ্টির মূলে যদি গবেষণা করা যায়, দেখা যায় যে প্রকৃত সৃষ্টির সময়ে কোনওভাবে কোনও উদ্দেশ্যই সেখানে বিরাজ করে না। শিল্পসৃষ্টির মূলে আছে মানসিক ভাবনাকে প্রকাশ করবার ব্যাকুলতা। কিন্তু প্রকাশ করবার মাধ্যমটি ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন হয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রাণের আকুলতা প্রকাশ করেছেন কবিতার মধ্য দিয়ে,

'আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত পাখির গান।
না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বেদনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে
নারি ॥[৬]

জীবনানন্দের ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে অন্য ভাবে,

'রয়েছি সবুজ মাঠে-ঘাসে
আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে আকাশে :
জীবনের রং তবু ফলানো কি হয়
এই সব ছুঁয়ে ছেনে !—সে এক বিস্ময়
পৃথিবীতে নাই তাহা—আকাশেও নাই তার স্থান
চেনে নাই তারে তাই সমুদ্রের জল !"[৭]

মদনের আরতিতে শিবের যখন ধ্যান ভঙ্গ হয়, শিবের সেই সংহার মূর্তি বিভীষিকা জাগায় মনে। সেই সংহার মূর্তির কথা চিন্তা করলেন নৃত্যশিল্পী, ছন্দে

ছন্দে রূপে ভঙ্গিমায় অপরূপ করে ফুটিয়ে তুললেন সেই তাণ্ডব রূপ। মুগ্ধ হল দর্শক। শিল্পীর প্রকাশ বেদনা হল সার্থক। আনন্দ পেল দর্শক। প্রমাণিত হল শিল্প হল অনুকরণ।

নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর আনাপাভলোভার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুললেন অজন্তাগুহার জীবন্ত চিত্র। এখানে অনুকরণ প্রথায় গড়ে উঠল ছবি। কিন্তু একে শিল্পের মর্যাদা দিতেই হবে। কারণ শিল্পের যে কয়েকটি উদ্দেশ্য যেমন প্রকাশ করবার আকুলতা, দর্শক এবং শ্রোতাকে আনন্দ দান, সৌন্দর্যসৃষ্টি প্রত্যেকটি উদ্দেশ্যই এখানে সার্থক।

রবিশঙ্কর এবং আলী আকবর খান যখন সেতার এবং সরোদ বাজাচ্ছেন একই সঙ্গে ছন্দে, লয়ে, তালে মূর্চ্ছনায়, সৃষ্টি হয় অপূর্ব সুর লহরী। তাও সার্থক শিল্প। কারণ শ্রোতা পাচ্ছেন আনন্দ, সার্থক সৌন্দর্য সৃষ্টির দিক দিয়ে শিল্পীদ্বয় উত্তীর্ণ। কিন্তু সব শিল্পের পিছনেই একটি ধারা কাজ করছে তা হল অনুকরণ।

প্লেটো বলেছেন বাস্তব জগৎ 'আইডিয়া'র অনুরূপ। শিল্প বাস্তব জগতের অনুকরণ। প্রত্যক্ষভাবে বলা যায় শিল্পের উদ্দেশ্য আনন্দ দান। এখানে প্রত্যেক শিল্পকে পৃথক রূপে বিশ্লেষণ করা যাক।

সংগীত অর্থাৎ গীত, বাদ্য, নৃত্য যখন যথার্থ শিল্পরূপে পরিবেশিত হয় তখন তা নির্মল আনন্দ দান করে, এর পিছনে কোনও প্রয়োজন দেখা দেয় না। কিন্তু কাব্য এবং সাহিত্য সম্পর্কে সে কথা খাটে না। সুন্দর কাব্য এবং সাহিত্য কালজয়ী হয় এবং শিল্প তখনই কালজয়ী হয় যখন তা অনুকরণকে অতিক্রম করে উঠতে পারে।

কবি কাব্য সৃষ্টি করেন। আমরা অনেক সময় বলে থাকি কবি মাত্রেই উদাস, সাজ পোশাকের প্রতি দৃষ্টি থাকে না বাস্তব জগত সম্বন্ধে সচেতন থাকেন না। কথাটির মধ্যে সত্য আছে। এই কথাটির মূলে কাজ করে কবির মনোভাব। তাঁর মন এমন এক জগতে ক্রিয়া করে যেখানে বাস্তবজগতের নিয়মের বাধ্যবাধকতা নেই। তিনি চেনা জগতের শব্দ দিয়ে অচেনা জগতের বাক্য সৃষ্টি করেন। তার মধ্যে ছন্দ থাকে সুর থাকে কিন্তু তাৎক্ষণিক মানে ধরা পড়ে না। পাঠক তখন চিন্তা করেন। অর্থ বুঝবার চেষ্টা করেন। তখনই পাঠকের অজান্তে তাঁর মনে ক্রিয়া করে 'কাল'কে অতিক্রম করার প্রবণতা। ধূলি মলিন পারিপার্শ্বিক থেকে উপরে উঠবার প্রচেষ্টা। তাই কবিতা হয় কালজয়ী। কবিতা শিল্পের উদ্দেশ্য শুধু আনন্দদান নয়, উর্ধ্বলোকের সন্ধান দেওয়াও তার উদ্দেশ্য। যে জগতে সত্য, শিব এবং সুন্দরের অধিষ্ঠান পাশাপাশি।

সাহিত্য শিল্পের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে পাঠকের উপর। সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত আছে নাটক, ছায়াচিত্র, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য ইত্যাদি বহু পরিবেশনা। সাহিত্যপাঠ করেই পাঠক এর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। ক্ষুব্ধ হয়, ক্রুদ্ধ হয়, বিচলিত হয়, আনন্দিত হয়। এবং আশাপূর্ণতাজনিত প্রফুল্লতা অনুভব করে। মনের মধ্যে যখন এতগুলিভাব ক্রিয়া করে তখন তার ফলশ্রুতিও থেকে যায়, তা হল বিচারবোধ, পাঠক অনুভব করে ভাল এবং মন্দের পার্থক্য, সর্বাপেক্ষা বড় কথা. পাঠকের মনে প্রভাব পড়ে। মনের মধ্যে যুক্তি তর্কের সূচনা হয়, ভালমন্দের বিচারবুদ্ধি জাগ্রত হয়। অর্থাৎ শিল্পের মধ্যে আনন্দদানের সঙ্গে মিশে যায় প্রয়োজন। সেইজন্য সুসাহিত্যের, শিশুসাহিত্যেরও কিছু দায়িত্ব থেকে যায়। তাই সাহিত্যের ক্ষেত্রেই সীমালঙ্ঘনের প্রশ্ন ওঠে। অনেক চিত্র এবং ভাস্কর্য সন্ধান দেয় সুন্দরের। যেমন 'মোনালিসা'র ছবি, ভেনাসের মূর্তি।

জাঁ পল সার্ত্রে বলেন—"রং বা ধ্বনি নিয়ে কাজ করা এককথা, ভাবকে শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা অন্য কথা।"[৮]

লেখকের এই বক্তব্যের কারণ হল সমগ্র শিল্পের মধ্যে সাহিত্যই সর্বাগ্রে বুদ্ধির দ্বারে আঘাত করে। এছাড়া সমাজের কল্যাণের জন্যও সাহিত্যই অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করে আবার সে সাহিত্যের দায়িত্বও কম নয়। তাকে কালজয়ী হতে হবে, লোকোত্তর হতে হবে তা না হলে সে সাহিত্য মানুষের দৃষ্টির বা মনের আড়ালে চলে যাবে সকলের অজান্তেই। অবশ্য এ সমস্যা শুধু সাহিত্যের নয় সাহিত্য, সংগীত, চিত্র, ভাস্কর্য প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এই সমস্যা দেখা দেয়। আবার শিল্পই জগতের সেরা মুহূর্তকে সৃষ্টি করতে পারে এ ক্ষমতাও শুধু শিল্পেরই আছে।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন এই প্রসঙ্গে বার্গসোঁর মতকে ব্যাখ্যা করেছেন।

"এই যে (ফ্লাক্স) গতি, এই বিসৃষ্টি ও বিসর্জন চলেছে, তার কোনও মুহূর্ত চয়ন করাকে বার্গসোঁ অলীক ব্যাপার বলে মনে করেন। তিনি বলেন এই অঘটন ঘটন-পটিয়সী শক্তি শুধু আর্টের আছে। 'বিকামিং' বা প্রবাহকে মন্ত্র বলে নিরস্ত করে ঘোমটা খুলে তাকে চিরন্তন শ্রী দান করা এ মন্ত্র কবি ও শিল্পীরাই জানে, এ ইন্দ্রজাল শুধু তাদের হাতেই সম্ভব হয়।"

শিল্প উপলব্ধির মুহূর্তে মানুষের অনুভব ক্ষমতাকে যদি বিশ্লেষণ করা যায় দেখা যাবে কোনও দর্শক বা শ্রোতাই প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেবে না বা প্রয়োজনকে আনন্দের সঙ্গে একত্র করে দেখবে না, কারণ আনন্দোপলব্ধির চরম বা পরম মুহূর্তে কোনও উদ্দেশ্যই কাজ করে না। তবে আনন্দোপলব্ধিরও শ্রেণী বিভাগ আছে। শিল্পতত্ত্বে 'হেড়নিস্ট' কথাটি প্রচলিত আছে। যাঁরা শিল্প উপলব্ধির

আনন্দকে কোনও উদ্দেশ্য পরিপূরণের আনন্দ বলে মনে করে থাকেন, শৈল্পিক আনন্দকে তাঁরা ইন্দ্রিয়জ আনন্দের সমতুল করে দেখেন। মানসিক বা শারীরিক ইচ্ছা পরিপূরণের উপায় বলে মনে করেন।

ম্যাক্সমূলার সে অবস্থাটির নাম দিয়েছেন ডিজি হাইট্ অর্থাৎ উদভ্রান্ত অবস্থা। কিন্তু এই আনন্দপ্রাপ্তি উচ্চশ্রেণীর নয় বা উদ্দেশ্যমুক্তও নয়। আবার একই শিল্পসৃষ্টিতে সকল দর্শক শ্রোতা একই আনন্দ পাবেন এ কখনোই সম্ভব নয়, অভিজ্ঞতাই আমাদের সেই কথা বলে তাহলে শিল্পের উদ্দেশ্যও সেই সঙ্গে স্থিরীকৃত হয়ে যেত। আনন্দের পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি বলেই শিল্পের উদ্দেশ্য বা সৌন্দর্য বিচারের মাপ নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। কাজেই হেডনিস্টিক আনন্দ ছাড়াও আরও আনন্দোপলব্ধির স্থান নিশ্চয়ই আছে। যাকে বলা হয়েছে 'ডিসইন্টারেস্টেড প্লেজার' বা ইমপারসোনাল প্লেজার। অপ্রয়োজনের আনন্দ বা নৈর্ব্যক্তিক আনন্দ।

কিন্তু শ্রীসাধন ভট্টাচার্য বলেন,

'আনন্দ মাত্রেই ব্যক্তিবাসনার পরিপূরণজনিত মানসিক অবস্থা বিশেষ এবং সেই হিসাবে লৌকিক বা ইন্টারেস্ট আশ্রয়ী। তা হলে আনন্দ অলৌকিক (ডিসইনটারেস্টেড) হবে কি করে? প্রয়োজন বিমুক্ত হবে কি করে? সুতরাং শিল্প অলৌকিক বা অপ্রয়োজনের আনন্দ সৃষ্টি করে একথা বলার তাৎপর্য কি? ও কথার কোনও বিশেষ অর্থ আছে কি? লৌকিক আনন্দের পরিণাম সম্ভব কি?'[২]

অর্থাৎ তিনি আনন্দকে সীমাবদ্ধ করে ফেললেন। আনন্দকে তিনি প্রয়োজন বিমুক্ত বলে মনে করেন না। কারণ আনন্দ যখনই লৌকিক জগৎকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তখনই তা অলৌকিক হতে পারে না। তাহলে হেগেল বা স্পিনোজা যে আনন্দকে বলেছেন ব্রহ্মানন্দ, কাণ্ট যে আনন্দকে বলেছেন উপলব্ধির আনন্দ এগুলি ও হেডনিস্টের আনন্দ নয় তবে এই আনন্দের উপলব্ধি মিথ্যা হয়ে যায়।

প্লটিনাসও প্রকৃতপক্ষে আনন্দের এই ভাবেই শ্রেণী বিভাগ করেছেন। কিন্তু শিল্প সৃষ্টির মূল উৎস যেখানে সেই জায়গা অর্থাৎ সৃষ্টিশীল মনকেই আমরা কখনও বলছি আবেগময়, কখনও বলছি দৈবানুভূতি যার দ্বারা শিল্প সৃষ্টি হচ্ছে, কখনও বলছি আবার মানসিক অতৃপ্তিই শিল্প সৃষ্টির প্রেরণা। কাজেই সেই শিল্পের দ্বারা আনন্দপ্রাপ্তি কি করে লৌকিক হতে পারে?

শ্রীযামিনীকান্ত সেন এই অবস্থাটির ব্যাখ্যা করেছেন,

"বাস্তবকে নিয়ে যেখানে অতৃপ্তি সেখানে তারই সঙ্গে আর্ট যোগ করেছে

মনের একটুখানি লীলা প্রসঙ্গ—যাতে তা সম্পূর্ণতর ও সঙ্গততর হয়েছে। এজন্য আর্ট বৃহত্তর ও গভীরতর জীবন।"[১০]

এই প্রসঙ্গে সকলের আগে আসে সংগীতের বিষয় সেই সঙ্গে আসে কবিতার কথা। আগেকার দিনে রাজা সংগীতের সুরে মুগ্ধ হয়ে, কবিতার ছন্দে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সভাকবিকে, সভাগায়ককে পুরস্কৃত করতেন। এর কারণ কি ? কারণ আর কিছুই নয়, রাজার নানা চিন্তা ভাবনার মধ্যে কবিতা ও সংগীত তাঁর মনকে ক্ষণিকের জন্য মুক্তি দিত, আনন্দের মাধ্যমে। এই আনন্দই তাঁকে অনন্তের পথে এগিয়ে দিত। এই আনন্দ হেগেলের ব্রহ্মানন্দ। যে আনন্দ সর্বদাই আমাদের বিশেষের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

'আনন্দ মাত্রেই ব্যক্তিবাসনার পরিপূরণজনিত' যতক্ষণ, ততক্ষণই সেই আনন্দ 'লৌকিক আশ্রয়ী'। কিন্তু তারপর ? মানুষ যখন নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না উপচে পড়ে চতুর্দিকে মানুষ তখন সেই আনন্দের অংশীদার করতে চায় অন্যকে, অর্থাৎ অপরের মঙ্গলের জন্য চিহ্নিত হয়। চিত্ত শুদ্ধি ঘটে যখন তখন সেই আনন্দই হয় অলৌকিক। হয় প্রয়োজন বিমুক্ত।

মানুষ যখন বুদ্ধি দ্বারা আনন্দ উপভোগ করে সেই আনন্দও প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে। আনন্দ উপলব্ধির জন্য তার মন প্রস্তুত। সেই আনন্দ জগৎকে উপেক্ষা করে নয়, হঠাৎ পাওয়া নয়, সে আনন্দ প্রজ্ঞার মাধ্যমে, সম্পূর্ণ উপলব্ধির আনন্দ। এই আনন্দ নৈর্ব্যক্তিক। কান্ট এই আনন্দকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এই আনন্দোপলব্ধি সম্পূর্ণ অলৌকিক না হতে পারে, কিন্তু একে কি লৌকিক বলা চলে ? বা প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ বলা চলে ! তা কখনোই সম্ভব নয়। তাই প্রত্যেক শিল্পতাত্ত্বিককে আনন্দোপলব্ধিকে কম বেশি প্রাধান্য দিতে হয়েছে। কারণ শিল্পেব আর কোনও উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না যা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আনন্দ উপভোগ শিল্প সৃষ্টির অবশ্যম্ভাবী ফল না হতে পারে, কিন্তু ঘটে যায় অজান্তেই। পরিকল্পনার মাধ্যমে আনন্দ আসে না কিন্তু হঠাৎ আসে। শৈল্পিক আনন্দ তাকেই বলে। অনন্তকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। রামকৃষ্ণ তাঁর উচ্চমার্গের সাধনায় অনন্তকে উপলব্ধি করার প্রচেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ধরে রাখতে সক্ষম হতেন না। প্রকৃত শিল্প শৈল্পিক আনন্দের মাধ্যমে মানুষকে অনন্তের পথে এগিয়ে দেয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পাশ্চাত্যের শিল্পতাত্ত্বিকদের মতামত ও আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত অনুসরণ করলে দেখা যায় তাঁরা বলেছেন শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য আনন্দ দেওয়া তথাপি তার একটা প্রয়োজনের দিকও আছে

যেমন নীতিশিক্ষার সঙ্গে শিল্পের সম্বন্ধ আছে। যার জন্য ক্যাথারসিস কথাটির উৎপত্তি।

দ্বিধাহীন ভাবে যাঁরা শিল্পের সঙ্গে প্রয়োজনের সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন হোরেস, কোম্‌তে, রাসকিন ইত্যাদি।

দ্বিধান্বিত চিত্তে যাঁরা শিল্পকে প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন এ্যারিস্টটল্‌, ভিক্টর হিউগো ইত্যাদি।

ক্রোচেকে এই দুই তরফ থেকেই বাদ দেওয়া যায় কারণ ক্রোচের দৃষ্টিভঙ্গি কোনওরকম অস্পষ্টতা দ্বারা আচ্ছন্ন নয়। তিনি শিল্পীর প্রকাশ ক্ষমতার উপরই সম্পূর্ণ জোর দিয়েছেন। সে নীতিশিক্ষা দিক বা না দিক, আনন্দের উদ্ভব হোক্‌ না হোক্‌ তার সঙ্গে শিল্পের কোনও সম্পর্ক নেই। শিল্পী তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা দিয়ে যা প্রকাশ করবেন, যে মাধ্যমে প্রকাশ করবেন তাই হল শিল্প।

কারণ তাঁর মতে মানুষের অন্তর্নিহিত প্রকাশ ক্ষমতা যখন নিখুঁত হয় তখনই তা শিল্পপদবাচ্য হয়।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে মানুষ তার ভাললাগার মুহূর্তটিতে চুপ করে থাকে না, সে কোন না কোন উপায়ে তার সেই ভাললাগাকে প্রকাশ করে। যার শিক্ষা আছে সাধনা আছে তার প্রকাশের মধ্য দিয়ে একটি রূপ পরিগ্রহ করে যা অন্যেরও ভাল লাগে তখনই তাকে বলা হয় শিল্প। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ পাতার রসে ছবি এঁকেছে। ফাঁপা হাড়ে বাঁশী বাজিয়েছে, গলা দিয়ে সুর নির্গত করেছে মানুষ, না করে থাকতে পারে না বলেই। অজন্তা গুহা গাত্রের অপরূপ খোদাই মূর্তি, মাদ্রাজের অতি পুরাতন মন্দিরগুলি একটি স্বাক্ষরই বহন করছে তা হল প্রকাশ ক্ষমতার। শিল্পীর নিজের ধ্যান এবং মানসিক ভাবনার চিহ্ন।

কিন্তু এই প্রকাশ ক্ষমতা শিল্প পদবাচ্য হল তখনই যখন তা শ্রোতা বা দর্শকের উপর নির্ভরশীল হল। মানুষের ভাল লাগার ক্ষমতার উপরই শিল্প বিচারের মাপকাঠি।

প্রথমে এল ভাল লাগার ভাব, তারপরই তা রূপান্তরিত হল আনন্দে। আকবর কোনও নীতিশিক্ষা পেয়েছিলেন বলেই তানসেনের গানকে মর্যাদা দিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। কিংবা রাজা বিক্রমাদিত্য কবি কালিদাসকে নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য সভাকবি করেননি। কিছু সৃষ্টি করার জন্য তাঁরা উৎসাহ দিয়েছিলেন যা কালজয়ী হবে বা যুগ যুগ ধরে মানুষকে আনন্দ দেবে।

কাব্য এবং সংগীতের মিলই প্রধানত এইখানে। অর্থাৎ চেতনা বা সময় ধারণ ক্ষমতা (টাইম বাইন্ডিং এ্যাবিলিটি) কে আরও বাড়িয়ে দেওয়া। যদিও প্লেটো

বলেছেন কবির আত্মা মৌমাছির মত ফুল থেকে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ায়। কথাটি কবির আত্মা সম্পর্কে সত্যি হতে পারে সৃষ্টি সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। জাগতিক স্তরের ঊর্ধ্বে যে স্তর তারই বক্তব্য এবং ভাবকে প্রকাশকার তাঁর স্বরূপে (কনক্রীট ফর্ম) প্রকাশ করবেন। কবি তাঁর কবিতায়, সংগীতজ্ঞ তাঁর সংগীতের মধ্য দিয়ে।

সাধন ভট্টাচার্য কাব্য ও সংগীতের ক্ষেত্রে এ্যারিস্টটলের মতানুযায়ী তিনটি কারণ দেখিয়েছেন,

১) অনুকৃত বস্তু দেখার আনন্দ ২) জ্ঞানের আনন্দ (টু লার্ন গিভ্‌স দি লাভলিয়েস্ট প্লেজার) ৩) যেখানে জ্ঞাত বিষয়ের অনুকরণ থেকে আনন্দ না হয় সেখানে আনন্দ হয় গঠন নৈপুণ্য, বর্ণযোজনা অথবা অনুরূপ অন্য কোন কারণে।

কিন্তু আমরা যদি শিল্পী কি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন এবং কি প্রকাশ করলেন, এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ ও এই প্রকাশের ফলশ্রুতিরূপে আমরা কি পেলাম তাই বিচার করি, তাহলে শিল্পের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি ধারণা করা যায়। সাধারণভাবে শিল্পী চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রত্যেক শিল্পীই যে শুধু শিল্পের একটি শাখায় পারদর্শী হন তা নয় সাধারণত নিয়মানুসারে যার যে বিষয়ে ঝোঁক থাকে (এ্যাপ্টিচিউড্) তার সেই বিষয়ে নৈপুণ্য (অ্যাবিলিটি) প্রকাশ পায়। কিন্তু শিল্পীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় অ্যাপটিচিউড থাক বা না থাক শিল্পের কয়েকটি শাখাতেই তাদের অ্যাবিলিটি প্রকাশ পায়। কিন্তু তাঁর সব প্রকাশকেই তা বলে শিল্প বলা যাবে না। এখানেই দেখা যাচ্ছে শিল্পের সংজ্ঞার সঙ্গে শিল্পের উদ্দেশ্যর একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। শিল্পের উপাদান এবং উদ্দেশ্যও পরস্পরের মুখাপেক্ষী।

সাহিত্য শিল্পে শ্লীল অশ্লীল সম্পর্কে অভিযোগ তখনই আসে, যখন শিল্পের প্রয়োজনের দিকটি নির্দেশিত হয়। কিন্তু এই প্রয়োজনের দিকটি কত সীমাবদ্ধ। ভারতবর্ষ অন্যান্য দেশের তুলনায় রক্ষণশীল। তাই এই দেশে আজ যে সাহিত্য অশ্লীল বলে অভিযুক্ত, যা মানুষের চিন্তাধারাকে বিকৃত করে দেবে বলে সবাই শঙ্কিত সেই সাহিত্যই হয়ত পাঠক কিছুদিন পরে পাঠ করবেন নির্লিপ্ত চিত্তে। কারণ ভারতবর্ষের চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গির হয়ত আরো অগ্রগতি দেখা দেবে তখন।

কাজেই শিল্পের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য সৃষ্টিও বড় কথা নয়, প্রয়োজনের দিকটিও একান্ত বলে ধর্তব্য নয় কিন্তু শিল্প যে দর্শক বা শ্রোতার চিত্তকে নাড়া দেয় এটি অবিসম্বাদীরূপে সত্য।

শিল্পের একটি প্রধান শাখা হল সংগীত, তাই সংগীত শুধু শ্রোতার চিত্তকে দোলা দিয়েই তৃপ্ত হয় না, সৃষ্টি করে এক আনন্দময় জগৎ।

আনন্দই যে সত্যের পথ দেখায় তা অনুভব করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই তাঁর মনের জোর মিশে গিয়েছে গানের অক্ষরে।

'ক্ষত যত ক্ষতি যত মিছে হতে মিছে'

তারপর বলেছেন,

"এই যে হেরিলে চোখে অপরূপ ছবি,
অরুণ গগনতলে প্রভাতের রবি।
এই তো পরম দান সফল করিল প্রাণ
সত্যের আনন্দরূপ এই তো জাগিছে ॥[১১]"

আজ থেকে সত্তর বৎসর আগে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রকারান্তরে শিল্পের উদ্দেশ্যর কথাই বলেছেন। "যাহা অকারণে সুন্দর, তাহার মত সুন্দর অন্য কোন জিনিষ নহে।"

এই সুন্দরকে মানুষই সৃষ্টি করে, তারই নাম দেয় শিল্প। আর রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন,

"যেখানে আনন্দ পাওয়া যায় তাহাই সুন্দর এবং যেখানে বিনা কারণে আনন্দ পাওয়া যায় তাহা সেইজন্যই অতি সুন্দর।"

"সৌন্দর্য রচনাতেই মানুষের আনন্দ এবং এই আনন্দটুকুই তাহার লাভ।" অর্থাৎ শিল্প সৃষ্টিতে আনন্দ শুধু দেওয়াই যায় না আনন্দ পাওয়াও যায়। আর মানুষ নিজে যখনই পরম আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করে তখনই সে দ্বিতীয় মানুষ খোঁজে তার আনন্দের অংশীদার হওয়ার জন্য।

ভারতবর্ষে শিল্পের এবং শিল্পীর উদ্দেশ্য কি হ্যাভেল সাহেব বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। তিনি প্রধানত চিত্র এবং ভাস্কর্যকেই বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে ভারতীয় শিল্পীদের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিল্প সৃষ্টির মধ্য দিয়ে, দর্শক বা শ্রোতাকে আনন্দ দান করা। যে আনন্দ অলৌকিক। যে আনন্দ বন্ধনের মধ্যে মুক্তির স্বাদ এনে দেবে, মনকে মায়া থেকে মুক্ত করবে। শুধুমাত্র শিল্প উপভোগের মধ্য দিয়ে মানুষের মন মায়া থেকে মুক্ত হতে অক্ষম হয় যদি শিল্পের বাহ্যিক আবরণে শ্রোতা বা দর্শক নিজেকে ভুলে যান বা অভিভূত হন। শিল্পের অন্তর্নিহিত রূপ যা এই বাহ্যিক জাঁকজমকের পিছনে অবস্থান করে ধরা দিয়েও দেয় না, দর্শক বা শ্রোতা সেই রূপটিকেই উপলব্ধি করবেন। তাই ভারতীয় শিল্পীর শৈল্পিক প্রচেষ্টা

কখনোই প্রকৃতিকে অনুসরণ করে না, তার লক্ষ্য থাকে অনেক উর্ধ্বে, দেবতার পর্যায়ে। তার দ্বারাই সে প্রকৃত সত্যকে উন্মুক্ত করতে সমর্থ হয়। তাই হিন্দু এবং ইসলাম ধর্মে মানুষের মূর্তি তৈরি ছিল নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ অর্থে এখানে উদ্দেশ্যহীন। হ্যাভেল সাহেব শুক্রনীতিসার থেকে উল্লেখ করেছেন—"হিন্দুদের শিল্পে ছিল শুধুমাত্র দেবতার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হবে কারণ দেবতা সুখ এবং স্বর্গের পথ উন্মুক্ত করেন। কিন্তু মনুষ্যমূর্তি স্বর্গের দরজা রুদ্ধ করে এবং অসুস্থ ভাগ্যের অবতারণা করে।[১২]

ইওরোপীয় শিল্পীদের মতে,

মানুষের প্রকৃত শিক্ষার উপাদানই হল মানুষ। ভারতীয় শিল্পীর মতে শিল্পের উপাদান মানুষ নয় ভগবান। উভয়েরই পরোক্ষ ফল আনন্দোপলব্ধি।

যে শিল্পকর্ম আনন্দকে বেশি মাত্রায় উদ্রিক্ত করে সেই শিল্প উৎকৃষ্ট ত বটেই, কিন্তু যা আবেগ জাগাতে অক্ষম তা অপকৃষ্ট একথা আমরা কখনোই বলতে পারি না। উপরন্তু বলতে পারি যে, তা শিল্প পদবাচ্যই নয়। কারণ যে শিল্প আবেগ জাগাবে না, আনন্দের দ্বার উন্মুক্ত করবে না, সেই শিল্পের প্রত্যক্ষ ফল তাহলে কি ? তার থেকে বলা ভাল যে কোনও শিল্প হয়ত শৈল্পিক আনন্দ বা উপলব্ধির আনন্দ জাগাতে সমর্থ হচ্ছে না। তাহলে সেই শিল্প নিশ্চয়ই কোনও পূর্ব পরিকল্পনার উপর নির্ভরশীল, অনুকরণজাত শিল্প। মনে করা যাক্ দুর্ভিক্ষের উপর একটি সুন্দর ছবি পথের উপরে রাখা হয়েছে যাতে তা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মনে দয়ার উদ্রেক করে তাহলে এই ছবিকে কি বলা হবে ? নিশ্চয়ই অনুকরণজাত শিল্প যা কামনা চরিতার্থ হওয়ার আনন্দ জাগাতে সক্ষম হয়। তাহলেও ত শিল্পসৃষ্টি হেডনিস্টিক আনন্দদানে সক্ষম হল। সেই আনন্দ তাহলে প্লটিনাসের আনন্দের শ্রেণী বিভাগের পর্যায়ভুক্ত হল। শিল্পসৃষ্টির প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য যাই থাক পরোক্ষ উদ্দেশ্য কিন্তু আনন্দোপলব্ধি ছাড়া আর কিছুই পাই না।

কোনও কবিতা আমার বোধগম্য নাও হতে পারে। কোনও চিত্রের রং, রেখা বিন্যাস আমার মনে তরঙ্গ নাও তুলতে পারে কোনও সংগীতের সুর আমার মনে সাড়া নাও জাগাতে পারে, কিন্তু তা আমার অভিজ্ঞতার অভাব বলেই বিবেচিত হবে, ফলতঃ উপলব্ধির অভাব। তার জন্য সেই সৃষ্টিকে অশিল্প বলার কোনও অধিকার আমার নেই। আর সর্বজনীনভাবে কোনও শিল্প অস্বীকৃত হলে তা ত আপনা হতেই দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। আর শিল্পী যদি অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী হন, অর্থাৎ বিশেষ মানসিক অবস্থা যাকে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি না

এবং তার দ্বারা কিছু সৃষ্টি করেন তবে তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে যুগযুগান্তর কবে তাঁর সমঝদারের আগমন ঘটবে। সে পৃথক প্রসঙ্গ।

সংগীত সমগ্র শিল্প জগতের মধ্যে প্রধান এবং চলমান। সঙ্গীত যেন দেহধারী। এমন একটি আত্মা যা তার নিজের জগতেই মুক্তি খুঁজতে বদ্ধপরিকর। সংগীত ভারী গহনার মত শোভা বর্ধন করে না। ছবির মত ফুটে ওঠে। সে ছবিও ভাষায় প্রকাশ করা যায় না বা তুলির এক টানে এঁকে তোলা যায় না।

সংগীত যদি কোনও বিশেষ ভাবকে ফুটিয়ে তুলবে বলে আগ্রহী হয় তখনই সংগীত বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের ক্ষেত্র থেকে দূরে সরে যায়। তথাপি সংগীত অর্থশূন্যও নয় বা সংস্রববর্জিতও নয়।

হ্যানস্লিক বলেন, সংগীত যদিও অনুভূতির গুণাগুণ ব্যাখ্যা করে না, তবে স্বরের গতিশীলতার দিকটি কিন্তু সংগীতের এক্তিয়ারে। সংগীত পরিপূর্ণরূপে গুণময় কোন বক্তব্যের সারমর্ম প্রকাশ নয়। সংগীত কোনও কোমল মর্মর ধ্বনি বর্ণনা করে না অথবা প্রচণ্ড সাহসিকতার পরিচয়ও প্রদান করে না। তবে সংগীত মর্মর ধ্বনিই বা কি অথবা প্রচণ্ডতাই বা কি দুইই প্রকাশ করতে সক্ষম হয়।

হ্যানস্লিক অস্বীকার করেছেন রূপ (ফর্ম) এবং রূপাধার (কনটেন্ট) সংগীতে অবিচ্ছেদ্য রূপে প্রকাশিত হয়। (ফর্ম এ্যান্ড কনটেন্ট এভার বি সেপারেটেড ইন মিউজিক্) সেই কারণেই রূপের বিপরীতে কোনও রূপাধার সংগীতে থাকা সম্ভব নয়। তথাপি কোনও একটি ভাব মনোমধ্যে প্রণোদিত হতেই প্রশ্ন জাগে এর রূপাধারটি কি হতে পারে বা রূপটিই বা কি। কোথায় এটির আরম্ভ, কোথায়ই বা শেষ। রূপাধার কি তাহলে শব্দ ? কিন্তু শব্দ তো রূপে পরিণত হয়ে পড়ছে, তবে রূপটি কি শব্দ ? তাহলে সেটিও তো রূপাধারে পরিণত হচ্ছে শব্দ ঝংকারে।

তাই বলা হয়েছে,

> "বাই মিউজিক মাইন্ডস্ এ্যান ইকুয়্যাল টেম্পার নো
> নর সোয়েল টু হাই নর্ সিঙ্ক টু লো"

অর্থাৎ সংগীত মনের ভারসাম্য বজায় রাখে কখনও অধিক পরিমাণে ডুবিয়ে দেয় না বা ভাসিয়ে তোলে না।

সিডনি ফিঙ্কেলস্টিন বলেছেন "সংগীতের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে গেলে তাকে সেই জীবনে প্রবেশ করতে হবে যেখানে সংগীত রচিত হয়েছে।[১৩]"

হ্যানস্লিক সংগীত শিল্পের গভীরে প্রবেশ করেছিলেন কিন্তু কোন একটি

অনুকরণ যোগ্য পদ্ধতি বার করতে পারেনি। আর সংগীতে সেটি সম্ভবও নয়। তাই হ্যানস্লিক সংগীতের বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়েই নাড়াচাড়া করেছেন তাই তাঁর সাধনা শিল্পবিচারে বিশ্বজনীন পর্যায়ে উন্নীত হয়নি। এই অভিমত প্রকাশ করেছেন ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য তাঁর হ্যানস্লিকের 'দি বিউটিফুল ইন মিউজিক'এর অনুবাদ গ্রন্থে। এছাড়াও বলেছেন হ্যানস্লিক প্রকৃতির অনুকরণ বৃত্তি, অনুভব বৃত্তি তিনি যেমন স্বীকার করেন না তেমনই রূপচর্চাবাদী (ফর্মালিস্ট)দের মত বিশ্বাস করেন না, সংগীতের রূপ শূন্য গর্ভ কোনও কিছু নয়—ধ্বনিতে পরিপূর্ণ একটি সুরমূর্তি। সংগীতের কাব্যাংশেও গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। হ্যানস্লিক্ কল্পনাবাদী, কাব্যও কল্পনাশ্রয়ী। সেইজন্য শব্দের সাংকেতিক অর্থে জ্ঞান থাকলেই অর্থবোধ হবে এমন কথা নেই, প্রয়োজন অনুসারে কাব্যতত্ত্বেও পারদর্শী হতে হবে। সংগীত শাস্ত্র পড়া থাকলেই সংগীত শিক্ষা লাভ হয় না, সংগীত আয়ত্ত করতে হয়। সংগীতের সুর শ্রুতি সমস্তই বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের অন্তর্গত, তেমনই রসধ্বনি কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। তাই হ্যানস্লিকের জিজ্ঞাস্য সুরের সমাপ্তি হয় ধ্বনিতে কিন্তু তার অবয়ব রাগরাগিনীতে গড়া অথবা কাব্যের দ্বারা গঠিত।

সুন্দরকে কল্পনার ধ্যানেই গড়ে তোলা যায়। শুধু অনুভব করে বা অনুকরণ করে প্রকাশ করলে তার সম্যক প্রকাশে বাধা থাকেই। সংগীতের জন্ম সুরশিল্পীর কল্পনায় এবং সংগীতের আবেদনটি শ্রোতার কল্পনার উপর ছেড়ে দিলেও সমগ্র ব্যাপারটির পরিসমাপ্তি ঘটে না।

ক্রোচের সৃজনশীল কল্পনা (ক্রিয়েটিভ ইমাজিনেশন্) এবং হ্যানস্লিকের বুদ্ধি সহযোগে ধ্যান (কন্‌টেম্‌প্লেট্‌স্ উইথ্ ইমাজিনেশন্) শুনতে ভিন্নতর হলেও একই চিন্তার অন্তর্ভুক্ত।

ডঃ সাধন ভট্টাচার্য উপরোক্ত উভয়েরই মতামত বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, হ্যানস্লিকের বুদ্ধি সহযোগে চিন্তা 'ইনটুইশনের'-এর অন্তর্ভুক্ত বলে মনে হয়। কেননা ক্রোচে কল্পনাকে বুদ্ধি নিরপেক্ষ 'ইনটুইশন' রূপে দেখিয়েছেন এবং হ্যানস্লিককে কন্‌ফিগারেশনিস্টদের গোষ্ঠীভুক্ত করেছেন। সংগীতের কোনও বস্তু পরিবেশন করাবার নেই, পরিবেশনার ঢং সুন্দরভাবে নির্মাণ কৌশল প্রদর্শন, সেখানে সংগীতের সঠিক কোনও উদ্দেশ্য লক্ষিত হয় না। সুতরাং এই 'কনফিগারেশন' যার বিচিত্র সমাবেশ সমগ্র শিল্পচর্চার ক্ষেত্রেই তুলে ধরা যেতে পারে বর্ণে, রেখাবিন্যাসে, ভাস্কর্যে, প্রস্তর গাত্রে তেমনই কাব্যের মধ্য দিয়ে মূর্তি লাভ করেছে 'মিউজিক্যাল আইডিয়া।' হ্যানস্লিক-এর ধারণায় বিশুদ্ধ সংগীতের

সৌন্দর্য আবিষ্কার করতে না পারার কারণ শিল্পতত্ত্ব শিল্পের উপাদানকে হেয় মনে করেছে এবং শিল্পীকে নীতি এবং আবেগের দান বলে ধরা হয়েছে।

হেগেলও সংগীতকে এবং অন্যান্য শিল্পকে আইডিয়ার অধীন বলেছেন।

ধর্ম, দর্শন ও শিল্প ক্ষেত্রে হেগেল-এর 'ডায়ালেক্টিক' মূলতঃ 'লজিক অব্ থিংকিং'-এর উপর নির্ভরশীল। আর্ট এর স্থান 'অ্যাবসলিউট মাইন্ড'-এর উপর যার সঙ্গে ধর্ম ও দর্শন জড়িত। হেগেল শিল্পক্ষেত্রে 'ফ্রিডম অব্ স্পিরিট'-কে স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে শিল্প হল 'ম্যানিফেসটেশন অব্ অ্যাবসলিউট' এবং 'সেনসিবল্ এক্সপ্রেশন্ অব ট্রুথ'। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ানুভূতি শিল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োজন। কেননা এতে সত্য বিবেক থেকে বহির্ভূত হয়ে ইন্দ্রিয়ের অনুকৃতি নিয়ে সচল হয় এবং গভীর অর্থ ও তাৎপর্য প্রদান করে শিল্পে যার ফলে বিশ্বজনীনতা প্রদান করে যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করার পর তবে বোধগম্য হয়। সুতরাং শিল্প হল ভাবের "সেন্সুয়াল ইনকারনেশন'। হিন্দুদের শিল্প সম্বন্ধে হেগেল মন্তব্য করেছেন কিছু কিছু যেগুলি প্রণিধান যোগ্য। হিন্দুদের স্থাপত্য, অজন্তার শিল্পকলা, বাল্মীকি কালিদাসের রচনা সবই তাঁর সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। হিন্দু সংগীত সম্বন্ধে জানিয়েছেন এগুলিতে আছে সৌন্দর্য ও স্বাতন্ত্র্যবোধ যা ইওরোপ অঞ্চলেও একদা অজ্ঞাত ছিল তা বিশ্বের সংগীত রসিকের কাছে আদৃত হওয়ার যোগ্য।

হেগেল প্রথমে সামগ্রিক ভাবে, কলাবিদ্যার মধ্যে স্থাপত্য, মূর্তিশিল্প কাব্য অঙ্কন এবং সংগীত সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন এবং এগুলিকে প্রতীক ক্লাসিক ও রোমাণ্টিক পর্যায়ে বিশ্লেষণ করে দেখানোর চেষ্টায় যুগান্তর সৃষ্টি করেছেন।

ভাষা সম্পর্কে হেগেল-এর মন্তব্য হল যে এগুলি 'সাইন্স' যোগায় যা তৎকালীন ভাব সৃষ্টিতে (ইমিডিয়েট ইনটুইশান) সক্ষম হয়। সংগীতের ধ্বনি যে রূপ সৃষ্টি করে তা শূন্যগর্ভও নয় আবার শূন্যস্থান আবরিতও করে না, জীবন্ত সৃষ্টির পরিপূর্ণ একটি রূপ সংগীত। ধ্বনি অশরীরী এবং সূক্ষ্ম সেইজন্য সংগীতকারের মনোবাঞ্ছা পূরণে সহায়ক হয়। সংগীতের আবেগসঞ্চারী উপাদান বস্তুত অত্যন্ত সাধারণ। সাংগীতিক চিন্তা সূক্ষ্ম হয়ে ওঠে তার নিজের মধ্যে অন্য কোনও কারণে নয় এবং সংগীতকারের আত্মা বুদ্ধির দ্বারা একটি সমগ্র মূর্তি গড়ে তোলে যা শুধু উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ নয় উদ্দেশ্য বিমুখ।

তথাপি সংগীত তার অনিবার্য পরিণতি সাধন করে চলে যাকে সংগীতের উদ্দেশ্য বলে ভ্রম হয়। ভারতীয় সংগীতের সাধক সর্বদা পুরাতন পদ্ধতিকেই মর্যাদা দেন এবং গায়কী, ঢং রীতি এগুলোর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যত্নবান হতে

বলেন। তবুও গায়কের গায়কীর মধ্য দিয়ে সংগীতের মধ্যে অজ্ঞাতসারেই বিবর্তন ঘটে।

হ্যানস্লিক এ বিষয়ে বলছেন, সংগীত দ্রুতভাবে পরিবর্তিত আকার গ্রহণ করে। কোনও শিল্পই এরকম নয়। সুরের উত্থান পতন, স্বরান্তর, সুরসঙ্গতি প্রভৃতি পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই খেলো হয়ে যায় এবং 'মৌলিক কোন সুরকার' আর সে নীতি গ্রহণ করতে চান না, নূতন চিন্তা করেন।

ভারতেও দেখা যায় পুরানো ভজন কীর্তনের রূপ ক্রমশই পরিবর্তিত হচ্ছে। বাউল, পল্লীগীতিরও সুরান্তর ঘটে যাচ্ছে। অথচ ভাব একই থাকে এবং এই পরিবর্তনের মধ্যেও যে সংগীতের রীতিটি থেকে যায়, পরবর্তী যুগের লোকেরা আরও বিচিত্র রূপে তাকে ফুটিয়ে তোলে। এই পরিবর্তনগুলি সম্ভব হয় সবই সংগীতকারের মানসিক ক্ষুধার পরিতৃপ্তি সাধনের নিমিত্ত যা একমাত্র শৈল্পিক পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হওয়া ব্যতীত আর কোনও মতেই সম্ভব নয়। উদ্দেশ্য সেখানে নিতান্তই গৌণ। যে গান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রচিত হয় তা চরম পরিপূর্ণতার উপলব্ধি দান করতে সক্ষম হয় না। যেমন ছড়া গান, সর্বকালে সর্বদেশেই প্রচলিত। শিশুদের ঘুমের অব্যর্থ ওষুধ। দিনে দিনে তার রূপ পরিবর্তিত হয়। তথাপি একটি বৈশিষ্ট্য তার চিরদিনই থেকে যাবে। তা হল ছন্দ। ছড়াগানে ছন্দের প্রয়োজন অনিবার্যরূপে দেখা দেয়। সেই ছন্দ, লয় বড়দের মনকেও মুগ্ধ করে, সুরের আবেশে মোহাচ্ছন্ন করে কিন্তু সেই মোহময়তা তাৎক্ষণিক।

সংগীতের সুর ও অর্থের মধ্যে হ্যানস্লিক সুরকেই প্রাধান্য দিয়েছেন অর্থকে গৌণ বলে ধরেছেন, অতিরিক্ত লাভের মত। তাঁর মতে যেখানে সুর সৌন্দর্য থাকে সেখানে অর্থের কথা নিয়ে কেউ চিন্তা করে না। সাংগীতিক উপাদানগুলি সুরকে কেন্দ্র করেই পূর্ণতা লাভ করে।

কিন্তু সুরের প্রাধান্য ঘোষণা করা হলেও সংগীতের কাব্যাংশও যে রস পরিবহনের অংশীদার সে কথা সুরও অবহেলা করতে সক্ষম হবে না।

হ্যানস্লিক ইওরোপীয় সংগীত পর্যালোচনায় আবেগের স্থানটি সৌন্দর্য সৃষ্টির অধীনে করতে স্বীকৃত হলেও যথার্থ সুন্দরের জন্মলাভ ঘটাতে অনুভব বৃত্তির কোনও অবদান স্বীকার করেন না, করেন কল্পনা বৃত্তির। আনন্দের আবাহন তখনই যখন সংগীতজ্ঞের কল্পনাবৃত্তির সংযোগ ঘটে শ্রোতার কল্পনা অনুভূতি ও সংবেদনার সঙ্গে। কল্পনার মাধ্যমে সংগীতের উপাদান সাজিয়ে নিতে হয়। অর্থাৎ সংগীতের ধ্যান মূর্তিটি সূক্ষ্ম চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ফসল।

স্ত্রীজাতি এই কারণে ভাল সুরস্রষ্টা হতে পারে না, কেন না তারা বেশি আবেগপ্রবণ হয় অনুভূতির উপর চাপ পড়ে, অন্তরের প্রতিভাত সুর মূর্তিটির যথার্থ রূপায়ণ তাই মেয়েদের কাছ হতে আশা করা যায় না।

ভারতীয় সংগীতে এই সুরস্রষ্টার কাজটি অদ্ভুতরূপে গৌণ বলে ধার্য হয়। সংগীত আপন বৈশিষ্ট্যে রাগরূপের পরিচয় সম্বলিত হয়েই গায়কের মনে প্রতিভাত হয়। সংগীতের লালিত্যময় উদাত্ত, করুণ বা আনন্দঘন রূপটি সংগীতের কাব্যাংশ জুড়ে প্রতিফলিত হয়। সম্যক সাধনার ফলে জয়ী শিল্পী স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সংগীতের সৌন্দর্য পরিবেশনে অনায়াসে সক্ষম হয।

ভারতীয় সংগীতের বিবর্তনে যে পরিবর্তন সূচিত হয় তা শুধু নির্ভর করে তানের বিস্তার, মূর্ছনা, শ্রুতি, মীড়, গমক প্রভৃতির সঙ্কোচন ও প্রসারণের মধ্য দিয়ে। রাগরাগিনীর কতকগুলি আদি অকৃত্রিম রূপ প্রচলিত থেকেই যায়।

সংগীত সাধনায় শিক্ষার স্থানটিতে সেই কারণেই বিশেষ জোর দেওয়া হয় সংগীতের রূপটি অক্ষয় করে রাখবার জন্য। যার ফলে ভবিষ্যতের গায়ক কোনও প্রতিষ্ঠিত গীত বা সংগীতজ্ঞের রীতিকে আপন প্রতিভায় তিনি যত বড় প্রতিভাশালী শিল্পীই হন না কেন রূপান্তরিত করতে অক্ষম হন।

ইন্দিরা দেবীর মতে স্বরলিপির প্রচলন হওয়ায় গানকে বেঁধে রাখবার উপায় হয়েছে, ফাঁকি দিয়ে গানের পাখীর উড়ে যাওয়ার উপায় নেই। এতে সংগীত কিছুটা 'শ্রীভ্রষ্ট' হলেও বিনষ্ট হওয়ার উপায় নেই।

'ভাষা এবং সংগীত' হ্যানস্লিকের মতে ইওরোপীয় সংগীতে এক করে দেখবার চেষ্টা হয়, যেটি সংগীতের ধর্মে ক্ষতিকারক। সংগীতকেও এক প্রকার সূক্ষ্ম ভাষারূপে ধরা হয় যা ভাষার ধর্ম ও ফলশ্রুতি প্রকাশ করতে সহায়ক হয়। ভাষা অনেক বাইরের বস্তু বহন করে যেমন উপমা, অলংকার ইত্যাদি। কিন্তু সংগীতে বাইরের সেই সব অলংকারাদি ফুটিয়ে তুলবার অবকাশ নেই। সংগীতের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ধ্বনির উপরে, ভাবের উপরে পূর্ণ আধিপত্য, সমস্ত মিলিয়ে সংগীতের একটি স্বাধীনরূপ। এক্ষেত্রে হ্যানস্লিক লঘুসংগীতের অসারত্ব দেখিয়ে বলেছেন, লঘুসংগীতে অসংলগ্ন সুরতরঙ্গ, আবৃত্তি করবার মত ভাষা সুরপ্রবাহকে চেপে ধরে ফলে সেই গান শ্রোতাদের চিত্ত জয় করলেও সংগীতের আসল সৌন্দর্যের দৈন্যতাই ফুটে ওঠে। চমৎকারিত্বের জন্য অদ্ভুত নূতন সংযোজন প্রাধান্য লাভ করে, সুরের বৈপরীত্য জাঁকজমক সহকারে দেখান হয় এই অজুহাতে যে সংগীতকে সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে তোলা হচ্ছে বা সংগীতকে জীবনের ভাষা রূপে দেখান প্রয়োজন।

লঘুসংগীতজ্ঞদের বিশেষ করে রিচার্ড ওয়াগনার ইত্যাদি সংগীতজ্ঞদের এইসব প্রচেষ্টা হ্যানস্লিকের নিকট সংগীতের স্বকীয় সৌন্দর্যের বিলোপসাধন এবং সংগীতেব 'অর্থ' সন্ধানের চেষ্টা মাত্র।

যেহেতু সংগীত সমস্ত শিল্পকর্মের মধ্যে মানুষের অনুভব বৃত্তির উপর তীব্রভাবে কাজ করে, মানুষ বিনা ব্যাখ্যায় সংগীতের মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় সেইজন্য ধ্বনির ক্রিয়াটিই অধিকতর শক্তিশালী এবং প্রত্যক্ষরূপে বিবেচিত হয়। বিষাদময়ই হোক বা আনন্দোচ্ছ্বলই হোক হ্যানস্লিক বলেছেন ধ্বনি রাজির প্রভাব থেকে আমরা নিজেদের মুক্ত করতে পারি না কেননা শুধু ধ্বনি, শুধু সুর তার অনির্বচনীয় দানবীয় শক্তিতে মানুষের শিরায় উপশিরায় শিহরণ সঞ্চার করে।

সংগীতের প্রভাব এতই বেশি যে সংগীতের উদ্দেশ্য আপনিই সূচিত হয়। সংগীতের প্রভাবে আগুন জ্বলে, বৃষ্টি নামে, মানুষের চিত্তশুদ্ধি ঘটে, অসুস্থ স্নায়ুর উপর ক্রিয়া করে রোগীকে সুস্থ করে এগুলি শুধু হ্যানস্লিকের মত নয় ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রেও এগুলি বিচিত্ররূপে সত্য।

কিছুদিন পূর্বের সংবাদপত্রের খবর যে বৈজ্ঞানিকেরা উত্তম ফসল ফলানোর জন্য তার যন্ত্রের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করে লাভবান হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের হাতের বাঁশিই রাখালিয়ার সুর। সে সুর বনে বনান্তরে পশু পাখি এমনকি মানুষের মনের উপরও নিরন্তর প্রভাব বিস্তার করে অসীম গানের রেশ রেখে যায়।

আই· এ· রিচার্ডস্ বলেছেন, "এনিথিং জাজড্ টু বি বিউটিফুল ইজ আইদার এ ওয়ার্ক অব্ আর্ট অর্ এ ন্যাচারাল অবজেক্ট।"

অর্থাৎ যা কিছু সুন্দর বলে গণ্য হয় তাই শিল্প, অথবা আদি ও অকৃত্রিম কোনও বস্তু।

আবার মিঃ লিওন বলেছেন, 'দি আর্টিস্ট ইজ্ গাইডেড বাই অ্যাসথেটিক অবজেক্ট, এ্যান্ড দিস্ ইজ্ এমবডিড ইন দি মেটিরিয়াল ওয়ার্ক অব্ আর্ট অ্যাজ্ এ্যাসথেটিক মিনিং, ইট ইজ দিস হুইচ ইজ অ্যাপৃহেন্ডেড ইন আর্টিস্টিক এক্সপিরিয়েন্স।"

অর্থাৎ শিল্পী সেই বস্তুকেই গ্রহণ করেন যা তাঁর শিল্পবস্তু হতে সহায়ক হবে এবং বিশুদ্ধ শিল্পরূপে গণ্য হবে। কান্ট এই মতকেই সমর্থন করেছেন প্রকারান্তরে। যেমন সংগীতের ক্ষেত্রে।

তাঁর মতে সংগীতে সুর হল বস্তু এবং সুর সংগতি হচ্ছে আধার বা রূপ।

কিন্তু কোনও বিশেষ বস্তুকে যখন কোনও রূপ দেন শিল্পী তখনই তো শিল্পীর বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। আর বুদ্ধির প্রয়োগ যেখানে হবে সেখানেই অর্থের আগমন ঘটে। কিন্তু কান্টের মতে বুদ্ধি এবং অর্থ যেখানে নেই তাকেই মুক্ত সৌন্দর্য রূপে গণ্য করতে হবে বা তাকেই বলা হবে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য। তাহলে কান্ট-এর মতে শিল্প বিশুদ্ধ সৌন্দর্যরূপে গণ্য হবে না। কিন্তু সুন্দর রূপে প্রতিভাত না হলে তা থেকে আনন্দ পাওয়াও সম্ভব হয় না। শিল্পের উদ্দেশ্য আনন্দ দান না হলেও আমরা আনন্দ পাই। শিল্পীর উদ্দেশ্য থাকে মহত্তর কিছু সৃষ্টি করা যা তার সবাঙ্গীণ প্রকাশ ক্ষমতাকেই ব্যক্ত করবে। তাঁর মতে দর্শনে বা শ্রবণে যদি কেউ আনন্দিত বা মোহমুগ্ধ হয় তবে সে প্রকৃত সমঝদার নয়।

"এ জাজমেন্ট অব্ টেস্ট ইন হুইচ চার্ম এ্যান্ড ইমোশন হ্যাভ নো ইনফ্লুয়েন্স ইজ্ এ পিওর জাজমেন্ট অব্ টেস্ট।"

যে বিচারে কোনও মোহ বা আবেগ প্রভাব বিস্তার করে না তাই হল প্রকৃত সৌন্দর্য বা শিল্পের বিচার।

কান্ট সেই জন্য সৌন্দর্যের সঙ্গে আনন্দের পার্থক্য করেছেন। বলেছেন, জোয়েল জে. কুপারম্যান :

কান্ট ডিসটিংগুইসেস বিটউইন দি বিউটিফুল অ্যান্ড এ্যাসথেটিক্যালি এক্সসেলেন্ট অব্ দি ওপন হ্যান্ড, অ্যান্ড দি চার্মিং অর মিয়ারলি প্লিসান্ট্ অন্ দি আদার।"[১৬]

অর্থাৎ কান্ট সুন্দর এবং শৈল্পিক দিক থেকে উৎকৃষ্ট যা তাকে এক দিকে করেছেন আর মোহময় যা তাকে রেখেছেন অন্য দিকে।

সাধন ভট্টাচার্য কান্টের মতকে ব্যাখ্যা করেছেন। "তাই সুন্দর যা নিষ্কাম আনন্দ দান করে, তাই সুন্দর যা কোন কিছুর সংজ্ঞা না হয়েই আনন্দ দান করে।" এখানে তিনি এমন একটি চৈতন্যলোকের অস্তিত্বের কথা বলছেন, যা একদিকে আনন্দজনক প্রয়োজনীয় এবং মঙ্গলজনক থেকে, অন্য দিকে সত্য থেকে পৃথক।[১৭]

অর্থাৎ তিনি শিল্পের কথাই এখানে বলতে চাননি। কারণ শিল্প কখনোই আনন্দ দান করতে পারে না যদি তার সঙ্গে সত্য যুক্ত না হয়। সত্যের স্পর্শেই শিল্পে ঐশ্বরিক উপলব্ধি হয় তৎপরেই সুন্দর রূপে প্রতিভাত যা আনন্দ দানে. সমর্থ।

সংস্কৃত শ্লোকে আছে,

'নাসৌ ধর্মো যত্র ন সত্যমস্তি ন তৎ সত্যং
যচ্ছলেনানুবিদ্বমম্—'

যার মধ্যে সত্যের উপলব্ধি থাকে না তা ধর্ম নয়। আবার যার মধ্যে ছল বর্তমান তা কখনও সত্য নয়। অর্থাৎ শিল্প কখনও ছল হতে পারে না। কারণ শিল্প ধর্মকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে। কাজেই শিল্পের মধ্যে সত্যের উপলব্ধি থাকবেই। তা না হলে আমরা দেখছি শিল্প আনন্দ দানে ব্যর্থ।

কে· সি· পান্ডে, কান্ট-এর মতকে ব্যাখ্যা করেছেন,

'অ্যাসথেটিক এক্সপিরিয়েন্স অ্যাকর্ডিং টু কান্ট ইজ দি এক্সপিরিয়েন্স অব্ হারমনি বিটুউইন ফ্রি ইমাজিনেশন এ্যান্ড ফ্রি আন্ডারস্ট্যান্ডিং।'[১৬]

কান্টের মতে শৈল্পিক অভিজ্ঞতা এক ঐকতানের অভিজ্ঞতা যার একটি হল মুক্ত কল্পনা অন্যটি সম্যক উপলব্ধি। অর্থাৎ যে কোনও কল্পনা এবং তার যে কোনও প্রকাশ, উপরন্তু সমঝদারের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। তাই হল কান্টের মতে নন্দন তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা। যদিও এ মত ভবিষ্যতে বহু গবেষকের দ্বারা খণ্ডিত হয়েছে। কারণ কান্ট-এর এই বক্তব্যের মূলে রয়েছে তাঁরই কথা 'পারপাসিভনেস্ উইদাউট পারপাস্।' শিল্পের ক্ষেত্রে এই কথাটি যুক্তিসংগত বলে মনে হয় না তার কারণ শিল্পবস্তু বা শিল্পসৃষ্টির মাধাম যখনই শিল্পী সংগ্রহ করছেন তখনই তাঁর মধ্যে উদ্দেশ্য ধরা দিচ্ছে। এই উদ্দেশ্য কখনোই স্থূলরূপে বিবেচিত হচ্ছে না। কারণ এই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য শ্রোতার উদ্দেশ্য নয়। এই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হল শিল্পীর নিজেরই। আত্মাকে পূর্ণতার পথে এগিয়ে নেওয়াই শিল্পের পরোক্ষ উদ্দেশ্য থেকে যায়। তাকে আর কোনও বিশেষণে বিভূষিত করা যায় না বলেই উদ্দেশ্য বলে গণ্য করা হয়। মহত্তর সৃষ্টির প্রেরণা যতই ঘনীভূত হয়, মন ততই নিরাসক্ত হয়, লক্ষ্যের পথে এগোয়। এই সৃষ্টি কি কোনও স্থূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে চলতে পারে ? তাহলেও তা মহৎ শিল্প হল না ? কান্ট যাকে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য বলেছেন, তাতো আপনা আপনিই বিশুদ্ধ সুন্দর হয়ে নেই, মানুষের চোখই তাকে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য বলে গণ্য করবে।

"গোলাপের দিকে চেয়ে বললাম
সুন্দর
সুন্দর হল সে।"[১৭]

অর্থাৎ সুন্দর দেখার চোখ যে মানুষের আছে, সুন্দর সৃষ্টি করার মনও সেই মানুষেরই থাকবে। কাজেই বিশুদ্ধ সৌন্দর্য এবং শিল্প সৌন্দর্য বা শিল্প বিচার

দুইই ত এক শুধু পৃথক দৃষ্টিকোণে। সংগীত আনন্দ দেয় তাই বলেই কি একথা বলা যায় যে সংগীতের উদ্দেশ্য আনন্দ দান। কান্ট এবং অন্যান্য শিল্পতাত্ত্বিক সকলেই স্বীকার করেছেন শিল্পসৃষ্টির বুদ্ধিগত দিকটি ছাড়াও এর একটি পূর্ব পর্যায় আছে যাকে সাধন ভট্টাচার্য বলেছেন, 'সংবেদন' যার সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্ক সেই মুহূর্তে থাকে না, পরে যুক্ত হয়। যার কোনও বিশেষ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কোনও শিল্পীই একে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হন না। তার প্রমাণ পাওয়া যায় কয়েকটি ক্ষেত্রে।

শেলী তাঁর কবিতা প্রসঙ্গে বলেছেন,

কবিতার সঙ্গে কারণকে যুক্ত করা চলে না। ইচ্ছাশক্তির জোরে একটি ক্ষমতার উদ্ভব হয়। একটি মানুষ কখনও বলতে পারে না যে আমি কবিতা রচনা করব। একজন বড় কবিও কখনও একথা বলতে পারেন না, কারণ সৃষ্টি কার্যের সময়ে মন থাকে ধূমায়িত আগুনের মত। অগ্নিকে প্রজ্বলিত করবার জন্য যেমন অদৃশ্য বাতাসের প্রয়োজন, ঠিক সেই প্রকার মনকে সৃষ্টির কাজে উদ্দীপ্ত করার জন্যও উপরোক্ত ক্ষমতার প্রয়োজন হয়। যেমন ফুলের রং দিনে দিনে পরিবর্তিত হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় কবিতা রচনার ক্ষেত্রে উপরোক্ত ক্ষমতার ভূমিকাও ঠিক সেই প্রকার। মনুষ্য প্রকৃতির সচেতন ভাগটি এই ক্ষমতার প্রবেশ এবং প্রস্থানের সময়ে মূক অবস্থায় থাকে।...অধিকাংশ গৌরবোজ্জ্বল কবিতা যা পৃথিবীতে হয়েছে তা কবির প্রকৃত ধ্যান ধারণার একটি অংশ মাত্র।[১৭ক]

রুবেন্‌স্ একজন ল্যান্ডস্কেপ পেইন্টার এর মতামত বলেছেন,

একজন চিত্রশিল্পীর কখনোই পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ রং করার জন্য বা প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কনের জন্য নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। তার উচিত কোনও সুতীব্র বাসনা দ্বারা চালিত হওয়া যা তাকে উদ্বুদ্ধ করবে এবং তাকে উন্নত করে তুলবে। সেই অনুভূতি আনতে সাহায্য করবে যা তার সুচারু ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজনীয়। সেই সত্যিকারের চিত্রশিল্পী যে দেবতার নিঃশ্বাসকে অনুভব করে যা প্রকৃতি থেকে সঞ্চারিত হয়েছে তার তুলির আগায়। স্বর্গকে নামিয়ে আনে তার চিত্রে যখন সে বসন্তের ফুলে ভরা রূপটি ফুটিয়ে তোলে অথবা কর্কশ শীতের কঠিন রূপটি ফুটিয়ে তুলতে চায় তার ছবিতে।[১৭খ]

বিটোফেনের মতে,

তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা কর আমি আমার ভাবনাগুলিকে কোথায় পাই। সে আমি তোমাদের নিশ্চয় করে বলতে পারব না; তারা আসে হঠাৎ, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে। আমি তাদের হাত দিয়ে ধরতে পারি। কখনও

মুক্ত বাতাসে, কখনো বনে যখন আমি ভ্রমণ করি কখনো বা রাত্রির স্তব্ধতায়, কখনো বা ভোরে। সেইভাবেই আমাকে উত্তেজিত করে যা কবি তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেন, আমি তাই সুরে প্রকাশ করি যা অনবরত ধ্বনির সৃষ্টি করে, গর্জন করে ঝড়ের মত নৃত্য করে আমার মনে যতক্ষণ না আমি তাদের সুরে প্রয়োগ করি।[১৭গ]

কিট্‌স্‌ বলেছেন,

যদি কবিতা গাছের পাতার মত অতি স্বাভাবিক অযাচিতভাবে না আসে তবে তার একেবারে না আসাই ভাল।[১৭ঘ]

পিজেট্রির মতে প্রেরণা হল একটি রহস্য যা এক ধরনের সশ্রদ্ধ বিনম্রভাব কদাচিৎ এসে আমার সমস্যার সমাধান করতে সাহায্য করে।[১৭ঙ]

সংগীতকার বাক্‌ বলেছেন,

প্রাথমিক তীব্রতা নির্গমনের সময়েই কিছু করা সম্ভব হয়। এই অন্তর্নিহিত আবেগের একটি তাৎপর্য আছে যা অধিকাংশের ক্ষেত্রেই সত্য।[১৭চ]

বার্টলেট্‌ উপরোক্ত অভিমতগুলিকে সংগ্রহ করেছেন ব্যাখ্যা করেছেন এবং অবশেষে নিজের মতামত জানিয়েছেন। তাঁর মতে,

মেজাজের বিভিন্নতা অথবা ভাবপ্রকাশের মাধ্যম দুইই অর্ন্তনিহিত আবেগের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে উত্তেজনার দিক্‌টির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে কোন না কোনও মাত্রা সংযোজিত করে। এই তত্ত্বটি বিশেষভাবে সংগীতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ অধিকাংশ রচয়িতাই কার্যক্ষেত্রে কোনও কোনও সময়ে তাঁদের বিশ্বাস বা ভাব প্রকাশের পথ খুঁজে পান না।[১৭ছ]

এর থেকে বোঝা যায় সমস্ত শিল্পই এক বিশেষ মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। সংগীত যতক্ষণ না সুরে রূপায়িত হয় ততক্ষণ তা মনের ভিতর সুপ্ত অবস্থায় থাকে। কবিতা এবং সাহিত্য যতক্ষণ না বাইরে লিখিত রূপ পায় ততক্ষণ তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেউ সচেতন হয় না। চিত্র এবং ভাস্কর্যে কিন্তু আমরা বিষয়ের সঙ্গে পূর্বেই অল্পবিস্তর পরিচিত হতে পারি।

সংগীতই শিল্পের অন্যান্য শাখার মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।সে নিজেকে চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করার আগে তার নিজের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত করে রাখে। কোনও স্থূল বা সূক্ষ্ম উদ্দেশ্যের মুখাপেক্ষী হয় না।

রবীন্দ্রনাথের মতে,

"ছন্দে শব্দে বাক্যবিন্যাসে সাহিত্যকে সংগীতের আশ্রয় তো গ্রহণ করতেই হয়। যাহা কোনোমতে বলিবার জো নাই এই সংগীত দিয়াই তাহা বলা চলে।

অর্থ বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে যে কথাটা যৎসামান্য ওই সংগীতের দ্বারাই তাহা অসামান্য হইয়া উঠে। কথার মধ্যে বেদনা এই সংগীতই সঞ্চার করিয়া দেয়।"[১৮] আর কোনও মাধ্যমের সাহায্যে যখন মানুষ কিছু ব্যক্ত করতে অক্ষম হয়, তখনই সে তা প্রকাশ করে সংগীতের মাধ্যমে। তাজমহলকে দেখে যখন মানুষের মন মুগ্ধ হয় তখন রচিত হয় গান, তাজমহল নিজেই কিন্তু অপরূপ শিল্পসৃষ্টি। মোনালিসার ছবিকে কেন্দ্র করে রচিত হয় গান কিন্তু মোনালিসা নিজেই এক অপরূপ শিল্প। কিন্তু সংগীতকে উপলক্ষ করে সংগীত রচিত হতে কখনও শোনা যায়নি। কারণ সংগীতই সকল শিল্পের শেষ।

হ্যারল্ড অসবোর্ন তাঁর গ্রন্থে দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করেছেন "সংগীত রচনা শুধুমাত্র সংগীত ব্যতীত অর্থাৎ নিজেকে ব্যতীত আর কিছুই উপস্থাপিত করে না বা প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হয় না। সংগীত শ্রবণেন্দ্রিয় সংক্রান্ত রচনা ব্যতীত আর কোনও অভিজ্ঞতারই মধ্যস্থতা করে না বা সহায়ক হয় না।"[১৯] তাঁর বক্তব্য ভারতবর্ষের সংগীতের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত নয়। কারণ ভারতীয় সংগীত বলতে ত শুধু গীত এবং বাদ্য নয় তার সঙ্গে নৃত্যও সংযুক্ত আছে। সে ত শ্রবণেন্দ্রিয়ের কাজ নয় একান্তভাবে দর্শনেন্দ্রিয়ের উপর নির্ভরশীল। তবে একথা সত্য সংগীত শুধু সংগীতের ধ্যানকেই প্রকাশ করে। নৃত্যের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা প্রযোজ্য।

হ্যারল্ড অসবোর্ন যন্ত্রসংগীতের উপর অধিকতর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে যন্ত্রসংগীত কখনও আবেগকে উপস্থাপিত করে না, জীবনের গতিকেও ব্যক্ত করে না শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ ভাবে শৈল্পিক আবেগকে তোমার মধ্যে জাগ্রত করে সাংগীতিক ধ্বনির গঠন নৈপুণ্যের মাধ্যমে এবং তাই হল প্রকৃত সংগীত।"[২০]

বার্গসোঁও সকল শিল্পের মধ্যে সংগীতকেই মুখ্যভূমিকা প্রদান করেছেন। তিনি সংগীতকে সরাসরি সম্মোহনের ভূমিকায় অবতীর্ণ করিয়েছেন।

তাঁর মতে সংগীত সম্মোহনেরই শোধিত এবং মার্জিত রূপ। সংগীত তার সুশৃঙ্খল ছন্দের দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে আবেদন পাঠায়। আমাদের স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে এবং ভাবনাকে স্তব্ধ করে দেয়। আমাদের আত্মসমর্পণ করতে বলে সেই বিরাট শৈল্পিক অনুভূতির এক ক্ষুদ্রতম অংশের কাছে।"

বার্গসোঁর মতামত পড়লেই বোঝা যায় তিনি স্বাভাবিক জীবনের অনেক উপরে স্থান দিয়েছেন শিল্পকে আবার শিল্পের মধ্যে সংগীতকে।

সংগীতের সম্মোহন ক্ষমতা আছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হল সংগীতের সুরে পাখী বশ হয়, সাপ মন্ত্রমুগ্ধ হয় ইত্যাদি। এই ধারণাগুলি এককালে প্রচলিত

ছিল। সংগীতের সুরের দ্বারা সম্মোহনকে কেন্দ্র করে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। এর অধিকাংশই কল্পনা আবার কিছু সত্যও ত তার মধ্যে মিশে থাকে। কারণ চতুঃষষ্ঠী শিল্পকলা থাকা সত্ত্বেও আর কোনও শিল্পের ক্ষেত্রে এই ধরনের কাহিনী প্রচলিত নেই।

যাই হোক্ সংগীতের কোনও বিশেষ ক্ষমতা থাকার জন্যই বর্তমানে বিজ্ঞানীরা সংগীতকে রোগ নিরাময়ের কাজে নিযুক্ত করবেন বলে মনস্থির করেছেন। তাঁরা বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখেছেন এক একটি সুর মানুষের মনে এক এক ভাবে ক্রিয়া করে ঠিক যে কারণে ছড়া গানের ছন্দে শিশু ঘুমিয়ে পড়ে। দেশাত্মবোধক গানের সুরে মানুষ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। এই সুরগুলি মানুষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আবিষ্কার করেছে। সেই আবিষ্কারকেই আরও সূক্ষ্মভাবে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কোনও বিশেষ সুর বা স্বর কোনও মানুষের কর্ণে প্রবেশ করে না অর্থাৎ সে সুরবধির হয়, যেমন মানুষ বর্ণান্ধ হয়, সুরও কম বেশি মানুষকে উত্তেজিত করে তুলতে সক্ষম হয়। বিজ্ঞানীরা দেখাতে চান সত্যিই সংগীতের কোনও বিশেষ ক্ষমতা আছে যার দ্বারা মানুষের কল্যাণ করা সম্ভব। যদি সত্যিই সংগীতের দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় তবে তা হবে যুগান্তকারী আবিষ্কার। এই আবিষ্কারের ফলেই তখন মানুষ একথা স্বীকার করবে যে আনন্দদান করা ছাড়াও, অনন্তের উপলব্ধি ছাড়াও সংগীতের দ্বারা অন্য উদ্দেশ্যও চরিতার্থ হয়। যদি সত্যিই তাই হয় তবে বুঝতে হবে সংগীতের আর কোনও উদ্দেশ্য নেই এবং সংগীত অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ও অপ্রয়োজনের আনন্দদানে সমর্থ বলেই সংগীতকে চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়েছে।

মানুষের মন অনন্ত সাগর তার কোনও কূলকিনারা পাওয়া যায় না। পৃথিবীতে যত ব্যাধি আছে তার মধ্যে মানসিক ব্যাধিই সর্বাপেক্ষা জটিলতম। অথচ দেখা যায় মানসিক রোগীর ক্ষেত্রে সংগীত প্রয়োজনীয় ওষুধের কাজ করে। উত্তেজিত স্নায়ুকে শান্ত করে। কি করে যে তা সম্ভব হয় তাই হল গবেষণার বিষয়। যে কারণে শিল্পসৃষ্টির প্রেরণাকে আমরা বিশ্লেষণ করতে সমর্থ হই না সেই একই কারণে মানসিক ব্যাধিরও পূর্বাপর বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় না। তবুও দেখা গেছে এই দুর্জ্ঞেয় মন একমাত্র সংগীতের কাছেই আত্মসমর্পণ করে। তার অলৌকিক আবেদনের কাছে নতি স্বীকার করে। তাই সংগীতকে সর্ব উদ্দেশ্য বিমুখ বলে সব দায়িত্বই এড়িয়ে যাওয়া হয়। এর থেকে সংগীতের দ্বারা নিশ্চয়ই কোন না কোনও উদ্দেশ্য সাধিত হবে হয়ত বা আরও এক বৎসর পরে

এই আশা নিয়ে এগিয়ে যাওয়াই ভাল। সংগীতের কোনও উদ্দেশ্য নেই বলেই হয়ত অনেক উদ্দেশ্য পরিপূরণের সহায়ক হতে সক্ষম। তাই সংগীত নিজের অজ্ঞাতসারে বহু উদ্দেশ্যের মুখোমুখি হয়। কিন্তু মজার বিষয় উদ্দেশ্যকে সম্মুখীন করে যদি সংগীত, শুধু সংগীত কেন যে কোনও শিল্পই অগ্রসর হয় তবে সে সেই উদ্দেশ্য থেকে ক্রমশ দূরবর্তীই হয়ে যায়। অবশেষে শিল্পেরও মর্যাদা হারায়। শিল্পের বৈশিষ্ট্যই তাই। উপরোক্ত শিল্পীদের বক্তব্য ছাড়াও তথাকথিত শিল্পীদের জীবনী অনুধাবন করলে দেখা যায় এঁরা কেউই শিল্প সৃষ্টির প্রারম্ভে উদ্দেশ্যের দ্বারস্থ হননি। তথাপি শিল্পতত্ত্বকে কেন্দ্র করে কতকগুলি মতবাদ প্রচলিত হয়েছে যেইগুলি কান্টের মতকে সমর্থন করে না।

কান্টের মতে নীতিকে বাদ দিয়ে শিল্প সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। নীতিকে বাদ দেওয়ার অর্থ শিল্প সত্য থেকে বিচ্যুত হচ্ছে ফলে তা শিল্পরূপে গণ্য হতে পারে না।

কান্ট একথাও স্বীকার করেন শিল্প প্রতিভার সৃষ্টি, সাধারণ মানুষের কর্ম নয়।

শিল্পী 'আইডিয়ার'ই রূপ দেন কিন্তু আপন মহিমায় চিহ্নিত করে,যার কোনও সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। তাই কান্ট ব্যবহার করেছেন কথাটি যেটি পূর্বেই বলা হয়েছে। " পারপাসিভ্‌নেস্‌ উইদাউট পারপাস্‌।" অর্থাৎ উদ্দেশ্য ছাড়াই অমোঘ গতিতে উদ্দেশ্যের দিকে ধাবিত হয়।

কিন্তু শোপেনহাওয়ার বললেন শিল্পসৃষ্টির পিছনে কোনও কারণ থেকেই যায়। তাঁর মতে প্রত্যেক শিল্পসৃষ্টির পিছনেই কারণ থাকে। শোপেনহাওয়ার যে কারণের কথা বলেছেন সেই কারণ এবং উদ্দেশ্য এক নয়। কাজেই শোপেনহাওয়ারও স্পষ্টতঃ উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করেননি। কিন্তু কারণ উদ্দেশ্যের প্রথম পর্যায়।

শোপেনহাওয়ার সংগীত সম্বন্ধে বলেছেন,

"সংগীত কোন ধারণাকে ব্যক্ত করে না, ধারণারই সমান্তরালে যে বাসনা বর্তমান, সেই খোদ বাসনাকেই ব্যক্ত করে।...সংগীত গণিত নয় পরাদর্শন।...যিনি শিল্প অনুধ্যান করেন, তিনি আর ব্যক্তি থাকেন না, বিশুদ্ধ জ্ঞাতায় পরিণত হন—তিনি মুক্ত, বাসনা মুক্ত, বেদনা মুক্ত, কাল মুক্ত।"[২১] সংগীত এবং অন্যান্য সমস্ত শিল্পকেই শোপেনহাওয়ার সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। তাঁর মতে শিল্পই আইডিয়া'কে উপস্থাপিত করে।

কান্ট এবং শোপেনহাওয়ারের মতামত আলোচনা করলে আমরা বুঝতে পারি শিল্পকে তাঁরা যেখানে স্থান দিয়েছেন, সেখানে কোনও স্থূল উদ্দেশ্যের মাধ্যমে

পৌঁছান যায় না। শিল্পের মাধ্যমে আমরা আনন্দ পাই যে আনন্দের উপলব্ধিও আইডিয়াকেই অন্যরূপে উপস্থাপিত করে। দুই পথ গিয়ে এক পথে মিলিত হয় এবং ব্রহ্মস্বাদের সহোদর হয়। কান্টের মতে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য ও শিল্পসৌন্দর্য পৃথক। কান্টের মতে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য হল মুক্ত সৌন্দর্য, শিল্পে সেই সৌন্দর্য সৃষ্টি নাও হতে পারে। কিন্তু শিলার বললেন শিল্প বিশুদ্ধ সৌন্দর্যই সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

শিল্প সুন্দরকেই সৃষ্টি করে। অসুন্দরও শিল্পের মাধ্যমে সুন্দরে পরিণত হয়। শিল্পের বৈশিষ্ট্যই তাই। শিল্পের মাধ্যমে পৃথিবীর যাবতীয় রূপই সুন্দর রূপে প্রতিভাত হয়। পৃথিবীতে সুন্দর বস্তুই আনন্দদানে সক্ষম তাই শিল্পের উদ্দেশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আনন্দদান রূপে স্বীকৃত হয়।

সেই শিল্পসৃষ্টির পিছনে বুদ্ধিই কাজ করুক, ভাবাবেগই কাজ করুক বা নিরাসক্তিই থাক, পরিণতি তার একই।

সেইজন্যই শিলার শিল্পসৃষ্টির পিছনের এই কারখানাটির নাম দিয়েছেন খেলার রাজ্য (প্লে থিওরি অব্ আর্ট)। তবে শিলারের মতে এই খেলার রাজ্যে শিল্পীর মন যে ভাবেই ক্রিয়া করুক না কেন, শিল্পীর মন থাকে রূপ সৃষ্টির দিকে, এই কাজটি করে তার সচেতন মন, তার সঙ্গে ভাবাবেগ মিশ্রিত হয় তার নিরাসক্ত মনের দ্বারা। এই মিশ্রণের কাজটি যত সুচারুরূপে হয় শিল্পসৃষ্টি তত পরিণতির পথে অগ্রসর হয়।

শিল্পসৃষ্টির প্রারম্ভিক মনোভাবের বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় যে শিল্পে শ্লীল অশ্লীল সীমারেখা চিহ্নিত হলেই তা শিল্পসৃষ্টির পক্ষে বাধা স্বরূপ হয়। শিল্পের পরিণতি যদি যথার্থ হয়, আইডিয়ার অংশকেও যে শিল্প প্রতিষ্ঠিত করে সেই শিল্পই কালজয়ের পথে অগ্রসর হয় শ্লীল অশ্লীল তার বাধা হয় না। পরিণতি যার নেই সেই সৃষ্টি মাত্র কিছুদিন চঞ্চলতার সৃষ্টি করে অন্তর্হিত হয়। সেই সৃষ্টির উদ্দেশ্য যদি কিছু থাকেও তা তাৎক্ষণিক সফলতায় পর্যবসিত হয়। তার জন্য চিন্তিত হওয়ার কারণ ঘটে না। একথা প্রত্যেক শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। শিলারের মতটিকে সাধন ভট্টাচার্য ব্যাখ্যা করেছেন, শিলারের মতে মানুষের আত্মার মধ্যে দুটি বৃত্তি কাজ করে। একটি বিষয়ের অভিমুখী (স্টাফট্রিজ্) অর্থাৎ বস্তুধারণার, অপরটি ভাবের বা রূপের অভিমুখী (ফর্মট্রিজ) অর্থাৎ ভাবধারণার। এই দুইয়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপনার যে শক্তি তাকে বলে খেলাবৃত্তি। এই মতের সমর্থক হার্বার্ট স্পেন্সার। তাঁদের মতে মানসিক শক্তির উদবৃত্ত থেকে শিল্পের জন্ম।

আমরা দেখি যে প্রত্যেক শিল্পতাত্ত্বিক শিল্পের উদ্দেশ্য বা কার্যকারণ সম্পর্কে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন।

আর· জি· কলিংউড তাঁদের বক্তব্যকে নিজের পুস্তকে সংগ্রথিত করেছেন।[২২]

যেমন হেগেলের মতে শিল্পী তাঁর শিল্পের মধ্য দিয়ে নিজেকেই ব্যক্ত করেন। শিল্প আমাদের জ্ঞানে, আমাদের অনুভূতিতে আমাদের আবেগের মধ্যে আলোড়ন তোলে।[২২ক]

আবার সুনীতি চট্টোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে জানিয়েছেন 'রূপকর্ম, বাস্তুশিল্প, কাব্য, নাটক, অভিনয় ও সংগীত এই কয়টি সুকুমার শিল্পের মধ্যে সংগীতকেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মনীষীগণ সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। গ্রীক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক এ্যারিস্টটল্ সংগীতকে তাবৎ শিল্পের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দিব্যভাবময় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।"

এ্যারিস্টটল্-এর মতে আমরা সুরের মাধ্যমে আনন্দিত হই কেননা সংগীত সর্বদাই সামঞ্জস্য এবং ছন্দকে প্রকাশ করে ফলে আমাদের মানসিক অবস্থাও একই ভাবে ছন্দায়িত হয়ে যায়।[২২খ]

অর্থাৎ সংগীত আমাদের আনন্দ দেয় একথাটাই এ্যারিস্টটল্ সর্বাগ্রে স্বীকার করেছেন। কেন আনন্দ দেয় এটি ভিন্ন বক্তব্য। রিচার্ডস্ সরাসরি বলেছেন সংগীতকারের ক্ষেত্রে দুটি সুরের সংযোগ সাধনই বড় কথা নয়। কিন্তু আবেগের উপস্থাপনায় সামঞ্জস্য বা অসামঞ্জস্য এবং বিশেষ মানসিক অবস্থা যেগুলিকে সে সুরের মাধ্যমে উত্তেজিত করছে এগুলিও বিচার্য।[২২গ]

অর্থাৎ সংগীতজ্ঞরা সুরের সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে নজর দেন প্রধানত এই কারণেই যে তাতে আবেগের ক্ষেত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়। প্রকারান্তরে তিনি সংগীতের উদ্দেশ্য রূপেই আবেগ ব্যক্তকরণকে চিহ্নিত করেছেন।

"কি বৈজ্ঞানিক কি শৈল্পিক উভয় দৃষ্টিভঙ্গিতেই, স্বরের ছন্দোময় সংযোজন সে গলার মাধ্যমেই সম্পন্ন হোক অথবা যন্ত্রের মাধ্যমে সর্বদাই সুর এবং একতান, যে সাগ্রহে আহ্বান জানায়, যা কিছু প্রকাশণীয় তা প্রকাশ করার জন্য, বিশেষভাবে আবেগকে।[২২ঘ]

কিন্তু উপরোক্ত শিল্পতাত্ত্বিকদের প্রত্যেকটি কথাই যুক্তিগ্রাহ্য নয়। ছন্দের মাধুর্যের দ্বারা আবেগ উদ্রিক্ত হয় সত্য কথা কিন্তু সংগীতে যে ছন্দ থাকবেই এমন কোনও কথা নেই। ছন্দ আছে বলেই যে সংগীত শিল্পে পরিণত হচ্ছে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। ছন্দ এবং সামঞ্জস্য একটি প্রধান উপাদান হতে পারে কিন্তু শেষ কথা নয়। কারণ তাহলে সংগীত নিয়ে পরীক্ষা, সমীক্ষা সমস্তই

শেষ হয়ে যেত। এবং শুধু সংগীত কেন সমস্ত শিল্পই মৃত বলে পরিগণিত হত।

বরঞ্চ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আমেরিকার শিল্পতাত্ত্বিক আরউইন এডম্যান বলেছেন,

এই পৃথিবীতে যেখানে সবকিছুই মরীয়াভাবে ভুল নির্গত হচ্ছে, সেখানে একমাত্র সংগীতই অত্যন্ত চমৎকার এবং ঠিক ভাবে বেরিয়ে আসে। এ হল ধ্বনির যুক্তি বিদ্যা। সেই যুক্তি বিদ্যা নয় যা পাঠ্যপুস্তকের অন্তরালে হারিয়ে যায় বা মতামতের ক্ষেত্রে প্রযোজিত হয়। সংগীত হল জীবনীশক্তির বিন্যাস। ধ্বনির আলোকজ্জ্বল স্বপ্ন যা সুন্দরভাবে গ্রথিত হয়েছে এবং দানা বেঁধেছে।[২২ঙ]

তিনি শব্দকেই সংগীতের প্রধান অবলম্বনরূপে চিহ্নিত করেছেন, অর্থাৎ সেই শব্দালংকার যার মধ্যে সুর ছন্দ সামঞ্জস্য সব কিছুই থাকতে পারে। কিন্তু তাকে সচেতন মনের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাবে না। যদিও বক্তৃতাও শব্দ সমষ্টি তথাপি একটি কথা প্রচলিত আছে 'মিউজিক বিগিন্স হোয়ার স্পীচ এণ্ডস।'

হার্বার্ট স্পেন্সার সকল মতামতের অবসান ঘটিয়ে তাঁর বক্তব্যকে উপস্থাপিত করার প্রয়াস করেছেন,

সমগ্র চারুশিল্পের মধ্যে অন্যতম, সংগীত এমন একজন যে সমাজের কল্যাণ করতে সক্ষম যে কোনও একজন মন্ত্রীর চেয়ে।[২২চ]

শিল্প উদ্দেশ্যবিহীনতার মাধ্যমে উদ্দেশ্যের সিদ্ধিলাভ ঘটায়। "শিল্পসৃষ্টিতে উদ্দেশ্য, উপায় ও উপকরণ যখন একই ছন্দে গ্রথিত হয় তখনই শক্তির আর কোনও অপচয় ঘটতে পারে না।"

সক্রেটিস একটি সুন্দর কথা বলেছেন,

আমার অন্তরস্থিত আত্মার মধ্যে সৌন্দর্য দাও, আমার সর্বোচ্চ লক্ষ্য হবে তাকে পাওয়া, যেভাবে আমি ভগবানের অস্তিত্ব ব্যতীতই ভগবানকে সর্বত্র পেয়ে থাকি।[২২ছ]

রবীন্দ্রনাথ যাকে গানের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন

'অরূপবীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে'[২৩]

যে শিল্প অরূপকে রূপের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলবে, তাই হল সার্থক শিল্পসৃষ্টি।

অর্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী ক্লাইভ বেলের বক্তব্য বাংলায় অনুবাদ করেছেন "এক যুগের বুদ্ধি প্রতিভার দীপ্তি ও সাফল্য অন্য আর এক যুগে পরিণত হয় নির্বুদ্ধিতায়। কিন্তু মহনীয় রূপের কলাশিল্প স্থির, সুস্পষ্ট ও শাশ্বত। কারণ চারুকলা যে ভাবাবেগকে উদ্বেলিত করে তা স্থানকালের সীমিত গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়। তার স্বরাজ্য বাস্তব জগতের নিয়মে চলে না। গূঢ় অর্থদ্যোতক

(সিগ্‌নিফিক্যান্ট) রূপরাজির প্রকৃত রস রহস্য উপলব্ধি করার শক্তি যাঁদের আছে তাঁরা কোনও শিল্প পরশু প্যারিসে রচিত হয়েছে, না পাঁচ হাজার বছর আগে ব্যাবিলনে জন্মলাভ করেছিল তা নিয়ে সমস্যায় পড়েন না। শুদ্ধ সত্যরূপের শিল্প অক্ষয়, চিরস্থায়ী। যাবতীয় উচ্চাঙ্গের শিল্প প্রকৃত সৌন্দর্যাবেগের পথ ধরে পৌঁছে যায় রসোল্লাসের ঊর্ধ্বজগতে।"[২৪]

টলস্টয় এই মতের সমর্থক,

"আর্ট ইজ ওয়ান অব্ দি মিনস্ অব্ ইণ্টারকোর্স বিটউইন ম্যান অ্যাণ্ড ম্যান।"

ফ্রয়েড বলেছেন, শিল্পের মধ্য দিয়ে অবদমিত কামনা-বাসনারই রূপ প্রকাশিত হয়। শিল্প হল জাগ্রত স্বপ্ন। অনেকে বলেন শিল্প হল আবেগাপ্লুত মনের আবেগের প্রকাশ।

অনেকে বলেন দৈবকৃপা যাঁর উপরে যত বেশি তিনি তত বড় শিল্পী। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের উপর ভগবানের আশীর্বাদ আছে বলেই তিনি বিশ্ব কবি। কিন্তু উপরোক্ত সব মতই সম্পূর্ণরূপে যুক্তি গ্রাহ্য নয়।

কারণ আমরা জানি নিরাসক্ত মন না হলে শিল্পসৃষ্টি হতে পারে না। কাজেই আকর্ষণ, বিকর্ষণ, আবেগ, ঈশ্বরের কৃপা এগুলি সবই সাময়িক কারণ রূপে প্রদর্শিত হতে পারে, চূড়ান্ত কিছু প্রমাণ বা মতামত নয়।

শ্রীসুবোধ সেন বার্নার্ডশ এর মতামত ব্যক্ত করেছেন, "ট্রু হিস্ট্রী দ্যাট নেভার হ্যাপেন্‌ড্‌"। এটাই শিল্প সাহিত্যের গোড়ার কথা। এর আবেদন বুদ্ধির কাছে নয়, অনুভবের কাছে নয় বুদ্ধি ও অনুভবের দ্বারা উদ্‌ভাসিত উপলব্ধি ও অপূর্ব নির্মাণক্ষমা কল্পনার কাছে।

ওয়াল্‌স্‌টার পেটার বলেন প্রত্যেক শিল্পই সংগীতের পর্যায়ে পৌঁছাতে চায়, প্রয়োজনের দাসত্ব, অর্থের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে।

অর্থাৎ সংগীতই শেষ শিল্প যে শিল্পের জন্য প্রয়োজনের দ্বারস্থ হতে হয় না।

সুবোধ সেনের মতে সংগীত শেষ শিল্প কারণ এখানে শব্দের অর্থ নেই বলে ভাব ও রূপ একদেহে লীন হয়ে গেছে। যদিও তাঁর মত তর্কাতীত নয় তথাপি আমরা দেখি তিনি সংগীত শিল্প সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট মত ব্যক্ত করেছেন।

রোমা রোঁলার প্রথম পরিচয় হিউম্যানিস্ট রূপে, দ্বিতীয়ত শিল্পী রূপে। রোঁলা টলস্টয়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত। হিউম্যানিস্ট রূপে সমাজ সেবাই ছিল তাঁর প্রধান। ডঃ সুধীর নন্দী রোঁলাকে ভারতীয় ঋষিদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। 'ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি' ভারতীয় ঋষিদের এই ভাবধারা ছিল রোঁলায় সম্প্রসারিত।

সমাজ সৃজনী কার্যে রোঁলা শিল্পের স্থান দিয়েছেন, টলস্টয়ও তাই দিয়েছেন। রোঁলার মতে আমাদের সমস্ত শিল্পচেতনার মূলে জাতি ও শ্রেণীসমূহের এবং তাদের বিভিন্ন চিন্তাধারার অভিব্যক্তি। এ ব্যাপারেও তিনি টলস্টয়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত। কেননা মানুষ শিল্পের পটভূমিকায় মিলিত হয়, সভ্য ও সুন্দরের পটভূমিকায় যা মানুষকে মানুষ হতে বিচ্ছিন্ন করে তা অসৎ ও অসুন্দর। অর্থাৎ শিল্পের প্রাথমিক শর্তই হচ্ছে সত্য ও সুন্দর হবে। সুন্দর শিল্পমাত্রেই মানুষের আনন্দদানে সমর্থ হয়।

শিল্পীদের তিনি 'নেপোলিয়ানস্ অব্ পাবলিক টেস্ট' হতে বলেছেন, শিল্পীরাই জনসাধারণকে চালিত করতে সক্ষম। কেননা তাঁর মতে প্রকৃত শিল্পের মধ্যে পরম বস্তু থেকে যায়। রোঁলাও বার্গসোঁ-র মতো প্রাণ প্রাচুর্যের পূজারী। সর্বত্রই প্রাণের গতিবেগ, শিল্পে, নৈতিক জীবনে, ধর্মাচরণে। কিছুই মৃত নয়, সবকিছুই প্রাণবান হয়ে আপন গতিবেগে ধেয়ে চলতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, চিত্র ভাবকে দেয় আকার এবং সংগীত ভাবকে গতিদান করে। চিত্র সেই সংগীত প্রাণ।

রবীন্দ্রনাথও এই গতিবেগের আদর্শে শিল্পীর প্রাণপ্রাচুর্যে বিশ্বাসী হয়ে জানিয়েছেন,

"শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও
উদ্দাম উধাও ;
ফিরে নাহি চাও ;
যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।
কুড়ায়ে লও না কিছু, কর না সঞ্চয় ;
নাই শোক, নাই ভয়—
পথের আনন্দ বেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়॥"[২৫]

রবীন্দ্রনাথ সংগীতের (বিভিন্ন দেশের) বিভিন্নতা দেখে স্বীয় মনোভাব জানিয়েছেন রোঁলাকে। রোঁলা জানিয়েছেন সর্বদেশে, সংগীত বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে দাঁড়িয়ে থাকে। সংগীতেরও যেন শৈশব, বৃদ্ধি ও জরাজীর্ণতা রয়েছে। সংগীত কোন স্তরে ভাবের পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে তুলতে সক্ষম হয় না—সংগীতের পূর্ণতা কাল সাপেক্ষ হয়ে থাকে। যুগে যুগে জন্ম জন্মান্তরে বিভিন্ন শিল্পকার্য, সংগীত বিভিন্নভাবে পূর্ণতা লাভ করে কিন্তু শেষ পূর্ণতা বিচারও মানুষের বোধগম্যতার বাইরে থাকে।

ঋষি অরবিন্দ বলেছেন,

'মহান শিল্প শুধুমাত্র প্রকৃততথ্যকে উপস্থাপিত করে কখনোই সন্তুষ্ট হতে পারে না কারণ সেই তথ্য যে নিতান্তই বাহ্যিক। শিল্প সর্বদাই কোনও গভীরতর এবং মৌলিক সত্যের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকে। যে সত্য সাধারণ জ্ঞান এবং যুক্তির দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। সেই শিল্পের আত্মা হল অপ্রত্যক্ষ সত্য যা তার নিজস্ব আকারে এবং আচরণে উপস্থিত থাকে না কিন্তু থাকে আপন মহিমায়।"[২৭]

'সোল অব্ বিউটি' সাধারণ লোকের আগোচরে এটি ব্যক্ত হতে পারে,

"কবি এবং শিল্পীর সৃষ্ট সৌন্দর্যের স্বরূপটি কিছু পরিমাণে শুধু অন্য কবি বা শিল্পীর কাছেই ধরা পড়ে যারা গূঢ় অর্থটিকে বুঝতে সক্ষম হয়। কারণ পরমস্রষ্টা শিল্পীর শিল্পসৃষ্টিতে আত্মারূপে অধিষ্ঠান করেন।"[২৭ক]

এখানেই প্রশ্ন ওঠে তবে কি কোনও শিল্পকর্মই যথার্থ নয় বা প্রকৃত সত্যের দ্বার উদ্‌ঘাটনে বিমল আনন্দ প্রদানে অক্ষম ? অনেক ক্ষেত্রেই এর সত্যতা স্বীকার করে নিতে হয়। কিন্তু রোঁলা বলেন সম্পূর্ণ সমর্থন তখনই যখন "স্ট্রাইক দি গোল্ডেন মিন বিটউইন দি টু অ্যাটিচিউড ইনটেলেকচুয়্যাল অ্যাণ্ড ইমোশনাল" অর্থাৎ যখন আবেগের সঙ্গে বুদ্ধির যোগ ঘটে তখনই প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়। যা কিনা আপাতদৃষ্টিতে সর্বদাই শিল্পীর বা সমঝদারের কাছ থেকে প্রতীয়মান হয় না।'

বর্তমানকালে শিল্পবিচারে আর একটি বক্তব্য আলোচিত হয়ে থাকে সেটি হল শিল্পী পরিকল্পিত রূপে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। এই অভিমত উইটজেনস্টিন্ প্রথম আলোচনায় তুলে ধরেন। শিল্পীর অভিপ্রায় বা সংকল্পিত মনোভাব প্রকাশ। অপরদিকে ভ্রমাত্মক রূপে গ্রহণীয় হয় তাকে বলে 'ইনটেনশন্যাল ফ্যালাসি'

শিল্পী যেভাবে অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন গ্রহীতাকে তদনুরূপে গ্রহণ করতে হলে সম্পর্ক দাঁড়ায় ক্রিয়া ও প্রতিভূ সম্পর্ক রূপে। (অ্যাকশন্ এ্যাণ্ড এজেন্ট) অর্থাৎ যান্ত্রিকরূপে ক্রিয়াটি সংক্রামিত হতে সক্ষম যেন ক্রিয়াটি ভৌতিকরূপে অন্যের উপর নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে (ঘোষ্ট ইন্ দি মেশিন্) অভিপ্রায়ের ভাষাই (ল্যাঙ্গুয়েজ অব্ ইনটেনশন্) প্রধান বিবেচ্য হয় কেননা তাইই ক্রিয়া। কিন্তু যন্ত্র থেকে প্যাটার্ন বার হয়। কান্টের 'ক্রিটিক অব্ অ্যাসথেটিক জাজ্‌মেন্ট'এ উদ্দেশ্য বিমুখীন হয়ে উদ্দেশ্যমূলক হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। সুন্দরের উদ্দেশ্য অভিপ্রায়হীন হয়েও অভিপ্রায় রূপে দেখা দিতে পারে। কেন না প্রকৃত শিল্পের উদ্দেশ্য এবং ভোগ গঙ্গা যমুনার মিলিত রূপের মতই বিবেচিত হয়।

বেরেল লাঙ্‌ তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন যে ইনটেনশন্‌ ও রিয়্যালাইজেশন্‌ এর দুটো দিক রয়েছে এই উভয় অবস্থা পূর্বপরিকল্পিত। প্রথমটি দৈবাৎ এবং যান্ত্রিকরূপে সংগঠিত অপরদিকও জরুরী কেন না শিল্পের পরিধিতে গ্রহণ করবার রীতিও অবধারিত। প্রথম ক্ষেত্রে শিল্পে সর্বগুণ সমন্বয় সাধন করা দুরূহ।[২৮] (দি ফর্মাল ইস্যু ফ্রম দি ফ্যাক্ট দ্যাট মোমেণ্টস্‌ অব্‌ পারফেক্ট সিমেট্রি আর রেয়ার)

দ্বিতীয়ে শিল্পীর উদ্দেশ্য (ইনটেনশন্‌) এবং প্রকৃত ঘটনা (অ্যাকচুয়্যালিটি)র মধ্যে ফাঁক থাকবেই। সেইজন্য শিল্পকর্ম একটি সুসংবদ্ধ চক্ররূপে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। যার মধ্যে শিল্পতত্ত্বের বহু রীতিনীতি আপনিই এসে যায়।

বেরেল ল্যাং অ্যারিস্টটল্‌ এর বিষাদাত্মক রচনায় সূচনা, মধ্য ও অন্তের মধ্যে একটি পরিকল্পিত রূপ কল্পনা করে শিল্পের উদ্দেশ্যের একটি প্রমাণ রূপে লিখেছেন। তাহলে শিল্পের মূল আকর্ষণ কি ? সে সম্পর্কে জানিয়েছেন উদ্দেশ্যো ভাষাসমূহ কি ব্যক্ত করে তাব উপরই নির্ভর করে মূল আকর্ষণের আলোচনা।

এ. জে. এ্যালিস্‌ তাঁর প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। "অধ্যাত্মভাব পরিবেষ্টিত মন ও প্রচেষ্টার মন বলা যেতে পারে মহাপিতার মহৎ ইচ্ছার প্রতি বিশ্বাস"[২৯]

"ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা প্রভু তোমার পানে,
তোমার পানে, তোমার পানে।"

বার বার একই ইচ্ছা ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু প্রচেষ্টার অর্থ ব্যাপক, এখানে দেহ ও মনেব উভয়ের শক্তি সমভাবে বিবেচ্য। ব্যক্তির মানস চক্ষু জ্ঞান চক্ষুতে পরিণত না হলে দিব্যচক্ষুর চিন্তা বৃথা। মানস চক্ষু কিংবা দিব্য চক্ষু প্রকারান্তরে অবিদ্যাকে প্রশ্রয় দিয়ে চলে আবার অবিদ্যাও অস্তিমে মহাসত্তার সঙ্গে মিলিত হয় যা বিদ্যার আধার।

প্রচেষ্টা মানুষের ক্ষেত্রে সার্থকরূপে সম্ভাব্য করে তুলে ধরতে হলে মানুষকেই হতে হবে অধ্যাত্ম। এখানে অধ্যাত্ম অর্থে 'এঞ্জেলিক' (দেবতা) বুঝায়, অধিদেবতা (পরমাত্মা) সর্বজনীন রূপে স্বীকৃতি লাভ করে।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, আমাদের উদ্দেশ্য হবে ঈশ্বরের মতই খাঁটি হওয়া। হতে হবে তাঁরই মত সৎ ও নির্মল। পূর্ণযোগের মাধ্যমে আমরা সিদ্ধিলাভ করলে মনুষ্য সমাজকেও সেই পরিপূর্ণ দেবময়তার (ডিভাইন্‌ পারফেকশন্‌) সান্নিধ্যে তুলে ধরতে পারি। সাধারণত মন কোন না কোন উপায়েই সৎ, চিত বা আনন্দ অথবা সচ্চিদানন্দের কাছাকাছিই থাকে। সর্বদাই মানস রাজ্যের উর্ধ্বে উঠবার প্রবণতা রক্ষা করে তার অহং এর মায়া বা মোহের তৃপ্তি ঘটানোর জন্য বা

সেগুলোর হাত থেকে অহং পরিবর্জিত হয়ে মুক্তি পাবার ইচ্ছা নিয়ে। এর জন্যই মানুষের প্রচেষ্টা থাকে আত্মাকে অধ্যাত্মে পরিণত করণে, যেখানে ব্যক্তি (ইনডিভিজুয়্যাল) পরমাত্মার বা বিশ্বাত্মার ভাব প্রকাশ করতে সমর্থ হন, মানুষকে সচ্চিদানন্দের সমীপে এনে আনন্দে বিভোর করে তোলেন। জীবাত্মাকে অধ্যাত্ম পর্যায়ে তুলে ধরতে হলে আত্মা বা পুরুষকে তাকে প্রকৃতির উর্ধ্বে স্থাপন করতে হবে শান্ত সমাহিতরূপে যেখানে জীবনের বিড়ম্বনা বোধ থাকবে না—থাকবে না কোন জাগতিক আকাঙ্ক্ষা বা অভিজ্ঞতা।'

প্রকৃতির এই উচ্চ স্তরে রয়েছে দিব্য চেতনা (ডিভাইন কনসাস্‌নেস্‌) অথবা মাতৃশক্তি যা জীবাত্মাকে চালিত করে। প্রকৃতি পুরুষকে (আত্মা), সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণে বেঁধে রেখেছেন। মানুষের যতই অধ্যাত্ম বিকাশ ঘটতে থাকে ততই পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি বা প্রকাশ (এক্সপ্রেশন্‌) ঘটতে থাকে। মানুষ যে বিমলানন্দ উপভোগ করে বা লোককে করায় তাই জ্যোতি, তপ এবং সম গুণময় থাকে। অধ্যাত্ম শক্তির স্বরূপে জীবাত্মা পুরুষে এবং প্রকৃতিতে সমভাবে থাকেন যাকে জয় করতে হয়। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন একের মধ্যে এই দ্বৈত ভাবের উপলব্ধিকরণ, এর মধ্যেই রয়েছে সামগ্রিক আত্মপরিপূর্ণতার অবস্থা উপলব্ধিকরণ।

"টু রিয়্যালাইজ দিস ডাবল্‌ ডিউনেস্‌ ইজ দি কনডিশন্‌ অব্‌ ইনট্রিগ্যাল সেল্‌ফ্‌ পারফেক্‌শন্‌"

ভরতমুনির মতে ক্ষুদ্রমত বাসনা সব মহাপিতার মহেচ্ছা থেকেই শুরু হয়।

এই উপলব্ধিকরণ শিল্পের ক্ষেত্রে প্রধানত সংগীতের দ্বারাই সম্ভব। মহামুনি ভরত বলেছেন সংগীত—শিশু, অজ্ঞানী, জ্ঞানী সর্বস্তরের অন্তরেই আবেগ সৃষ্টিক্ষম। সংগীতে যা চলে আসছে এবং ভবিষ্যতে যা পরিণত হবে তার কিছুই ফেলে দেওয়ার নেই। সর্বশেষ উপভোগ একমাত্র সংগীতের দ্বারাই সম্ভব।

শ্রীমুলক্‌ রাজ আনন্দ প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রে বর্ণিত একটি গল্পের অবতারণা করেছেন।

রাজা হে মহাযোগীন। আমাকে মূর্তিনির্মাণ পদ্ধতি শিক্ষা দিন।

যোগী কেউ যদি চিত্রাঙ্কনের রীতিনীতি না জানে তার পক্ষে মূর্তিনির্মাণ পদ্ধতি শিক্ষা সম্ভব নয়।

রাজা তাহলে যোগী প্রবর, আমাকে চিত্রাঙ্কনের রীতিনীতি শিক্ষা দিন।

যোগী চিত্রাঙ্কনের রীতিনীতি অনুধাবন দুরূহ যদি না নৃত্যকলা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানাহরণ না করা থাকে।

রাজা বেশ তাহলে আমাকে নৃত্যকলা বিষয়েই শিক্ষা দিন।

যোগী কিন্তু যন্ত্রসংগীতের রীতিনীতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না জন্মালে তো নৃত্যকলা বিষয়েও কিছু শিক্ষা দেওয়া যায় না।

রাজা প্রভু তাহলে প্রার্থনা করি যন্ত্রসংগীতের রীতিনীতিই শিক্ষা দিন।

যোগী কিন্তু যন্ত্রসংগীতের কলা কৌশলই বা কীভাবে জানা যাবে যদি কণ্ঠসংগীতের কলা কৌশল সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান না জন্মায়।

রাজা যদি কণ্ঠসংগীতই একমাত্র উপায় এবং কলাসমূহের শেষ বিবেচ্য হয় তবে হে মহামুনি আমাকে সেই কণ্ঠসংগীতের রীতিনীতি শিক্ষাদান করুন।[৩০]

মূলক রাজ শোপেনহাওয়ারের উদ্ধৃতি দিয়েছেন প্রসঙ্গক্রমে যে সকল কলাশাস্ত্রই অন্তিমে সংগীতময়তা প্রাপ্ত হয়। (অল আর্টস কনস্ট্যাণ্টলি লেড টু এ্যাটেন দি মিউজিক)। স্বর্গীয় নন্দলাল বসু প্রখ্যাত শিল্পী। তাঁর মতে আনন্দ সমস্ত সুখদুঃখ নিয়ে অথচ সমস্ত সুখদুঃখের অতীত। আর্টিস্টও সৃষ্টি করে সৃষ্টি করার আনন্দেই। কোনও শিল্পবস্তু যথার্থ সৃষ্টির পর্যায়ে পড়ল কি না তার বিচারও হয় ঐ থেকে। আনন্দ থেকে যদি কোনও একটি চিত্র বা মূর্তির উদ্ভব হয়ে থাকে, অন্যকেও তা আনন্দের স্বাদ দেবে। প্রকৃত শিল্পসৃষ্টি জীবন্ত, তার মৃত্যু নেই। যদি অজন্তা ইলোরার সমস্ত চিত্র ও মূর্তি নষ্ট হয়ে যায়, আসলে তবুও তার নাশ নেই। কারণ রসিকের চিত্তে তখনও তা অমর হয়ে থাকবে। অর্থাৎ শিল্প যেহেতু সৃষ্টি সেহেতু তা জীবধর্মী। জীবেরই মতো তার অস্তিত্বের ধারা পুরুষানুক্রমে বয়ে চলে। সকল শিল্পের লক্ষ্য এক। কবিতা, মূর্তি, চিত্র, নাচ, গান সবই সৃষ্টির মূল আনন্দের ছন্দকে আপন আপন ছন্দে ধরতে যায়। সে হিসাবে যোগ সাধনার সঙ্গে শিল্পসাধনার মিল আছে।

শ্রীনন্দলাল বসুর মতে,

"রসের দিক থেকে সৃষ্টি করা না হলে, রসে না পৌঁছলে রচনা বিকৃত হয়, সুখে বিকৃত, দুঃখে বিকৃত। কাজেই দেখা যায় সাধকেরও যে ধারা শিল্পীরও তাই, উভয়েই নিজের নিজের পথ ধরে লাভ করে সর্বগত এক বিশুদ্ধ আনন্দ। রসের ব্যভিচার ঘটালেই শিল্পের পক্ষে তা দুর্নীতি। রসের ব্যভিচার ঘটিয়ে শিল্পকে সামাজিক সুনীতি প্রচারেও লাগানো যায় যথার্থ শিল্পসৃষ্টি তা নয়। শিল্পীও মায়াকে জেনে মায়ার ব্যবহার করেন বলেই তা হয়ে ওঠে লীলা। আপাত দৃষ্টিতে তুচ্ছই হোক আর উচ্চই হোক, অনিত্যই হোক আর নিত্যই হোক সবের ভিতরে

অনুস্যূত একের ঐক্যটিকে অনুভব করা ও প্রকাশ করাই শিল্পীর সাধনা শিল্পীর সিদ্ধি।”

তৃতীয় অধ্যায়

শিল্প সাধনা ও অপূর্ব ইন্দ্রিয়ানুভূতি, সংগীত ও ব্যঞ্জনা

মনের অতীতে মনোবিদেরা চিন্তা করেননি। আত্মা (সোল) নিয়ে মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের চিন্তার পরিধি তত বিস্তৃত নয় তাঁদের গবেষণা মন (মাইন্ড) নিয়ে। সেইজন্য পূণর্জন্ম শুধু অলৌকিক অনুভূতিই প্রকাশ করে আসছে এ পর্যন্ত।

যাঁরা এই নিয়ে গবেষণা করেছেন তাঁদের বলা হয় অনুমনোবিজ্ঞানী (প্যারা সাইকোলজিস্ট)। অনু শব্দ এখানে এইজন্য ব্যবহৃত যে এঁদের গবেষণার ভিত্তি হল বৈজ্ঞানিক পরমাণুবাদের সঙ্গে কোনও মতবাদ যুক্ত করান, আর দ্বিতীয়ত এই পদ্ধতি যেন মনস্তাত্ত্বিকতার ধারা অনুসরণ করে।

তাঁদের মতে সাধারণ লোকেদের মতই অশরীরীদেরও চলাচল রয়েছে। কারণ সাধারণের চিন্তা, অনুভূতি, স্মরণ, আবেগ প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়ার এই অনুমানসিকতার মধ্যেও একটা সাদৃশ্যপূর্ণ রূপায়ণ হয়েছে।

অবশ্যম্ভাবীবাদ (ডিটারমিনেজ্‌ম্‌) আজকাল আলোচিত হয়। যে ক্রিয়াটি অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রতিফলিত তার প্রকাশে স্মরণ, অনুভূতি, আবেগের স্থান বেশি নেই। এই ধারার অনুসরণকারীরা আচরণবাদী রূপেই পরিচিত। কারণ দেখা যায় কোনও ব্যক্তি নির্দিষ্ট কর্মে অবিসম্বাদীরূপে চালিত হন এবং সেইমত কাজ করেন। মনের বাইরের শক্তি কার্যকরীরূপে দেখান সম্ভবপর হলে নিশ্চিতই সেটি বর্তমান মনোবিজ্ঞানীদের বিধিবদ্ধ প্রণালী বা মাপকাঠিতে বিচার্য হয়ে উঠতে পারে না।

ইন্দ্রিয় চেতনার বাইরেও যে সংবেদনা ধারণাক্ষম বোধশক্তিকে জাগ্রত করে তাকে অণুমনস্তাত্ত্বিকেরা একস্ট্রা সেরিব্র্যাল পারসেপসন্‌ রূপে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অতীতের দানা বাঁধা সংবাদ মনের দুয়ারে অবয়ব নিয়ে নেমে দাঁড়ালে বা কারও ইচ্ছা পূরণের নিমিত্ত ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করলে কিংবা নিজের কোন দুরন্ত আশা বাস্তবে পরিণত করবার উন্মাদনা দেখা

দিলে সেই জীবনের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বা উদ্দেশ্য কোন দিকে ধাবিত হবে মানসিক দিক থেকে তার হদিশ্ পাওয়ার সঠিক পথ আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে।

হিন্দুরা দেবীর নিকট যে প্রার্থনা করেন, তার মধ্যে নৃত্য গীত ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী হবার বাসনা জানান হয়।

বেদা : শাস্ত্রাণি সর্বাণি
নৃত্যগীতাদিকঞ্চ যৎ
ন বিহীনং ত্বয়া দেবি !
তথা মে সন্তু সিদ্ধয়ঃ।

কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজনই মা সরস্বতীর কৃপা অর্জনে সক্ষম হয়। মন্ত্র মানতে হলে এই নৃত্যগীতাদির সাধনা ব্যতীত সামাজিক বন্ধন বা হৃদ্যতা সাধনও সম্ভব নয়। কামশাস্ত্রে রয়েছে, চিত্রবিদ্যা, গীতবিদ্যা আয়ত্তের জন্য ব্যক্তিকে ষড়ঙ্গ (ছয়টি অঙ্গ যথা রূপ ভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য এবং বর্ণিকাভঙ্গ) বিষয়ে যত্নবান্ হতে হয়। কেননা এগুলোর উদ্দেশ্যই হল লোকের মানসিক বিরাগ নষ্ট করে অনুরাগ বাড়ানো, শিল্পীর সন্তপ্ত বাসনা শান্ত করা এবং চিদানন্দকে উপলব্ধির সীমায় আনা।

শাস্ত্রে আছে সাধনার দ্বারা ইহজন্মে যদি কিছু চরম প্রাপ্তি নাই ঘটে তবে পরজন্ম তো রয়েছেই। পরজন্মে বিশ্বাস করা, জরাজীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করে নূতন দেহ লাভ করার মধ্যে রয়েছে শুধু জন্ম মৃত্যুর সাক্ষাৎ কালটি। তাই জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী হওয়াটাই হিন্দুদের সমগ্র সাধনার মূল ভিত্তি স্বরূপ বিবেচিত হয়।

সাধনার ফল লাভ না ঘটা পর্যন্ত কর্মচক্রটির ছেদ নেই, মুক্তিও নেই। হিন্দু মতে আত্মা অবিনাশী। গীতায় রয়েছে এমন কোন অস্ত্র নেই যা আত্মাকে ছেদ করতে পারে, এমন কোনও দাহিকা শক্তি নেই যে আত্মাকে ধ্বংস করতে সক্ষম।

রুথ রেণা তাঁর 'রিইনকারনেশন এণ্ড সাইন্স' গ্রন্থে পুনর্জন্ম নিয়ে সবিশেষ আলোচনা করেছেন।

বর্তমান মানবজীবনের শিল্পসাধনার ক্ষেত্রটিকে কেন্দ্র করে পুনর্জন্মবাদের কিছু কিছু তত্ত্ব ডঃ রেণার পুস্তক হতে উদ্ধৃত করে আলোচনা করা হচ্ছে। তিনি প্রথমেই বেদ ও বৌদ্ধদর্শন সমূহের নাম উল্লেখ করে কঠোপনিষদের সেই শাশ্বত বাণীটি তুলে ধরেছেন যেখানে বলা হচ্ছে, জীব শস্যের মত পরিপক্কতা

লাভ করে এবং শস্যের মতই অঙ্কুর হতে আবার জেগে ওঠে। এই বীজটিই প্রাচ্যে দেহ চরিত্র (ক্যারেকটার) ভঙ্গুর দেহ (সাটল্ বডি) অথবা কায়াস্বরূপ ছায়া (ইমপ্রেশন) রূপে বিবেচিত হয়।

বেদ এবং উপনিষদের নানা প্রকার বিধিপালনের মূলেই রয়েছে উদ্দেশ্য, তা হল অর্থ, কাম, মোক্ষ লাভ। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম বলতে যেটি বোঝা যায় সেটি হল একাধারে চিত্তের প্রশান্তি লাভ ও ব্যক্তির হৃদয়জয় করে নেওয়ার সহজ পথ। সাধনার এই মার্গটি অতি সহজ কিন্তু আয়ত্ত করা অতি কঠিন। এই মার্গটি শিল্পের মধ্য দিয়েই প্রশস্ত হয়। পুনর্জন্মবাদ প্রচলিত আছে বলেই অনেকেই আশা রাখেন এজন্মে সাধনায় সিদ্ধিলাভ না হলেও পরবর্তীকালে নিশ্চয়ই হবে।

পুনর্জন্মবাদের সত্যতা প্রমাণ স্বরূপ অনুমনোবিজ্ঞানীরা বহু তথ্য উপস্থাপিত করেছেন যেখানে জাতক তার পূর্বজন্মের ঘটনা স্মরণ করতে সক্ষম হয়েছে। অনেকে মৃত ব্যক্তির আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়েছেন তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে।

পরলোকের অনেক ঘটনাই আশ্চর্যজনকভাবে স্বাভাবিক স্তরের (প্যারা নর্মাল)। এদের মনোবাসনা প্রায় জীবন্ত মানুষেরই মত, এদের সাক্ষাৎপ্রার্থী হলে এরা অনেক সময়ে ধরা দেয়, কথা বলে যেন একটি অশরীরীপ্রাণী মাত্র। এবং মৃতব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনার প্রক্রিয়াটি আজকের নয় বহু পুরাতন এবং এরই সঙ্গে পাশাপাশি চলে আসছে প্রতিমা এবং নানাবিধ মূর্তিপূজা। অর্থাৎ মানুষ নিজের মনের সঙ্গে সেতু বন্ধন করে অন্য রূপ, অন্য ভাব এবং অন্য 'লোকে'র সঙ্গে।

ডঃ সুকুমার সেন বলেন :

"প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ভারতীয় ও ইরানীরা সূর্য পূজা করেন, পলিনেশীয় ইত্যাদি জাতিদেরও বিশ্বাস এর মধ্যে বর্তমান। অধ্যাত্ম ভাবনা এবং অনুষ্ঠানের সঙ্গে অবৈদিক এবং লৌকিক ঐতিহ্যের ধারা মিশ্রিত হয়েছে।

ধর্মের পূজা এবং শিবের গাজন এখন আর গ্রামবাংলায় পৃথক করবার উপায় নেই। ঠিক যেমন শাক্তধর্মের সঙ্গে মিলে মিশে দাঁড়িয়ে গেছে আদিবাসীদের পূজা ও সংস্কৃতির ধারা তাই মা শুভংকরী এবং ভয়ংকরী উভয়েই সমগোত্রীয়।"

অন্নদাশংকর রায় বলেন,

"রেনেসাঁস যেখানে ঘটে সেখানে ধর্মযাজক বা মান্দারিণ বা ব্রাহ্মণ বা উলেমার চেয়ে বৈজ্ঞানিক বা নাট্যকার বা ভাস্করের মহত্ত্ব বৃদ্ধি পায়।"

তবুও যে সমস্ত গুণী রহস্যবাদ, ভূতভবিষ্যৎ গণনা এমনকি তুকতাক,

ঝাড়ফুঁক ইত্যাদির জাদুকরী বিদ্যা নিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাঁরা নিজেদের বক্তব্য কোনও দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে আরো সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন এবং কিছুটা সফল হন।

সেইজন্যই আমরা দেখি চিরদিনই পৃথিবীর সাহিত্যে বাস্তব ঘটনার সঙ্গে কতকগুলি অতিপ্রাকৃত ঘটনাও স্থান পেয়ে থাকে। যেমন গল্প উপন্যাসে বা নাটকে দেবদেবী বা ভূত বা অশরীরী আত্মার আবির্ভাব বা দুর্লক্ষণ দেখে কোনও অশুভ ঘটনার আশংকা ইত্যাদি। আবার দেখা যায় লেখকেরা মনের সঙ্গে তুলনা করেন প্রকৃতির। মনের মধ্যে ঝড় ওঠে অনেক সময়ে দেখা যায় প্রকৃতিতেও সেই সময়ে চলেছে তাণ্ডবলীলা।

সব থেকে বড় কথা এইগুলি মানুষ সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করে মন থেকে দূর করে দিতে পারে না। তার কারণ এর মধ্যেও সত্য বলে কিছু আছে। হয়তো কোনও একদিন সত্য রূপে গ্রহণ করবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল সেইহেতু পরবর্তীকালে তা সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। বিশ্বাস. অবিশ্বাস বা আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে এবং অভিজ্ঞতার বাইরে এই উভয়বিধ ধারণাকেই সাহিত্যে যথাযথ স্থান দিলে তা মানুষের মনে প্রভাব সৃষ্টি করে। মানুষ তখন তার সত্যাসত্য নিয়ে মাথা ঘামায় না. এব সার্থক প্রয়োগ দেখা যায় শেক্সপীয়রের নাটকে।

কতকগুলি ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা দেখা যায়। ম্যাকবেথ্ নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে দেখি ডাইনীরা ভবিষ্যদবক্তার কাজ করেছে। অর্থাৎ নাট্যকার এর মধ্য দিয়েই নাটকে সাসপেন্স সৃষ্টি করলেন।

কিন্তু ডাইনীরা যদি কথায় কোনও কিছু প্রকাশ করে তা দর্শকদের মনে কোনও বিশেষ প্রভাব রাখবে না সেইজন্য দেখা যায় তারা নৃত্য, গীত এবং পরস্পরের মধ্যে গীতরূপে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বক্তব্য প্রকাশ করেছে।

১ উইচ. অল্ হেল্, ম্যাকবেথ্!
হেল্ টু দি, থেন অব্ গ্লেমিস্!
২ উইচ, অল্ হেল, ম্যাকবেথ!
হেল্ টু দি, থেন অব্ কডোর!
৩ উইচ্, অল্ হেল, ম্যাকবেথ্ দাট
শ্যাল্ বি কিং হিয়ার আফটার!

তদ্রূপ জুলিয়াস সীজার নাটকের সীজার যখন নিজ ক্ষমতায় আস্থাবান, গর্বভরে

নগর পরিক্রমা করছেন, সেই সময়ে শুনলেন ভবিষ্যদ্‌বাণী। সকল কোলাহলের মধ্যে ধ্বনিত হল একটি কণ্ঠস্বর—

প্রথম অঙ্কেই

'স্যুদ্‌, বি ওয়্যার দি আইড্‌স্‌ অব্‌ মার্চ,'

দর্শকের মনে কৌতূহল জেগে উঠল। নিজ ক্ষমতায় পরিপূর্ণ আস্থাবান সীজার, কী বিপদই বা তাঁর ঘটতে পারে অতঃপর নাটকের সংঘাতের শুরু।

শেক্সপীয়রের এই প্রকার অতিপ্রাকৃত রচনাগুলিও ছিল কল্পনামূলক এবং পূর্বাপর চরিত্রগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ তাই পাঠকও রচনাগুলি বার বার পাঠ করেও বাস্তব বলেই গ্রহণ করেছে, অলীক ভাবনা সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন জাগেনি মনে। সেইরকম স্বপ্নকেও প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে নাটকে। সীজার পত্নী কালপর্ণিয়া স্বপ্ন দেখছেন সেই সময়ে বজ্রবিদ্যুৎ আকাশে, মেঘের ঘনঘটা।

'হেল্প ও ! দে মার্ডার সীজার ! হু ইজ্‌ উইদিন ?'

এখানে লেখকও দর্শকদের বিপদ সম্বন্ধে সচেতন করতে চান তাই সীজার পত্নী স্বপ্ন দেখলেন আবার রোমবাসীরা দেখল নানা দুর্লক্ষণ।

'এ লায়নেস্‌ হ্যাথ্‌ হেলপ্‌ড ইন দি স্ট্রীট্‌স এ্যাণ্ড গ্রেভ্‌স্‌ হ্যাভ
ইয়নড্‌ এ্যাণ্ড ইণ্ডেড আপ দেয়ার ডেড্‌।
ফিয়ার্স ফিয়ারি ওয়্যারিয়র্‌স্‌ ফাইট্‌ আপন দি ক্লাউড্‌স্‌··" হ্যাম্‌লেট নাটকে হ্যামলেটের মৃত পিতা প্রথমেই দর্শন দিলেন, এবং তাঁর মৃত্যুর কারণ জানালেন

"ঘোষ্ট রিভেঞ্জ হিস্‌ ফাউল এ্যাণ্ড মোষ্ট আন্যাচারাল মার্ডার" ইত্যাদি : টেমপেষ্ট নাটকটি তো সম্পূর্ণই অশরীরী আত্মার উপর নির্ভরশীল। নাটকের যিনি প্রধান সেই প্রস্পেরো ছিলেন জাদুবিদ্যায় সুপণ্ডিত। অথচ প্রকৃতির এই পরিবেশ, পাত্রপাত্রীর মনের ভাবনা ঠিকমত ব্যাখ্যা করবার চেয়ে অবিচল চিত্তে গ্রহণ করেই এসেছে পাঠক।

শেকস্‌পীয়র অবশ্য তাঁর অতিপ্রাকৃতবাদের ব্যবহার সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বলেই মনে হয় তাই 'হ্যামলেটে' আছে

"দেয়ার আর মোর থিংস্‌ ইন হেভেন এ্যাণ্ড আর্থ, হ্যোর‍্যাশিও, দ্যান্‌ আর ড্রেম্‌ট্‌ অফ ইন্‌ ইওর ফিলসফি ?"

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতেও দেখা যায় কপালকুণ্ডলা, দুর্গেশনন্দিনী, সীতারাম ইত্যাদি উপন্যাসে সাধুদের আগমন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি এই সাধু চরিত্রকে দেখিয়েছেন জ্যোতিষবিদ্যায় সুপণ্ডিতরূপে। অর্থাৎ তাঁরাই উপন্যাসটির গতি

নিয়ন্ত্রিত করেছেন। এইগুলি ঠিক অতিপ্রাকৃত কিছু নয় কিন্তু অতিপ্রাকৃতের প্রতি লেখকের বিশ্বাসই ঘোষণা করে।

কপালকুণ্ডলা ঠাকুরের সামনে ফুল বিল্বপত্র অর্ঘ দিল। পড়ে গেলেই বুঝতে হবে অমঙ্গল হবে। হলও তাই। পাঠকের মন প্রথমেই কপালকুণ্ডলার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে শঙ্কাকুল হয়ে উঠল। অর্থাৎ পাঠক নিজের অজ্ঞাতসারেই বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন এমন ঘটনায় যা তাঁর অভিজ্ঞতায় নেই। সীতারাম উপন্যাসে রাজার সঙ্গে পাঠকও চিন্তা করছে শ্রী কি তবে রাজারই মৃত্যুর কারণ হবে ?

রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণ গল্পে ভৌতিক অবতারণা যেমন সত্যরূপে দেখান হয়েছে, তেমনই গীতিনাট্যে এবং কতকগুলি গল্পে যেমন কঙ্কাল, মণিহারা, নিশীথে ইত্যাদি গল্পে অতিপ্রাকৃত শক্তি বিশেষ সহায়করূপে ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষভাব সঞ্চারে এই অস্বাভাবিকতার বাড়াবাড়ি করা হয়েছে সাহিত্যের নবজাগরণের যুগে। দ্বিজেন্দ্রলাল, গিরিশ ঘোষের মত সুবিখ্যাত নাট্যকারের নাটকও পৃথিবী ও স্বর্গের মিলনদৃশ্যের উপর রচিত হয়েছে। ভবিষ্যদ্‌বাণী করবার জন্য নিয়তি (ফেট) চরিত্রের অবতারণা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যেও দেখা যায় এক ধরনের সেই অতিপ্রাকৃতের অবতারণা।

চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যে প্রকৃতি আনন্দকে আকর্ষণ করবার জন্য মায়ের সাহায্য নিচ্ছে। মা তাঁর যাদু মন্ত্রের সাহায্যে আনন্দকে তার নিজের জগৎ থেকে টেনে আনতে চাইছেন।

> "জাগেনি এখনও জাগেনি
> রসাতল বাসিনী নাগিনী ॥
> বাজ বাজ বাজ্ বাঁশী বাজরে,
> মহাভীম পাতালি রাগিনী,
> জেগে ওঠ মায়া কাশী-নাগিনী"[১] ইত্যাদি

অবশেষে আনন্দকে আনতে সক্ষম হয়েছে প্রকৃতি এই মন্ত্রের জোরেই। চিত্রাঙ্গদা নাটকেও কুরূপা চিত্রাঙ্গদা মদনের আরাধনা করেছে, প্রার্থনা জানিয়েছে,

> "শুধু এক বরষের জন্যে
> পুষ্পে লাবণ্যে
> মোর দেহ পাক্ তব স্বর্গের মূল্য
> মর্তে অতুল্য..."[২]

ঈশ্বর তাঁর প্রার্থনা পূরণ করেছেন। হয়তো এই ধরনের রচনার মূলে আছে রামায়ণ এবং মহাভারত, প্রাকৃত ও অতি প্রাকৃতের সংমিশ্রণ যেখানে

অনেকক্ষেত্রে দেবতারা লীলা করতে নেমে দাঁড়িয়েছেন মর্ত্যবাসীদের সঙ্গে।

শেকস্‌পীয়ার যেমন অনুসরণ করেছেন ইওরোপের প্রাচীন সাহিত্য ইলিয়ড, ওডিসি ইত্যাদিকে। ভারতবর্ষও তেমনই এই অতিপ্রাকৃতকে চিরদিনই ভয় করেছে এবং শ্রদ্ধা করেছে। যে কটি প্রাকৃতিক ক্ষেত্র থেকে মানুষের বিপদ উপস্থিত হতে পারে, শিক্ষিত অশিক্ষিত অধিকাংশ মানুষেরই ধারণা এর মূলে কোনও দেবতার বিধান ক্রিয়াশীল। নানা দেব-দেবীর উপর ভিত্তি করে জন্ম নিয়েছে মঙ্গলকাব্যগুলি। গীতি গাথার রূপ গ্রহণ করেছে স্তুতি মালাগুলি। পৃথিবীর প্রাচীন সাহিত্যগুলিতেও পাওয়া যায় বায়ুর দেবতা পবন, জলের দেবতা বরুণ, অগ্নিদেব অগ্নির দেবতা, আরও কত কী।

তাই আদি যুগ থেকেই চলে আসছে সেই ভীষণ দেবতা পুঞ্জের আরাধনা পদ্ধতি, নৃত্যে, গীতে ও বাদ্যের করুণ রসে, প্রচণ্ড উল্লাসে, ভীষণ ভৈরবে।

কোনও আসন্ন ক্ষতির পূর্বাভাষের মধ্য দিয়ে ভয় চেতনাকে তাড়িত করতে থাকে, তারই মুক্তি লালসে ধীরে ধীরে সংস্কার জন্ম নেয়। সাধারণ ইন্দ্রিয়ানুভূতির নাগালের বাইরে এই সংস্কারের মায়াজাল। তাই প্রাণমন দিয়ে গীত আরাধনা। গীতের জয়েই মোহ কালিমা ঘুচে যায়। পাপভাব মন হতে স্খলিত হতে থাকে। মানুষ হয়ে ওঠে আনন্দোচ্ছল। সেইজন্যই দেখা যায় সংগীতাদির প্রাথমিক উপযোগিতা ইন্দ্রিয়ানুভূতির ঊর্ধ্বে আনন্দ লাভ করা, চৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগ ঘটান, ফলশ্রুতিতে বিশোধিত (ক্যাথারসিস) হওয়ার রীতি সর্বদেশেই লক্ষ্য করা যায়। শুধু হিন্দুদের ক্ষেত্রেই নয়, পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির মধ্যেই এই ধর্মবোধ, সংস্কার এবং অলৌকিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার রীতি তার জন্ম লগ্ন থেকেই চলে আসছে।

মার্কস্ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, ইতিহাস একরকম আর এই অলৌকিক কাহিনীগুলি ইতিহাসের মত হলেও ভিন্ন ধরনের। সেই হেতু এই আজগুবি কাহিনী ও এ নিয়ে গবেষণা করা নিরর্থক এইগুলি বৈপ্লবিক চিন্তার মধ্যে প্রতিক্রিয়া সমূহের জন্ম দেয়। মার্কস্ 'দাস্ ক্যাপিট্যাল' গ্রন্থে দেখিয়েছেন মানুষ দশে মিলে ইতিহাসে যা সৃষ্টি করে এবং তুলে ধরে, বুর্জোয়া শাসক শ্রেণী নানা কাহিনীর আবরণে সেই ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি ম্লান করে দেবার চেষ্টা করেন, তাঁরা সবই ঈশ্বরেচ্ছা, প্রকৃতি প্রদত্ত ইত্যাদি বলে মানুষের নিকট ঘোষণা করতে থাকেন। এই অলৌকিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়াতে এইগুলি মানুষের এগিয়ে গিয়ে আইনসম্মত রূপে তার দাবি আদায় করার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অলৌকিক চিন্তাধারা সমাজের সৃষ্টি এবং ঐতিহাসিক ব্যুৎপত্তিগুলি আবরিত করে রাখে।

সুতরাং ওই কাহিনীগুলির ধ্বংস সাধন জরুরী রূপে দেখা দেয়। পুনরায় পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক্।

ডারউইনের মতে প্রাণশক্তির উৎপত্তির ইতিহাস পাওয়া যাবে না, সেক্ষেত্রে মনের উৎপত্তির সন্ধান করতে যাওয়াতো বৃথাই হবে।. মনস্তাত্ত্বিকদের নিকট মনই হল চেতনরূপ। মনের জানালা দিয়েই দেহ বাইরের বস্তু জগৎকে প্রত্যক্ষ করে, উপলব্ধি করে এবং প্রকাশ করে। হিন্দু দর্শনশাস্ত্রে 'কার্যকারণ' সম্পর্ক দেখান হয়, এই নিয়েই।

শোপেনহাওয়ার বলেন :

"বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা কার্যকারণ সম্বন্ধ নহে। বস্তুবাদ বিষয়কে বিষয়ীর কারণ বলিয়া গণ্য করে। ফিক্‌টের অধ্যাত্মবাদে বিষয় বিষয়ীর কার্যে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে প্রিন্সিপল্ অব্ সাফিসিয়েন্ট রিজন্-এর (পর্যাপ্ত কারণ তত্ত্বের), কোনও সম্বন্ধই নাই, এবং বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদের কোনওটিকেই সত্য বলিয়া প্রমাণ করা যায় না। বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে যে সম্পর্ক, তাহা অবিনাভাব সম্বন্ধ। পর্যাপ্ত কারণ তত্ত্ব বিষয়ের মধ্যেই অবস্থিত তাহাই বিষয়ের রূপ। বিষয়ী ইহার বাহিরে অবস্থিত। বিষয়ীতে এই তত্ত্বের প্রয়োগ হইতে পারে না। সুতরাং বিষয়ীকে বিষয়ের কারণ বলা যায় না, এবং বিষয়কেও বিষয়ীর কারণ বলা যায় না।"[৩]

তবে একথা ঠিক কার্য কারণ অনুযায়ী হয় এবং তার ফলপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। হিন্দুমতে সুকর্মের ফললাভ হয় মৃত্যুর পরে। কুকর্মেরও তাই। সেইজন্য হিন্দুমতে মরণের পরেও আত্মার বিনাশ নেই। কারণ আত্মা না থাকলে ফলভোগ করবে কে ? এই আত্মাই বলা হয় মৃত্যু অর্থাৎ জরাজীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করে নূতন আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পূর্বজন্মের কাজের ফলাফল অনুযায়ী তার পরজীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। সেই জন্যই দুষ্কৃতিকারীদের আত্মা সদ্‌গতি লাভ করে না এবং ভূত প্রেত ইত্যাদিতে পরিণত হবে বলে ধরা হয়। আর নানা প্রকার অলৌকিক ঘটনা যা নিয়মের রাজত্বেও ব্যতিক্রম ঘটাতে পারে বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে তাদেরও যথাসাধ্য নিয়মের মধ্যে বেঁধে রাখা হয়েছে।

এডওয়ার্ড বেনেক্ মনোবিজ্ঞানের উপর তাঁর তত্ত্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর মতে :

"আত্মাই (সোল্) একমাত্র বস্তু, যাহার স্বরূপ আমরা জানি। সুতরাং আমাদের আভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতা হইতেই যাবতীয় গবেষণার আরম্ভ হওয়া উচিত। যাহার জ্ঞান অব্যবহিত ভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কেবল তাহা হইতেই দর্শনের আরম্ভ

সম্ভবপর। এই অব্যবহিত জ্ঞান সংবিদ হইতেই আমরা প্রাপ্ত হই। সুতরাং এই সংবিদের পর্যবেক্ষণই দর্শনের ভিত্তি।"[৪]

কিন্তু কি বিজ্ঞান পদ্ধতি কি মনোবিদ্যা কোনটিই ইন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়াকলাপ দ্বারা বোধশক্তির পথ নির্ধারণে সম্যক ধারণা জন্মাতে অদ্যাবধি সক্ষম নয়। আলোক রশ্মি কোনও বস্তুতে পড়লে ব্যক্তি সেই বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয় মাত্র। কিন্তু বস্তুর অদৃশ্য অনেক পদার্থই ধারণার বাইরে পড়ে থাকে, ঠিক সেইরকমই মন ও প্রাণ এক বস্তু নয়। কিন্তু মনের ক্রিয়া প্রাণের ক্রিয়া ভিন্ন হলেও মনের ক্রিয়া প্রাণের ক্রিয়ারই সৃষ্টি। তবুও মনের ক্রিয়া প্রাণের ক্রিয়া থেকে উত্তীর্ণ হয়ে বহুদূরে চলে যায়। এক অর্থে বলা যায় যে মনের ক্রিয়া শুরু হয় প্রাণের ক্রিয়া থেকেই, কিন্তু তা প্রাণের ক্রিয়াকে পিছনে ফেলে অসীম শূন্য লোকে প্রধাবিত হয় এবং সেখানেই ব্যঞ্জনার লীলা। কারণ মানুষ সেখানে বিমলানন্দ লাভ করবার জন্য ব্যগ্র। সেখানে সৃষ্টিও তুঙ্গী হওয়া চাই। তবুও এই সৃষ্টি কখনোই সম্পূর্ণ আখ্যা পায় না।

তবে সম্পূর্ণ সৃষ্টি বিবেচিত না হলেও অনুমনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রায় সম্পূর্ণ বা প্যারা পারফেক্ট। বর্তমান বিজ্ঞানে প্রাণ হচ্ছে শক্তি, এটি প্রমাণ করেছে বানর। বিশুদ্ধ বিবেকের নিকটে এসেই লুপ্ত হতে হতে এনট্রপিক্ শক্তি শেষে পাত্রান্তরিত হতে থাকে মৃত্যুর মধ্যে। যেখানে এডিংটন বলেন, প্রতিকূল অবস্থাগুলির শেষ মৃত্যুর অবস্থা, যেখানে সত্তা, কালের কষ্ঠি পাথরে অন্য উপায়ে নিজেকে দেখতে অক্ষম।

"দি ফাইন্যাল্ অ্যাডায়াবেটিক স্টেট, ইজ্ নেসেসারিলী-এ স্টেট্ অব্ ডেথ, সো দ্যাট নো কন্শাসনেস্ উইল বি প্রেসেন্ট টু প্রভাইড দ্যান অলটারনেটিভ টু টাইম্'স অ্যারো।"

প্রাণকে (সোল্) বিশ্বের 'কমিক ড্যান্স'-এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে বলতে চেয়েছেন রুথ রেণা। অর্থাৎ অসংখ্য প্রাণের সমাবেশে বিশ্বের অবিরাম কৌতুককর চঞ্চলতারই ক্ষুদ্রাংশ হল প্রাণ। কেননা বিশ্বে পরমাণুই হচ্ছে প্রতিটি জীবের প্রাথমিক কোষ। পরমাণু বিভাজনীয় ও পরস্পর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াশীল।

বৈজ্ঞানিক নিউটন দেখিয়েছেন বস্তুর মধ্যে বস্তু ও শক্তি পৃথক রূপে ক্রিয়াশীল। কিন্তু এই দ্বৈত পদার্থের অস্তিত্ব বর্তমান আইনস্টাইনের মতবাদে অস্বীকৃত। এখানে বস্তু ও শক্তি একই। আইনস্টাইনের মতে বস্তুর মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি এবং এই প্রচণ্ড শক্তিই বস্তুকে ধরে রাখতে সক্ষম। (ম্যাটার রিপ্রেসেন্টস্ স্টোরস্ অব্ এনার্জি এ্যাণ্ড এনার্জি রিপ্রেসেন্টস্ ম্যাটার)। এইটিই আপেক্ষিক

তত্ত্বের মূল বিষয়। কখনও কখনও প্রোটন, নিউট্রন-এর শক্তির সমতা পরমাণুতে মেলে না। কোনও একটি শক্তির ঘাটতি বা বাড়তি অংশই বস্তুত পরমাণুকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ বা শৃংখল মুক্ত করে তোলে। আপেক্ষিক তত্ত্বানুসারেই আমরা বুঝি প্রয়োজনীয় কণা সমূহ একত্র সন্নিবদ্ধ থাকে এবং একটি সর্বজনীন সার বস্তু বুঝাতে বিভিন্ন ঘটনা ও আকৃতির মধ্যে বস্তুসমূহ যেরূপ প্রকাশিত হয় তাই বুঝায় তবে মন প্রাণ ও জন্ম মৃত্যুর সঙ্গে শিল্পীর কোনও নিকট সম্বন্ধ নেই। বরং নন্দনতত্ত্বটির সম্যক বিকাশ ও উপলব্ধির সঙ্গেই শিল্পী ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দৈনন্দিন জীবনে বস্তুর স্বাতন্ত্র্য সর্বদা আমাদের এড়িয়ে ছুটে চলে, আমরা শুধু পড়ে থাকা বিষয়বস্তুকেই উপলব্ধি করি। শক্তির এই গতিশীলতার তত্ত্ব ও বাঁচবার এই রীতি মানুষের নিকট খুবই পরিচিত অবস্থা, তার পরিচয় মানুষের সৃষ্ট কর্মে, সাহিত্যে ও শিল্পসাধনায়।

বিজ্ঞানী বি এস হ্যালডেন বলেছেন জীবনের উদ্দেশ্য হল উচ্চ থেকে উচ্চস্তরে পৌঁছান। ক্রমেই এই শক্তির বেগ বাড়তে থাকবে, অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষমতাও। প্রাণ প্রথমে সুপ্তির বন্ধনে অচেতন থাকলেও ক্রমশ নিজেকে মুক্ত করে চৈতন্য লাভের স্তরে পৌঁছায়। আত্মাকে শক্তির আধাররূপে কল্পনা করে জন্মান্তরে বিশ্বাস করা যেমন হিন্দুদের আদিকাল হতেই একটা প্রবণতা তেমনই বর্তমানে বিজ্ঞানের আওতায় এসে একশ্রেণীর মানুষ চিন্তা করে মৃত্যুই শেষ, মৃত্যুর পরে আর কিছু নেই। মানুষের ক্রিয়া কলাপের যেটুকু অস্তিত্ব তা ইতিহাসের বর্ণনায় পর্যবসিত হয়, মৃত্যুই জীবনের অস্তিত্বের শেষ। এই ধারণা বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ছিল ও বর্তমানে আচরণবাদী মনস্তাত্ত্বিকদের ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'হ্যালডেন'-এর মত, 'এইডেগার'ও বলেন, মৃত্যু হচ্ছে উত্তরাধিকারী, জীবনের সূত্রে বেঁচে থাকে মৃত্যু, অন্তহীন ভবিষ্যতের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে এবং নিশ্চিত রূপে মানুষের অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়[৫]। অর্থাৎ মানুষের অস্তিত্ব নির্ধারিত হয় তার কাজের মধ্য দিয়ে। একথা বিশ্বাস করা হয় যে প্রত্যেক মানুষ তার একটি জন্মে সব কাজ শেষ করতে পারে না। তাই তার পুনর্জন্ম হয় এবং তাকে ঘুরে আসতে হয় পৃথিবীতে। তার কাজকে সমাপ্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এইভাবে তার কাজ যেদিন শেষ হবে তার আর জন্ম হবে না। অর্থাৎ সেবারই তার মৃত্যু ঘটল। তাই বলা হয় যে মহাপুরুষেরা দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ করেন না। তাই বলা হয় যে, প্রকৃত মৃত্যুর ঘটনা ঘটে অনেক কাল পরে যা কোনও নির্দিষ্ট জীবনের উপরই ছায়াপাত করে না।

কিন্তু জিন পলের (জিন পল সারত্রে) উক্তিতে, এর দ্বারা মানুষের সম্ভাবনা সমূহের নাশ ঘটানো হয় এবং মানুষের অস্তিত্বকে ধ্বংস করা হয়। জীবনের কোনও বাস্তব অর্থ প্রকাশ ত দূরে থাক্ মৃত্যু স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে জীবন সামগ্রিক রূপে অর্থ শূন্য। আমাদের বাঁচা বা মরার কোনও কারণ নেই।[৬]

শুধুমাত্র অর্থ তখনই সম্ভব তা হল কোনও কর্মের মাধ্যমে জীবিত মানুষের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করা। গীতায় যাকে বলা হয় কর্মযোগ। কিন্তু সকল কর্মই যোগসূত্র রচনা করে না। প্রয়োজনের সঙ্গে যে কর্ম সংযুক্ত থাকে সেই কর্ম কিন্তু পুনরায় আমাদের আবদ্ধ করে, কিন্তু উদ্দেশ্যবিহীন যে কর্ম, আনন্দের উৎস থেকে যে কর্মের জন্ম সেই কর্ম কিন্তু আমাদের পার্থিব জগতের সঙ্গে বেঁধে রাখে না, উপরন্তু মুক্তিদান করে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক কর্মই আমাদের আনন্দ দান করে না, অথচ প্রকাবান্তরে আনন্দের ধর্মই কিন্তু কর্ম। সেই কর্মের মাধ্যমেই আমরা ব্রহ্মানন্দ লাভ করে থাকি।

রবীন্দ্রনাথ সেই কথাই বলেছেন :

"আনন্দের স্বভাবই হচ্ছে ক্রিয়া—আনন্দ স্বতই নিজেকে বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে মুক্তি দান করতে থাকে।"[৭]

আমরা দেখেছি চতুঃষষ্ঠি শৈল্পিক প্রকাশের মধ্যে সংগীত শিল্পই হল শ্রেষ্ঠতম। যা যুগ যুগ ধরে মানুষের সঙ্গে মানুষকে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে ফেলে। এর প্রধানতম কারণই হল মানুষের মনের সঙ্গে সংগীত পলকের মধ্যে যুক্ত হয়ে যায় এবং সংগীতের সঙ্গেই অজান্তে মানুষের মনও মহাকালের গতির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে। কাজেই অস্তিত্ববাদীদের সারত্রের ভাষায় (অন্তত সম্পূর্ণ না হলেও) স্বীকার করে নিতে হচ্ছেই, সংগীত ভাব প্রকাশ করে এবং ভাবকে জাগিয়ে তোলে (মিউজিক এক্সপ্রেসেস ইমোশন এ্যান্ড ইভোকস্ ইট) উপরন্তু সংগীত কালের ভাবধারা জাগিয়ে তোলে (এক্সপ্রেসেস দি ইমোশন অফ্ এ্যান এজ্) সংগীত দলিতদের বেদনা ক্রোধায়িত করে প্রকাশ করে, ভবিষ্যৎ সুরাহার প্রত্যাশা নিয়ে (এক্সপ্রেসড্ দি রেজ অফ্ দি একস্‌প্রেসড্ এ্যান্ড এটস্ হোপ ফর দি ফিউচার) সারত্রেকেও এসবই স্বীকার করতে হয় যে কল্পনা এবং মায়াজাল হচ্ছে স্বাধীন ক্রিয়ার ফলশ্রুতি (ফ্রি এ্যাক্ট)। সারত্রের নিকট অস্তিত্ব (এক্সিসট্যান্স) হচ্ছে মানুষের ইতিহাসের ধারাবাহিক পদ্ধতি (কনটিনিউইটি অফ্ দি হিস্টরি অফ্ ম্যানকাইন্ড) যে ইতিহাস মরণের পরেও প্রসারিত। আত্মা অবিনশ্বর সুতরাং অবিনশ্বর আত্মা জীবিত বা মৃতাবস্থায় ইথার সমুদ্রে যে

আবেগসমূহ সঞ্চারিত করতে সক্ষম, সেগুলি গ্রহণযোগ্যও হয়ে উঠতে পারে কোনও অতীন্দ্রিয় চিত্ত মানসপটে, ঘুমে জাগরণে বা অচৈতন্য অবস্থায়। প্রশ্ন হচ্ছে সব আত্মাই কি অতীন্দ্রিয় ক্রিয়া কলাপ বিস্তারে ক্রিয়াশীল ? ডঃ রেণার মতে যে আত্মকণাগুলি অস্থির বা ধুলোর মত বহুধা বিচ্ছিন্ন (ফ্র্যাগ্‌মেন্টেড্) যেগুলির কোনও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নেই সেগুলোই বিক্ষিপ্তাকারে অপূর্ব ইন্দ্রিয়ানুভূতি সমূহ সৃষ্টি করে তোলে।

আইনস্টাইন রবীন্দ্রনাথ প্রমুখদের আত্মার কি পুনর্জন্ম ঘটতে পারে ? যে সার্থক প্রচেষ্টা ওই মণীষীদের জীবনে সাধনার মার্গে ঘটে উঠেছিল, তার পরিসমাপ্তি ঘটলে অথবা সেই প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য মহাকালের নিজের প্রচেষ্টা না থাকলে আর ওইসব মহাপ্রাণদের পুনর্জন্ম আশা করতে পারা যায় না।

ই = এম. সি^{2} তত্ত্বটি বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের। বর্তমান কালের সব তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা এর উপরই। সম্ভবত এটির আর পরিবর্তন সাধন করার প্রয়োজন দেখা দেয়নি। কাজেই আইনস্টাইনকে আর প্রয়োজন নেই কারণ জীবজগতে সর্বত্রই তো আইনস্টাইনের জয়জয়কার। আইনস্টাইন তাই মুক্ত মহামানব।

তদ্রূপ রবীন্দ্রনাথের বিষয়েও চিন্তা করা যেতে পারে যিনি নিজ আত্মাকে বিশ্বের আত্মার সঙ্গে পরিচিত করে তুলেছিলেন, এবং শিল্প সাধনার মধ্য দিয়ে দীর্ঘ জীবনে একই সত্তার বহু প্রকাশ উপলব্ধি করেই চির অগ্রসর ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর ধর্মবোধটি মহান বুদ্ধের ধর্মমতের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। যে ধর্মমতে দেখান হয়েছে নির্বাণ লাভ করতে হলে দুঃখকে জয় করতে হবে, জীবে প্রেম চাই, অহিংসায় ব্রতী হওয়া চাই, তবেই নির্বাণ লাভ করে মানুষের আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়।

রবীন্দ্র সৃজনী প্রতিভার মধ্যে যদি নব উদ্‌ভাবনী শক্তি অলৌকিক বেদনার ভারে পুনরুন্মীলিতই দেখা যায় তবেই রবীন্দ্র সৃজনী আত্মার নিশ্চয়ই ভিন্ন জন্ম প্রত্যাশা করা যেতে পারে। অন্যথায় রবীন্দ্রনাথকে কালজয়ী শিল্পীরূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। মৃত্যুর মধ্যেই যে মৃত্যুহীন প্রাণ বর্তমান সেটি কবি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সৌন্দর্যতত্ত্বের উপাসনায় শিল্প সৃষ্টির মাধ্যমে। তিনি নিজে আপনার মধ্যে কতবার আনন্দিত হয়েছেন, প্রাণ ফিরে পেয়ে ফিরে ফিরে সেই অমৃতালোকের আনন্দে নিজে উদ্‌ভাসিত হয়ে তৃপ্ত ছিলেন, তাতে সংগত কারণেই বলা যেতে পারে রাবীন্দ্রীকি আত্মশক্তি উত্তরাধিকার সূত্রে আইনস্টাইনের

আত্মার মতই স্বীয় সমাজের মধ্যেই কালজয়ী হয়ে থাকতে বাধ্য।

যেমন :

> ইচ্ছা করে, বারবার মিটাইতে সাধ,
> পান করি বিশ্বের সকল পাত্র হতে
> আনন্দ মদিরা ধারা নব নবস্রোতে ॥[৮]

পুনরায় :

আর একটি কবিতায় :

> "আমার পৃথিবী তুমি
> বহু বরষের ; তোমার মৃত্তিকাসনে
> আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
> অশ্রান্ত চরণে, করিয়াছ প্রদক্ষিণ
> সবিতৃমণ্ডল অসংখ্য রজনীদিন
> যুগযুগান্তর ধরি, আমার মাঝারে
> উঠিয়াছে তৃণ তব পুষ্প ভারে ভারে
> ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
> পত্রফুল ফল গন্ধরেণু ॥"[৯]

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা অনেক সময় অলৌকিক রাজ্যে বিচরণ করেছে। এই বিশ্লেষণ শুধু কাব্যকাহিনীতেই স্ফূর্ত দেখা যায়নি, তাঁর চিত্রকলাতেও অনেক ক্ষেত্রে অবাস্তব অদ্ভুত দর্শন অনুচিত্র কলা পদ্ধতির স্থান দেখান যেতে পাবে, যেখানে সূক্ষ্ম মন অতীন্দ্রিয় কল্পনা লোকে বিরাজ করেছে। এই সব অলৌকিক অস্বাভাবিক ছবির কল্পনা জীবজন্তু নরদেহ আশ্রয়ী হয়ে অকৃত্রিমরূপে চিন্তারাজ্যে সাড়া জাগিয়েছে। যেমন 'এ কি চেহারা তোমার'—'সে' ইত্যাদি চিত্রগুলি। মৃত্যুর পর অশরীরী প্রাণ যে বস্তু আকারে ইথার সমুদ্রে ভাসমান থাকতে পারে এসব ভুতুড়ে ছবি যেন সেগুলোরই কোনও কাল্পনিক অবয়ব নিয়ে দাঁড়িয়ে। এই আপাত ভৌতিক স্তরে রবীন্দ্রনাথ বিষয় জগতে অবস্থান করেই কীভাবে বিচরণ করেছেন, কীভাবে অবচেতন মনে মহৎ শিল্পের আবর্তন ঘটিয়েছেন সেগুলি অনুমনস্তাত্ত্বিকদের নিকট যথেষ্ট গবেষণার বস্তু হতে সক্ষম। রবীন্দ্রমানসে ওই ক্রিয়াকলাপগুলি কোনও ভৌতিক কাণ্ডরূপে এসে যায়নি, কারণ কবি নিজেই বলেছেন মহান শিল্প অবচেতন মনের সৃষ্টি (গ্রেট আর্ট ইজ্ এ্যান আনকনসাস

ক্রিয়েশন) বিস্মিত হতে হয় যে রবীন্দ্রনাথ পরলোকগত আত্মার সন্ধানের জন্য 'মিডিয়ামে'র সহযোগে তথ্যাদি অনুসন্ধান করেছেন। বস্তুত রবীন্দ্রমানসে অনুরূপ চিন্তাধারা এসেছে ইন্দ্রিয়ানুভূতিব আরো গভীর স্তর হতে, মনোরাজ্যের আরও অন্তঃস্থল হতে যেখানে পৌঁছাতে হলে যোগ সাধনা চাই, মনঃসংযোগ চাই তবেই ওই বাহ্যিক ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুগুলির সম্বন্ধে ধারণা জন্মায়।

ঋষি অরবিন্দের সাধনাতেও আমরা দেখি, "আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হও, বিশ্বতত্ত্ব বুঝতে পারো, মানসের অতীত বিশ্বাতীতকে জানবে।" কুণ্ডলিনীর সেই জাগরণ মনকে প্রবুদ্ধ করবে, সম্বৃদ্ধ করবে, বিশ্বকে সংযুক্ত করবে। বলেছেন শিবই শুধু জীব হয়ে অবতরণ করেন না, জীবও শিব হয়ে উত্তরণ করে আবার নামেন। এই ট্রিপল্ ডিসেন্টই শেষ কথা। ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা।

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মতামতে প্রকাশ করেছেন সেই অতিমানবেব বিশ্বধারা যা "শুধু বাইরের নয় ভিতরের ঊর্ধ্বতম মানসের ভাস্বর মানসের অধিমানসের অতি মানসের। জীবের কাছে বিশ্ব ধরা দিয়েছে প্রাণরূপে।.প্রাণশক্তির তরঙ্গ বিচ্ছুরণ সে বিচ্ছুরণে এক রহস্যের প্রকাশ। লেখক জানিয়েছেন শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' বুঝতে হলে সে রাজ্যে পৌঁছাতে হয় যে ছবি আঁকা হচ্ছে তার সঙ্গে একাত্ম হতে হয়।"[১০]

লেখকের উদ্ধৃতি হতে কয়েকটি লাইন দেওয়া গেল—"দি সোল রেকগ্নাইজড্ দি আনসারিং সোল অর্ বিউটি শ্যাল ওয়াক সেলেশ্শিয়াল অন্ আর্থ" ইত্যাদি।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁর 'রাগ ও রূপ' গ্রন্থের উত্তর ভাগে পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানীদের মনের ধারণার সঙ্গে প্রাচ্যের ধারণার আলোচনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন পাশ্চাত্যে মনোবিজ্ঞানীরা মনকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করেন। চেতন (কনশাস), অবচেতন (সাব কনশাস্) ও পরা চেতন (সুপার কনশাস্)।

অসংখ্য জন্মের পুঞ্জীভূত সংস্কাররাজি অবচেতন মনের গণনাতীত স্তরে লুকানো থাকে। মনের এই স্তর তাই অতলস্পর্শ।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের মতে তন্ত্রের কামকলা বা কুণ্ডলিনী এই অবচেতন মনেই প্রতিষ্ঠিত। মানুষের মূলাধার চক্রের অভ্যন্তরে কুণ্ডলিনী কারণ অজ্ঞানের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকলে সর্বদা জ্ঞান প্রদীপ্তা ও জ্যোতির্ময়ী। বেদান্তে এই কুণ্ডলিনীই মহামায়া, সদগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বর। ব্রহ্মগ্রন্থিরূপে অবচেতন মনে মহাপ্রাণ বা জীবনীশক্তি প্রসুপ্ত থাকে।

অনুমনস্তাত্ত্বিকদের এই সব চিন্তাধারার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হলে যে

পথটি গ্রহণ করতে হয় তার নির্দেশও হিন্দু শাস্ত্রেই পাওয়া যায়। যেমন স্বামী বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন শম ও দমের শক্তি কত প্রয়োজনীয়। রামপ্রসাদও কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে ব্যাখ্যা করেছেন,

কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী, তারা তুমি,
আছ গো অন্তরে। মা আছ গো অন্তরে ॥
একস্থান মূলাধার, আর স্থান সহস্রার
আর স্থান চিন্তামণিপুরে।
শিবশক্তি সব্যবামে, জাহ্নবী যমুনা নামে
সরস্বতী মধ্যে শোভা ক'রে।
ভুজঙ্গরূপা লোহিতা স্বয়ম্ভূতে সুনিদ্রিতা,
এই ধ্যান করে ধন্য নরে।
মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর নাভিস্থান,
অনাদৃত বিশুদ্ধাধ্য বরে ॥
বর্ণরূপা তুমি বট
ধ, স, চ, ল, ড, ক, যা, ই,
ষোল স্বর, কণ্ঠায় বিহরে।
হ, ছ, আশ্রয় ভুরু,
নিতান্ত কহিলা গুরু
চিন্তা এই শরীর ভিতরে ॥
ব্রহ্মা আদি পাঁচ ব্যক্তি,
ভাবিন্যাদি ছয় শক্তি
ক্রমে বাস পদ্মের উপরে।
গজেন্দ্র মকর আর
মেষবর কৃষ্ণসার,
আরোহণ দ্বিতীয় কুঞ্জরে ॥
অজনা হইলে বোধ
তবে জন্মে তব বোধ,
গুঞ্জোমত্ত মধুব্রত স্বরে ॥[১]

বিজ্ঞানীদের সাধনায় আজ জাগতিক ক্রিয়াকলাপগুলির সমস্ত কিছুতেই বস্তুই শক্তি এই তত্ত্বই সত্যরূপে প্রতিভাত, উপনিষদেও সেই শক্তিকে 'অন্ন'স্বরূপ

চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রশ্নোপনিষদে বলা হয়েছে প্রাণ হচ্ছে সূর্য, আর স্থূল, সূক্ষ্ম যা কিছু সবই অন্ন হেতু সম্ভব হয়েছে। মুণ্ডকোপনিষদে দেখান হয়েছে আরও স্পষ্টরূপে পুরুষ হতে প্রাণের জন্ম, মনের জন্ম পঞ্চভূত হতে। সূর্য সৃষ্টির কারক। দেহ সূর্যের কল্যাণেই দেহস্থিত প্রাণের স্তরটি পঞ্চভূতের স্তর সমন্বয়েই গঠিত, অন্তঃস্তরে রয়েছে আত্মার অবস্থিতি।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে রয়েছে, আকাশ হতে বায়, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল, জল থেকে পৃথিবী, পৃথিবী থেকে ওষধি সমূহ, ওষধি থেকে অন্ন, অন্ন থেকে পুরুষ (মানুষ) উৎপন্ন হয়েছে।

এই তৈত্তিরীয় উপনিষদেই সৃষ্টিলোকের যে চিত্র পাওয়া যায়, সেটি মস্তিষ্কের একটি বিশেষ অংশকেই পরিচিত করায়। অর্থাৎ মস্তিষ্কই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। আমরা কল্পনা করে নিয়েছি বুদ্ধির স্থানও মস্তিষ্কে। মানুষ কেবলমাত্র আপন সৃষ্ট কর্মের মাধ্যমেই অতীন্দ্রিয় লোকের পরশ পায়। আপন সৃষ্টির ক্ষেত্রেও প্রধান ভূমিকা হল বুদ্ধির। বুদ্ধি এবং সাধনার দ্বারা মানুষ নিজের জগতকে অতিক্রম করে সেই শিল্পলোকে পৌঁছাতে সক্ষম হয় যার নাম নন্দনলোক।

সাধনার উদ্দেশ্য মানুষের সেই নন্দন লোকে পৌঁছান যেখানে পৌঁছালে আত্মতৃপ্তি তো বটেই, জগতকেও বোধহয় তৃপ্ত করা সম্ভব।

ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার এ বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। কঠোপনিষদে প্রাণকে সমস্ত গতি শক্তির (জগৎ সর্বং প্রাণ) আধার স্বরূপ বলা হয়েছে অর্থাৎ এখানে বস্তুই শক্তি, সে বস্তু হতে পারে চেতন অথবা জড়। যেখানেই গতিশীলতা, জীবনের স্পন্দন সেখানেই। তৈত্তিরীয় উপনিষদে রয়েছে,

প্রাণোহি ভূতানামায়ুঃ।
তস্মাৎ সর্বায়ুষমুচ্যতে ।

প্রাণীদের আয়ু হচ্ছে প্রাণ, বিশ্বের জীবন সর্বায়ু। এই সর্বায়ুই মহাকাল ছাড়া আর কি? যার অস্তিত্ব ধারণ করবার চেষ্টা হয় মনের ক্রিয়ার উপর।

মহাপ্রাণই অমৃত বাণী বহনক্ষম। মহাজাগতিক শক্তিই প্রকৃষ্ট রূপাদর্শ গড়ে তোলে। জলীয়ান হাকসলীল্ড্ স্বীকার করেন প্রাণ পূর্বেকার কোনও প্রাণধারা বেয়েই নেমে আসে, প্রাণ কোনও রাসায়নিক ক্রিয়া পদ্ধতির সৃষ্টি নয়।

রুথ রেণা প্রশ্ন তুলেছেন মৃত্যুর পর আত্মার যদি দেহ থেকে প্রস্থান ঘটেই তবে কীভাবে পূর্ব প্রকৃতি সমূহ দ্বারা অন্বিত হয়ে সেই আত্মাকে পুনরায় জীবদেহে

সন্নিবেশিত করা যেতে পারে ? কেননা পূর্বজন্মের মতবাদ অপ্রমাণিত সত্যরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। অসংখ্য জীবের নাশ ঘটছে অহরহ,সেই অনুপাতে প্রতিনিয়ত জন্মলাভও ঘটছে। এক্ষেত্রে কর্মের শেষ হতে যাদের বাকী তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে জীবদেহে দ্রুত নেমে দাঁড়ানই স্বাভাবিক। অর্থাৎ অপরিপক্ক গুণী, অপূর্ণ শিল্পী তাঁর সাধনা সম্যকরূপে সিদ্ধ করতে নিশ্চয়ই পূর্বেকার অর্জিত গুণাবলীর উত্তরাধিকার নিয়ে জন্মলাভ করবেন। কিন্তু যিনি সার্থক যিনি লোকসমূহের ঊর্ধ্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সত্যকে জেনেছেন যাঁর পথাবলম্বন করে মানুষ আজ সত্যানুসন্ধানী তাঁর ক্ষেত্রে কালের সীমা পার হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। কারণ মানবজাতি পৃথিবীতে হঠাৎ নেমে দাঁড়ায়নি বিবর্তনের মাধ্যমে অন্ত্যজ প্রাণী হতে শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানবরূপে জন্মাতেও কোনও বিশেষ প্রাণের সাধনা করতে হয়েছে। একথা উপনিষদেও বলা হয়েছে। উপনিষদে প্রাণীদের অন্ত্যজ, উদ্ভিজ, জীবজ তিন ভাগে দেখান হয়েছে। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাণী হিসাবে জীবজ মানুষেরই মুক্তি পর্যায়ে উঠবার পথ খোলা রয়েছে এবং সেটি সুকর্মের মধ্য দিয়েই সম্ভব। মতটি অন্যভাবেও বিশ্লেষণ করা যায়।কর্মোদ্দেশ্যে প্রাপ্তশক্তির ক্রমক্ষীয়মানতা দেখা দেয়। থারমোডাইনামিক সাম্যতার নিয়মানুসারেই বস্তুর শক্তি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয় সেখানে প্রাণ থাকে সুপ্তাবস্থায়। বস্তুই শক্তি। এই মহাজাগতিক শক্তির প্রভাবে দেখানো যেতে পারে, যে শক্তি ক্ষীয়মান হতে হতে স্থির বস্তুতে পরিণত হয়, সেই ক্ষীয়মান শক্তিই আদি পরমাণু সমন্বিত বস্তুটিকে সংবদ্ধ রাখতে সমর্থ। পরমাণুগুলি আঠার মত তরল পদার্থের দ্বারা জালে জড়িয়ে থাকে।

ডঃ রেণা বলতে চান, জীবনের বৈশিষ্ট্য ওমিয়ন নামক পদার্থের দ্বারা কোষের মধ্যে সংবদ্ধ থাকে কিন্তু এক্সট্রা সেনসারি পারসেপস্ (ই এস পি) বলতে যে বাড়তি ইন্দ্রিয় বোধটি বুঝায় সেটুকুর ব্যাখ্যা সাধারণ বুদ্ধি এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে করা সম্ভব নয়। কারণ পরমাণুর গঠনক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে বুঝতে হবে। মেসন-এর বিকল্পে এক্ষেত্রে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে যে নামটি গ্রহণযোগ্য তা হল রস। সাধারণত মানুষের স্বপ্নসমূহের নানা প্রকার ব্যাখ্যা করা হয় এবং অনেক সময় ব্যাখ্যাগুলি সঠিক হয়, তেমনই বহু পুরাতন জটিল মানসিক ব্যাধি সমূহের প্রতিকারের নিমিত্তও রোগীকে সম্মোহিত করে প্রশ্নাদি সহযোগে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কি হতে পারে বা কি না হবে তা বুঝবার পদ্ধতি এখনও আবিষ্কৃত হয়নি।

প্যারা এলার্জির উদাহরণ হল আত্মা যখন কোনও মিডিয়াম-এর উপর ভর

করে প্রশ্নোত্তরে রত থাকে তখন সব কথার জবাবই আসে না। অনেক সময়ই শোনা যায়, আত্মা নিজের অসুবিধা জানাচ্ছে, কষ্ট অনুভব করছে, পরিবেশ পছন্দ হচ্ছে না ইত্যাদি। এই সমস্ত আলোচনা কিন্তু অনেক সময়ে মূল প্রশ্নের ধার ছুঁতেও সক্ষম হয় না। পৃথিবীর আলো জল হাওয়া যাঁরা অকুণ্ঠভাবে ভালবেসে থাকেন, মৃত্যুর শেষে তাঁদের আত্মা সাংখ্যদর্শনের ভাষায় অব্যক্তরূপে, অলৌকিক বেদনার ভারে ইথার সমুদ্রে ঘুরে বেড়াবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই অব্যক্ত আত্মা দেহধারণ করতে সক্ষম এরকম প্রাণ খুঁজে পাবে। কিন্তু এবিষয়েও কোনও সঠিক প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। মানুষের দ্বারা যদি পূর্বজন্ম স্মরণ করান যায়, বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে ভবিষ্যতে যদি পূর্বজন্ম স্মরণ করে তোলাই যায় তবে দুই জন্মের মধ্যে যখন তার অস্তিত্ব বর্তমান ছিল তখন সেই আত্মার কেমন অবস্থা ছিল ইত্যাদি আবিষ্কারের পথ আপনা থেকেই প্রস্তুত হবার সম্ভাবনা যথেষ্ট পরিমাণে থেকে যাবে। অনুমনস্তাত্ত্বিকদের মতে পরমাণুকোষ যেখানে খুব সুস্থির নয়, এনট্রপির নিয়মানুসারে ক্রমে স্থির হয়ে আসেনি সেগুলির দ্রুত প্রত্যাবর্তন ঘটে জগতে।

ওমিয়ন সম্পর্কে ডঃ ই এস রাজাগোপাল ডঃ রেণার বইটির ভূমিকাতে জানিয়েছেন ডঃ রেণার কল্পিত ওমিয়নগুলি বিজ্ঞানীদের পরমাণুর মেসন হতে ভিন্ন শ্রেণীর হবে যদি ওমিয়নের ভূমিকা জীবকোষের সংবৃত্তির অবস্থা বোঝাতে হয়।

চার্লস ডারউইন, জীবন সম্পর্কে বলতে চেয়েছেন জৈব এবং অজৈব স্তরের মধ্যে কোনও ফাঁক বা বিচ্যুতি নেই তেমনই মনের কোনও পৃথক সত্তা জৈবিক এবং দৈহিক অবস্থানগুলির বাইরে স্বীকার করা যায় না।

অনুমনস্তত্ত্বে আত্মার একটি নিজস্ব পরিচয় আছে, এবং ইচ্ছাশক্তির বিশেষ ভূমিকা আছে। ফলে দুইই অতি স্বাভাবিক স্তরে গণ্য করা হয়। যাকে অনুমনস্তত্ত্বে বলা হয় প্যারানর্মাল। পূর্বজ্ঞান (প্রিকগনিশন), প্রতিভা (ক্লেয়ারভয়েন্স), গতিময়তা (টেলিকাইনেসিস), চিন্তার দ্বারা প্রভাব বিস্তার (টেলিপ্যাথি) প্রভৃতি প্রক্রিয়াসমূহ মনস্তাত্ত্বিকদের মতে মিডিয়ামের সহায়তা আসে।

এক্সিসটেনসিয়ালিস্টরা বলেন, বিভিন্নাবস্থার বিশ্লেষণে এবং সীমায়িত জ্ঞানের জন্য মানুষ তার অক্ষমতা প্রকাশ করবেই। ফলে আসে হতাশা। মানুষের হতাশা যখন মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত রূপে ছড়িয়ে পড়ে তখনই মৃত্যু চিন্তা আসে। তবে মৃত্যুদ্বারা কোনও স্পষ্ট ধারণায় আসতে পারে না মানুষ, যদিও অসম্ভব

ঘটনাবলীর মধ্যেও অনেক যুক্তি আড়ালে থেকে যায় যা চিরাচরিত ধারণার বাইরে। অতিপ্রাকৃত ঘটনা ঘটলে তার মধ্যেও থেকে যায় অস্বাভাবিক ঘটনাবলীর স্বয়ংক্রিয়া এবং মানসিক কারণেই সেগুলি ঘটে। এক্সট্রা সেনসরি পারসেপসন বা এক্সট্রা সেরিব্রাল পারসেপসন-এর দ্বারা সেই ক্রিয়াগুলি বোঝা যায়।

চেতন যে শক্তি অর্জন করে সেটি হচ্ছে রিফ্লেকশন্। বাহ্যিক জগতে সেই ভাবমূর্তি প্রতিফলিত হয়। প্লেটোর জিজ্ঞাস্য প্রথমে কি জন্ম নেয় দেহ না আত্মা? উত্তর হল আত্মা, কিন্তু এ্যরিস্টটল বললেন না। এরিস্টটলের মতে আত্মা দেহ থেকে পৃথক করা যায় না। কোনও একটি বিশেষ দ্বৈতভাব রয়েছে যা কিনা স্বাভাবিক আর অনুস্বাভাবিক ভাব হতে পৃথক করে বোঝা যেতে পারে। এই মতবাদ গার্ডনার মারফির দ্বৈত মতবাদ অনুসারে স্বীকৃত। একধরনের প্রাথমিক দ্বন্দ্ব। স্বাভাবিক এবং অনুস্বাভাবিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে কিছু বাস্তব পার্থক্য। "সাম কাইন্ড অব্ ফান্ডামেন্টাল ডুয়্যালিজম, সাম বেসিক্ ডিফারেন্স বিটউইন নর্মাল এ্যান্ড প্যারানর্মাল প্রসেস।"

সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে, ভ্রূণে নাকি ব্যক্তির ছাপ বা পারসোনালিটি ফিরে আসে। এর সদুত্তর আজও মেলেনি। ব্যক্তিসত্তা অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। আত্মার ব্যক্তিসত্তার জন্ম পিতামাতার ব্যক্তিত্বের যেখানে বিকাশ সেখানেই। জগতের প্রত্যেক সত্তায় স্থায়ী সূক্ষ্মাত্মার মধ্যে জাগতিকভাবে অর্জিত সকল বস্তুরই অবস্থান। মৃতের আত্মার মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি জীবিতের মতই যেমন হ্যালুসিনেসন্ তেমনই স্পিরিট পসেসন্ প্রভৃতির মধ্য দিয়েই এইগুলি উপলব্ধি করা যায়। রেণা সঙ্গত কারণেই এক আত্মার প্রতি অন্য আত্মার বলপ্রয়োগের দ্বারা অন্তর্ভুক্তির (স্পিরিট ইনভেসন্) স্বীকার করেননি। কোনও বিশেষ প্রতিভা যেমন বহু ভাষায় বলার ক্ষমতা, বাদ্য যন্ত্রে দক্ষতা, কঠিন নৃত্যে পারদর্শিতা, পূর্বস্মৃতি স্মরণ করা প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি ইয়ান স্টিভেনসন্ যেভাবে ইন্দ্রিয়ানুভূতির ব্যাপার মনে করেন, তিনিও সেই মত সমর্থন করেন।

আত্মার আগমন নির্গমণ তত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে সময় বা কালের প্রশ্নও জড়িত। সময় বা কালের সম্পর্কে প্লেটো বলতেন, টাইম ইজ কনটিনাম। কান্টের ধারণায়, সময় শেষ হয় লোকের জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই। প্রাণীর অস্তিত্ব ব্যতিরেকে সময়ের কোনও স্বাধীন সত্তা নেই। কালের স্বরূপ বর্ণনায় পরিবর্তন, সময়, বিবর্তন, অবস্থান, গতি প্রভৃতি বহু শব্দের ব্যবহার করা হয়।

এ্যারিস্টটল বলতেন সময় গতিশীল নয় কিন্তু একটি সংখ্যা মাত্র এবং গতিরই

স্তর বিশেষ।[১২] অন্য ক্ষেত্রে প্লটিনাস্ বলেছেন আত্মাই গতির ধর্ম। আত্মা সর্বজনীন আত্মার দিকে ধাবিত হয়ে কালের উৎপত্তি ঘটায় যা কিনা অনন্ত এবং আত্মার প্রকৃত জয়যাত্রা নির্দেশ করে সময়। আগাস্টাইনও বিশ্বাস করতেন সৃষ্টির মুহূর্ত হতে কালের (টাইম্) আরম্ভ।

বর্তমান যুগে ডোরা মার্সডেন বলেন কালই গতি হতে পারে, তবে গতি কাল নয়। যখন গতিকে নিরূপণ করা যায় কোন মানদণ্ডে তখন কালের পরিচয় মানা হয়, সুতরাং কাল হচ্ছে পরিমাপিত গতি 'টাইম ইজ মেজার্ড মোশন্, কিন্তু হেনরি বার্গসন কাল সম্পর্কে বলেননি, তিনি তুলেছেন স্থায়িত্বকালটির কথা। যা মনের নিকট অনাদি এবং সেইজন্যই বিভাজিত করে দেখান যায় না। স্থায়িত্বকালটি গুণ বাচক। স্থায়িত্বকাল ও পরিবর্তন পৃথকরূপে দেখান যায় না। এ দুটি পর্যায়ক্রমে এসে যায় যে ক্ষেত্রে বিভিন্ন মুহূর্তগুলি স্মৃতির দ্বারা গ্রথিত এবং একই সূত্রে ধারাবাহিকভাবে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-এর দ্যোতক (ডিফারেন্ট মোমেন্টস আর বাউণ্ড টুগেদার বাই মিনিং ইজ্ এ কন্টিনিউয়াস অর্ডার অফ্ পাস্ট, প্রেজেন্ট এ্যাণ্ড ফিউচার)।

এরিক ফ্রাঙ্ক একটি নিবন্ধে জানিয়েছেন যে প্লেটো, এ্যারিস্টটল বিশ্বাস করতেন শিল্প ও বিজ্ঞানের অনেক কথাই পূর্বে কথিত ও আলোচিত হয়েছে এবং পরে আবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, পুনরালোচিত হবার জন্যই। ফ্রাঙ্ক এই যুক্তির উপর নির্ভর করেই লিখেছেন যে ফিরে ফিরে শিল্প, বিজ্ঞানের চর্চার আসা যাওয়া এটাই ঘোষণা করে যে জগতে কোনও কিছুই নতুন নয় এবং এই বিশাল প্রাচ্যের দর্শনের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে।

শাস্ত্রে সময়কে বলা হয়েছে কাল বা মহাকাল। সৃষ্টির পরই কালের জন্ম। মহাকাল, অনাদিকাল, সর্বসময়, ও যুগকে গ্রাস করে সমস্ত বস্তু ও জগতকে নস্যাৎ করে। কাল এই জন্যই গতিহীন মহান সমুদ্র। হিন্দু মতে স্বতঃবিনাশের দ্বারা, ওটি আবার পুনর্জাগরিত হয় নবজন্মে, এই সীমাহীন মহাজগতে। এবং যে মহাজাগতিক শক্তি এগুলি নিয়ন্ত্রিত করে সেই শক্তি হল কসমিক এনার্জি। মানুষের আত্মা, বিশ্বের মহান আত্মারই অংশমাত্র সুতরাং মহাকালের দ্বারা জগতের সুখ দুঃখের সঙ্গে জড়িত। কোনও শিল্পভাবনা যখন ক্ষণিক মুহূর্তের ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে তখন শিল্পীর ইন্দ্রিয় সকলও অপরেব সান্নিধ্যলাভের জন্য লালায়িত হয়। ভরতের মতে এই বিচিত্র অনুভূতি যা সহৃদয়ের নিকট নৈর্ব্যক্তিক রূপে প্রতিভাত হয়। সেই ভাব যুক্তি তর্ক দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। কাল বয়ে নিয়ে যায় এই শিল্পসৃষ্টি মহাকালের উদ্দেশ্যে। কাণ্ট সুন্দর ভাবে ক্রিটিক অফ্

পিওর রিজন্-এ দেখিয়েছেন, দৃশ্য জগতে 'সময়' মানুষের বিষয়ীভূত অভিজ্ঞতাগুলির পরিধি পরিমাণ করে বস্তুগুলির নয়। কেননা বাস্তবতা সময়ের মধ্যে নেই, এর অস্তিত্ব বিশ্বে। নিউটনই বর্তমান বিজ্ঞান জগতে প্রথম স্থান (স্পেস্) ও কাল (টাইম্)-এর অবতারণা করেছেন। জানিয়েছেন পরম লগ্নগুলি (এ্যাবসলিউট টাইম) তার নিজ ধর্মেই প্রবাহিত হয় বাইরের কোনও প্রভাবে নয়।

দার্শনিক ডেভিড হিউম কিন্তু মাইন্ডকে বলেছেন অনিশ্চিত বা অনির্দিষ্ট, সে তুলনায় চেতনা বুদ্ধির কাছাকাছি অর্থাৎ কনশাস্‌নেস। চেতনা অর্থে বুঝায় টাইম বাইণ্ডিং এ্যাবিলিটি অর্থাৎ সময় ধারণে সক্ষম। এই চেতনার দ্বারাই মানুষ নিজেকে মহাকালের (কন্টিনাম্) সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত করে নিতে পারে।

ডেকার্টস্ স্বীকার করে নিয়েছেন দ্বৈতসত্তাকে। কারণ জগতে অনেক কিছু থেকে যায় যাকে একটি সত্তার মধ্যে, সীমার মধ্যে বিচার করা সম্ভব হয় না। কিন্তু বর্তমানে চেতনাকে কর্মের অংশীভূত করা হচ্ছে। কারণ জীবন এবং মৃত্যুর স্বরূপ নির্ণয় আজ প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। দুইয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের প্রশ্ন উঠেছে এই সংযোগ স্থাপন করতেও হবে বিজ্ঞানের মাধ্যমে। কারণ প্রত্যেক মানুষই সময় ধারণে সক্ষম হয় কেউ বেশি কেউ কম। এইগুলিও শরীর বৃত্তের অন্তর্গত। এই তথ্য আবিষ্কার করেছেন পাভলভ্। সময় যদি কোন কিছুর বিস্তারিত পটভূমিকায় অভিজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ অবস্থান করে তবে সেই বিস্তারিত পটভূমিকাটি হল আইনস্টাইনের মতে মন। এখানে স্থানও যা সময়ও তাই। পৃথক অস্তিত্ব নেই কোনটিরই। আপেক্ষিক তত্ত্বে ক্ষেত্রের (ফিল্ড) ধারণাটি যদি ধরা যায় তবে দেখা যায় অবিরাম প্রণালী অনুসৃত হচ্ছে স্থান ও সময়ের, দিন ও কালের দীর্ঘ অভিযানে অনাদিক্ষেত্রে অনন্তকাল অবধি।[১৩]

ঋক্‌বেদে আছে সৃষ্টির প্রারম্ভে জন্ম, মৃত্যু, দিবা বা রাত্রের চিহ্নও ছিল না। ছিল না এই পৃথিবী, এই আকাশ। কালের গর্ভে ছিল শুধু পরমাণু। আলো, জল সব কিছুরই অস্তিত্বে পরমাণু। এর পর কোষের (সেল) জন্ম। সেই পরমাণু কোষও চেতনপূর্ণ হয়ে উঠল এবং এই কোষগুলির জন্ম ও ধ্বংস চলতে থাকল অবিরাম। যখন এই কোষাশ্রিত মানুষগুলির বুদ্ধি চেতনায় মন জন্ম নিল স্বরূপে তখন হতেই কালের অস্তিত্ব। আইনস্টাইন বলেছেন 'টাইম ইজ্ দি ক্রিয়েশন অফ্ মাইণ্ড' এই তত্ত্বেরই বর্তমান স্বীকৃতি মহামতি আইনস্টাইনের আবিষ্কারে ই=এম. সি^{২}। যা অঙ্কের ফরমূলায় নিহিত। এখানে বস্তুই শক্তি অর্থাৎ মাস (এম), ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স=ই এবং সি=ভেলোসিটি অফ্ লাইট এ জগতে ক্ষেত্র এবং কাল, বস্তু অথবা তেজ পৃথক নয়। বাস্তববাদীরা (রিয়্যালিস্ট) এই

বৈজ্ঞানিক পথেরই অনুসারী। বস্তু স্থিতিস্থাপক অবস্থায় (থারমোডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম) থাকে। একটি জীবকোষ বিভিন্ন গুণরাজী দ্বারা (চরিত্র, উত্তরাধিকার, প্রতিভা ইত্যাদি) বৈশিষ্ট্য পূর্ণ হয়ে তা শক্তি স্বরূপে আত্মায় ধৃত।

বেদে রয়েছে যে মানুষ পঞ্চভূতের স্তরে গঠিত। মানুষের কোষেরও পাঁচটি স্তর ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। ভিতরের স্তরটিতে আত্মার অবস্থান। এই আত্মার স্তরটিকে বর্তমান বিজ্ঞানীরা 'শক্তি'র স্তর হিসাবে দেখান। এই পাঁচটি স্তর সমন্বিত শক্তি আত্মশক্তিতে ভ্রূণের মধ্যে জীবকোষে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পুনর্জন্ম ঘটায়।

বৃহদারণ্যক গ্রন্থ বা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে 'রহস্যবিদ্যা' বা এক্সট্রা সেরিব্রাল মেমরি'র সাহায্যে মস্তিষ্কে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্মৃতিও ভেসে উঠতে সক্ষম এবং সেগুলি ডি. এন. এ., আর. এন. এ.-এর মতই সূক্ষ্ম ও অসংখ্য। জৈব কোষের মাধ্যমেই ভাস্বর হতে থাকে সেই চিন্তার জাল এবং তার প্রকৃষ্ট প্রকাশ যেমন বিস্ময়ের তেমনই মহানন্দেরও হতে পারে। প্রতিভাধর ব্যক্তিরা যৌগিক সাধনার দ্বারা যা সৃষ্টি করেন তা অসাধারণ হবেই। শ্রীঅরবিন্দ যোগবলে বলীয়ান ছিলেন, তাঁর সাবিত্রীর কবিতাগুলি সাধারণ মনস্তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। সেইগুলি বুঝবার জন্য অতীন্দ্রিয় সাধনার প্রয়োজন। কিন্তু মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যই হল গুণীমাত্রেই একটি বিমল আনন্দ উপলব্ধি করতে পারেন, সেই শিল্পচেতনা হতে যা সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ও নৈর্ব্যক্তিক। সেইজন্যই মহাশিল্পী হতে হলে, যৌগিক সাধনার একান্ত প্রয়োজন এবং চিন্তার যন্ত্রটি (করটেক্স)-কে আয়ত্ত করতেই হয়।

বিবেকানন্দ ব্যাখ্যা করেছেন,

"প্রথমত ইড়া ও পিঙ্গলা নামে শরীরে যে দুটি সাধারণ (স্নায়বিক) প্রবাহ আছে, সেইগুলিকে ঠিকমত চালাইয়া অবচেতন ক্রিয়াগুলিকে আয়ত্তে আনিতে হইবে ; দ্বিতীয়ত অবচেতনারও ঊর্ধ্বে উঠিয়া যাইতে হইবে।...এই অবস্থায় সুষুম্নাদ্বার খুলিয়া যায়। সুষুম্নার মধ্যে তখন একটি প্রবাহ প্রবেশ করে। ইতিপূর্বে এই নূতন পথে কোনও প্রবাহ প্রবেশ করে নাই। প্রবাহটি ক্রমশ উপরের দিকে উঠিতে থাকে, এবং বিভিন্ন পদ্মগুলি (মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে সুষুম্না কেন্দ্রগুলি, যোগশাস্ত্রের ভাষায় এগুলিকে পদ্ম বলা হয়) অতিক্রম করিয়া অবশেষে মস্তিষ্কে আসিয়া পৌঁছায়। যোগী তখন নিজের যথার্থ স্বরূপ অর্থাৎ ভগবৎ সত্তা উপলব্ধি করেন।"[১৪]

রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকোলজি বিভাগের এইচ. এন. ব্যানার্জী

পুনর্জন্মের ঘটনাগুলি মস্তিষ্ক বহির্ভূত স্মৃতিরূপে (এক্সট্রা সেরিব্রাল মেমরি) গণনা করেছেন। তাঁর মতে স্মৃতি বস্তু হতেই সঞ্জাত এবং জীবকোষের ক্রিয়াপদ্ধতি হতেই সঞ্চারিত হয়েছে। মস্তিষ্কের ফসফরাসের পরিবর্তন, ডি. এন. এ. ও আর. এন. এ.-এর জৈবকোষগুলির বিভিন্ন ক্রিয়াপদ্ধতি এবং মস্তিষ্কের রসায়ন পদার্থগুলির বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ায় দেখা যায় যে স্মৃতির ক্রিয়াও গতিধর্মী।

সেইজন্যই চিন্তা (থট), সচেতনতা (কনশাসনেস্), প্রবৃত্তি (প্রপেনসিটি্স), বৈশিষ্ট্য (ক্যারাকটারিসটিক্স্) এবং ঘটনা (ইভেণ্টস্) সমস্তই শক্তি স্বরূপ। এই প্রতিপাদ্য নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হলে 'অতীত জীবনের স্মৃতি' ইত্যাদি মতগুলি অচল প্রমাণিত হবে।

মনস্তাত্ত্বিক জেম্স্ টেলর্ এবং জোসেফ উল্ফ্ জানিয়েছেন যে মন কতকগুলি শিক্ষালব্ধ আচরণের ক্রিয়া (সেট অফ্ ফাংশনস্ অফ্ লার্নড বিহেভিয়ার)। আচরণ স্তরের বাইরে মন স্বয়ংক্রিয় নয়, স্বাধীনও নয়। এই মতের দ্বারা দ্বৈতবাদ অস্বীকার করা হয়।

বলা হয় বস্তু যা ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন প্রভৃতির সমন্বয়ে গঠিত সেইগুলিই অভিজ্ঞতা সঞ্চার করতে সহায়ক এবং এই অভিজ্ঞতাগুলিই উত্তর প্রদায়ী যা কি না শিক্ষার দ্বারা আয়ত্তে আনা সম্ভব। শিক্ষা সেই ক্ষেত্রে বিবেক সঞ্চারী। বিবেক সেই জন্য শারীরিক গঠনেরই উচ্চস্তরের বহিঃপ্রকাশ। পরিবেশ হতে যে স্পন্দন আসে তাই প্রেরণা যোগায়। এই আচরণবাদীদের মনস্তত্ত্বটিও হিন্দু দর্শন শাস্ত্রের সঙ্গে যে সঙ্গতি সম্পন্ন তা দেখান যেতে পারে। স্পন্দনগুলি ইচ্ছাশক্তি তৈরি করে, তখন মন একটি স্থির উদ্দেশ্য নিয়ে কার্যপ্রণোদিত হয় এবং তখনই শক্তি জন্ম নেয়, মনের এই কাজগুলি ঘটে চলে অতি সূক্ষ্ম উপায়ে এবং মনের এই ক্রিয়াটি উত্তেজনা (স্টিমুলাস), ইচ্ছা (ডিসায়ার), শক্তি (ড্রাইভ), উদ্দেশ্য (মোটিভ), ক্ষমতা (ফোর্স) ইত্যাদির মাধ্যমে চক্রাকারে প্রকাশিত।

এই আচরণগত চিন্তাই এনগ্রাম তৈরি করে যা জীবকোষের উপর স্থায়ী ছাপ আনে স্পন্দনের সহায়তায়। ভৌতিক জগতে যেমন মনের অস্তিত্ব কেউ স্বীকার করেন না তেমনভাবে আত্মার অস্তিত্বকেও অস্বীকার করা যায় না। তবে এই অশরীরী আত্মার আনাগোনা আবছা মনে, স্বপ্নে কোনও একটি অস্থির প্রতিকৃতি নিয়ে। এদের জানবার প্রক্রিয়াগুলিতে অনুমনস্তাত্ত্বিকেরা যে সব পদ্ধতি অনুসরণ করেন তাতে কিছু অলৌকিক ঘটনার সন্ধান মিললেও সেগুলি মানুষের মস্তিষ্কেরই অজ্ঞাত কোনও দিকের উন্মোচন, যা কখনও কল্পনা, কখনও ইচ্ছাশক্তির আবেশে, কিংবা অচেতন দেহকে ভর করে দেখা যায়। চিন্তাধারার

জন্ম, ভাবাবেগ সবকিছুর মূলে পূবে হৃদয়ের স্থানটি প্রধান দেখান হত। হৃদপিণ্ড, রক্ত চলাচল সংরক্ষণের যন্ত্র যেখানে মনের স্থানও সেইখানেই। মনের স্থানও মস্তিষ্কের করটেক্স-এই ধরা হয়, সেইজন্য চিন্তার জন্মও কর্‌টেক্সে বলে ধরা হয়। আধুনিকালের মনস্তাত্ত্বিক পেরিভ্যাল বেলি বলেন, মস্তিষ্কের কর্টেক্স হতে মনকে তাড়িত করে নেওয়া হয় নীচের ব্যাসাল গ্যাংগ্লিয়া হাইপোথ্যালামির পথে এবং সবকিছুই মধ্যমস্তিষ্কের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে নীত হয়। প্রাণকেও মস্তিষ্ক থেকে খুঁজে নিতে হবে। মৌলিক আচরণবাদীরা ফ্রয়েডের মনস্তত্বকে এই ভাবে গ্রহণ করতে পরামর্শ দেন।

ফ্রয়েড যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা বলেছেন যা মানুষের আচরণকে প্রলুব্ধ করে, সেই মতটি তাঁরা গ্রহণ করেছেন, এবং অস্বীকার করেছেন সেই মূল্যায়ন পদ্ধতি যা নৈতিক এবং ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ সবকিছুরই নিয়ন্ত্রক।

ডারউইনের মতে জৈব ও অজৈব বস্তু সমূহ নিয়ত কাজ করে চলে, এদের চলার পথে কোথাও ছেদ দেখান হয়নি, প্রাণ এই ভাবেই প্রধান শক্তি রূপে, সমস্ত জীবকোষের মধ্যে ক্রিয়াশীল, অন্যথায় জীবদেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে অণুপরমাণুতে বিভাজিত হয়ে ছড়িয়ে পডবে। যেভাবে পরমাণু 'মেসন' দ্বারা দৃঢ়সংবদ্ধ তেমনই সূক্ষ্ম প্রাণকোষ বা আত্মশক্তি একমাত্র রসজালে আবদ্ধ হতে পারে।

এখানে অতি আধুনিক কালের অস্তিত্ববাদীদের চিন্তার মূলেও হিন্দু দর্শনের অভিমত স্বীকৃত হয়। অস্তিত্ববাদী জেস্‌পার্‌ জ্ঞানাতীত বা অলৌকিক অবস্থা বলতে জ্ঞাপন প্রক্রিয়া (কমিউনিকেশন্‌) এবং পরমোৎকর্ষ (ট্রানসিডেন্স) শব্দ দুটি প্রয়োগ করেছেন। ভাব বিনিময় এবং ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির মত বিনিময় একার্থ। এই জ্ঞাপন পদ্ধতিতে উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে সর্বদাই সহঅস্তিত্ব রক্ষা করতে হবে। একের মধ্যে অপরকেও (কোএক্সিসটেন্স) জানতে হবে। এই জানার আগ্রহ কখনও ফুরায় না, সেই কারণেই ইচ্ছাশক্তি এবং আগ্রহ সর্বদাই অর্থপূর্ণ এবং অতীতের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী। মানুষ যে আলৌকিক কাজকর্মের ধারা এবং ভার বহন করে চলে, তার নিত্য জাগরণ ঘটে। এই ভার সহানুভূতি সহকারে প্রকৃত দরদীই ধারণক্ষম। লোক হতে লোকান্তরে এই ভাবেই চলে সুন্দরের উত্তরণের (ট্রানসিডেন্স) ক্রিয়াপদ্ধতি। এই মতবাদ হিন্দু দর্শনের কার্যকারণ সম্পর্কের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত। একে বলা হয় সুপার এগো এবং ইভ।

এর সমস্তই যে অহংস্বরূপ এবং মস্তিষ্কপ্রসূত সেটিও ধরে নিতে কষ্ট হয় না।

হিন্দুদের সামাজিক আচরণগুলি (সোস্যাল বিহেভিয়ার) আধুনিক কালেব বিজ্ঞানভিত্তিক মতবাদের সঙ্গে সমতাধর্মী। যেমন পিতাপুত্রের সম্পর্ক, গুরুশিষ্য সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রী সন্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সমস্তই একটি বিশেষ সভ্যতার মধ্য দিয়ে দানা বেঁধেছে যা বিবর্তনবাদীরাও স্বীকার করেন।

সারত্রে বলেছেন কল্পনাও একটি স্বাধীন কর্ম। মন শুধু মস্তিষ্কের শুদ্ধসত্ত্ব ভাব প্রকাশের রূপ নয়, সু এবং কু সবকিছুরই সঞ্চালক এবং সৃষ্টিকারী। দ্বৈতবাদীদের আত্মা/পরমাত্মা সম্পর্কটিও বস্তু ও শক্তির মত। অদ্বৈতবাদীদের নিকট প্রাণী সমূহ মহান আত্মার বহুধা রূপে প্রকাশিত বলা হয়। সেক্ষেত্রে মস্তিষ্ক, মন, প্রাণ প্রত্যেককে পৃথকরূপে দেখান হয়নি এবং সর্বদাই বলা হয়েছে 'আত্মানং বিদ্ধি' আত্মাকে জান। চিন্তা আসছে মস্তিষ্ক থেকে এবং ছড়িয়ে পড়ছে মনোজগতে। বিবেক যদি মানুষের নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং সৌন্দর্যভিত্তিক চিন্তাধারা এবং তদ্‌জনিত তৃপ্তি সমূহ প্রকাশে ব্যর্থ হয় তবে অন্যান্য জাগতিক বৃত্তি সমূহ অর্থাৎ ভোগ, সুখ প্রভৃতি অন্য চিন্তা মনোরাজ্যে বিরাজিত হতে থাকে। এর জন্য সংস্কার, উত্তরাধিকার এবং সামাজিক আচরণের প্রভাবগুলিকে দায়ী করা হয় হিন্দু সমাজে। চিন্তা যান্ত্রিক পদ্ধতি নয়, এবং মনকে পরমাণুর সঙ্গে বিশ্লেষণ করতে হলে সমগ্র ঘটনাবলীকে কালের সীমানায় এনেই বিশ্লেষণ করতে হয়। সেখানেও দেখা যাবে পরমাণু সমূহ স্থির নয়, তারা পরিবর্তিতরূপেই কার্য সিদ্ধি করে চলেছে। অণুর পরে অণু এইভাবেই আসা যাওয়া ঘটে মস্তিষ্কে আধিভৌতিক দেহের সীমানায় মূর্ত হয়ে। সেখানে যখন আধুনিক কালের চিন্তাধারার সঙ্গে সমন্বয় রেখে বলা হয় যে মনের ক্রিয়াবলী বিবেকে, যুক্তিপদ্ধতির বিশ্লেষণে, ভাব সম্প্রসারণে, স্মৃতিচারণে এবং বিভিন্ন মূল্যায়নে তখন ধরে নেওয়াই ভাল এই মনের অলৌকিক কার্যভার গ্রহণ করবার ক্ষমতা রয়েছে।

অশরীরী আত্মার পরিচয় দেওয়া যায় এইভাবে যে বিচ্ছিন্ন কণাগুলিও (ফ্র্যাগ্‌মেন্টেড পার্টিকল্‌স্‌) মানসিক ক্রিয়া ঘটাতে পারে—যা স্বাভাবিক মানুষের আত্মার ক্রিয়া রূপে ধরা হয় অনেক ক্ষেত্রে। বা বলা যায় অশরীরীদের ক্রিয়াকলাপ বিচারে অতিরিক্ত অপূর্ব ইন্দ্রিয়ানুভূতি সম্পন্ন বোধের প্রয়োজন। সেই বোধ বলা হয়েছে ব্যক্তি বিশেষের উত্তরাধিকার সূত্রে থাকে সকলের ক্ষেত্রে থাকে না। অতীত জীবন সম্পর্কে জ্ঞানাহরণ যেদিন সম্ভব হবে তখন ব্যক্তিজীবনের ভবিষ্যৎ যা এখনও অজ্ঞাত তাও জানা সম্ভব হবে। বস্তুত মহাকাল খণ্ড বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, প্রতি মুহূর্তের ক্রিয়াশীলতাও এরই অন্তর্গত। ডঃ

প্রিয়দারঞ্জন রায় তাঁর বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি পুস্তিকায় এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন যে বস্তু ও শক্তি প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন। কিন্তু এই কার্য কারণের মূল কোথায়, বস্তুর উৎস কোথায় ? সেখানে বিজ্ঞান এখনও পৌঁছায়নি।

বিবেক বা আত্মার স্তরে চৈতন্য থাকে সুপ্ত অবস্থায়। মনে সেটি জাগরিত হয়। প্রাণে (মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্রে) চৈতন্যের অবস্থান মায়াময় এবং স্বপ্ন দ্বারা আচ্ছন্ন আবেশময়। প্রিয়দারঞ্জন রায় বলেছেন এই চৈতন্যশক্তিই মহান বিশ্বের আত্মা। উপনিষদে এই আত্মাই ব্রহ্মা। মানুষের দুঃখের নিবৃত্তি ও নির্বাণ লাভের মধ্যেই মুক্তি লাভ। মহাজাগতিক শক্তি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করেই বুদ্ধদেবের পক্ষে বুঝান সম্ভব হয়েছিল ধর্মাচরণ অর্থহীন সেই ধর্ম যদি মানুষের মঙ্গল না করে। এবং মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাসই ধর্মের মূল উপাদান।

জন্ম, মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা সম্বন্ধে দার্শনিক মতবাদ বৈজ্ঞানিক মতবাদের সঙ্গে একধর্মী হলেও মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা জানবার সঠিক পদ্ধতি নিয়ে আজও গবেষণা চলেছে। কেননা ক্ষেত্র ও কালের একটি ধারাবাহিক প্রবাহ রচনা প্রয়োজনীয়। আত্মা যেখানে মূল শক্তিরূপে জীবিত সেইটিকে যথেষ্ট সংযমের আয়ত্তে আনবার জন্যই যোগাভ্যাসের প্রয়োজন। প্রচলিত মতবাদ, যোগ বলেই ভূত ভবিষ্যৎ নিরূপণ করা সম্ভব। ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে যে বিবেক তাকেই যোগ বলে আয়ত্তে আনতে হয়। সেই বিবেক বোধটিকে এক্সট্রা সেনসরি বা এক্সট্রা সেরিব্রাল যে কোনও পারসেপসন রূপে বিবেচনা করা যায়। মহাযান বোধিসত্ত্ববাদ কর্ম ও পুনর্জন্ম মানলেও ব্যক্তি যে জীবন হতে জীবনে সঞ্চালিত হয়ে চলে তা বিশ্বাস করে না।

বুদ্ধের মত হল আত্মার স্থায়িত্ব গুরুত্বপূর্ণ কর্মের দ্বারা (ক্যাসুয়্যাল মেনাস) নিয়ন্ত্রিত। এতে বিবেকের কিছু অংশের বিলোপ ঘটে কিছু পুনর্জন্মে আসে। এই ফিরে আসার সময় পূর্বদেহের সঙ্গে কোনও সংস্রব থাকে না। বুদ্ধের এই নীতি যদি মানা যায় তাহলে বলতে হয় জন্মান্তরবাদের তত্ত্ব অনুযায়ী কোনও বিশেষ শিল্পী পরবর্তী জন্মেও শিল্পী রূপে জন্মগ্রহণ করেন। কোনও প্রাণের গঠনের মধ্যে তার পূর্ব প্রতিভা সঞ্চিত থাকে। একজনের শৈল্পিক প্রতিভা অন্য প্রাণে সঞ্চারিত করা সম্ভব। এক্ষেত্রে মানব মনের স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক এবং পরাস্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব বিচার্য। আমরা দেখি মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা চলে আসছে পাশ্চাত্যের ভাবধারা অনুকরণে। কিন্তু প্রাচ্যেও যে শিল্পচিন্তা যুক্তি, দর্শন ও মনস্তত্ত্বকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে তারই প্রমাণ উপরোক্ত চিন্তাধারা। এর দ্বারা আমরা উপলব্ধি করি ভারতীয় চিন্তাধারায় জন্মান্তর বাদ কত গভীরে সুপ্রথিত।

অন্যের চিন্তা উপলব্ধিকরণ (টেলিপ্যাথি) প্রকৃতির মধ্যে ঘটনা চাঞ্চল্য ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি সহযোগে উপলব্ধি করে ভবিষ্যৎ বাণী করা (প্রেডিকসন), কোনও বহু দূরের ঘটনা বা চিত্র চোখে ভাসিয়ে তোলা (ক্লেয়ারভয়েন্সি) এই কার্যগুলি আমরা কিছু ক্ষেত্রে সফল হতে দেখছি। পূর্বজন্মের ঘটনা স্মরণ করার পদ্ধতি সমূহ কর্মে নিযুক্ত করা গেলে অতীতের প্রতিভাবান ব্যক্তি সমূহকে ফিরিয়ে এনে তাদের নির্দিষ্ট কর্মে পুনর্নিয়োগে সমর্থ হত মানব সমাজ। জীবন বৃত্তান্তের ধারাবাহিকতা (কনটিনিউইটি) সম্বন্ধে আচরণবাদী মনস্তাত্ত্বিকদের যুক্তি হল অভিজ্ঞতার ক্রমপ্রসারতাব মধ্যেও জীবেব গঠন পদ্ধতি বিশ্লেষণ করতে হবে।

বিজ্ঞান বলে মানুষ যন্ত্রেব মত। ধ্বংস ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষ বিবর্তন লাভ করবেই যতক্ষণ না 'সুন্দর' রূপায়িত হতে পারে যেমন একটি যন্ত্রেব (মেশিন) ক্রমোন্নতি ঘটান হয়। সুতরাং দুঃখকে সহ্য করতে হবে। আনন্দের ক্ষেত্রের দিকে ক্রমউত্তরণ, আচরণবাদীদের এই বৈজ্ঞানিক মনস্তত্ত্ব। বোধিসত্ত্ববাদ, বেদান্তবাদ, অদ্বৈতবাদ সবের সঙ্গেই এই মত মিলনসূত্র রচনা করেছে।

পাশ্চাত্যের অভিমত অনুযায়ী প্রাণকে জড় পদার্থ বলা হয়, তারই ভাবধারা নিয়ে শ্রীরমা চৌধুরী জীবেব নিত্যত্ত্ববাদ সম্বন্ধে সুন্দর ভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন প্রাণ হল একটি জৈবিক তত্ত্ব ও শক্তি, যা একটি সুইচ বা যন্ত্ররূপে জীবদেহের অসংখ্য জৈবিক ক্রিয়াকলাপকে সম্মিলিত এবং সংহত করে। এই সম্মেলন ও সংহতি নিয়মিত চললেই থাকে প্রাণ। অন্যথায় মৃত্যু ঘটে। যদিও তিনি নিজে এই ধরনের চিন্তাকে 'অদ্ভুত' মনে করেন।[১৬]

পরমাণুবাদের তত্ত্বানুসারে বস্তু ও শক্তি প্রকৃতপক্ষে একই প্রাণবস্তু হলেও ক্ষতি নেই, শক্তির প্রাধান্যেই তা জীবন্ত বিবেচিত হবে। অবশ্য এখানে আত্মাই হবে বিজ্ঞানীদের সেই শক্তি যা কিনা কসমিক এনার্জি রূপে আখ্যাত। কসমিক এনার্জি এবং মহাকাশ বা মহাশক্তি শব্দটিকে একার্থক রূপে আমরা বিবেচনা করতে পারি। বৌদ্ধগণ এই আত্মার অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করেন। বিবেকানন্দ বৌদ্ধদের মত প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, "আমাদের জীবনেও একত্ব নাই জড়ের রাজি ক্রমাগত বহিয়া চলিয়াছে। মনের সম্বন্ধেও তাই। প্রত্যেক চিন্তা অপর চিন্তা হইতে পৃথক। এই প্রবল চিন্তা স্রোতই একত্বের ভ্রম রাখিয়া যাইতেছে।

সুতরাং তৃতীয় পদার্থের আর আবশ্যকতা নাই।"[১৭]

বৌদ্ধ দর্শনের এই পরিদৃশ্যমান জগৎই পর্যাপ্ত এই মত অনেকেই গ্রহণ করেছেন এবং নিজেদের আবিষ্কার বলে চালিয়েছেন এও বিবেকানন্দ দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। জড়বাদী অথবা অস্তিত্ববাদীদের যুক্তি এইখানেই প্রবাহিত।

পরকাল, পুনর্জন্ম ইত্যাদি রোমান্স রচনা করে মানব লোকে নৈতিক বিশৃংখলার ব্যাখ্যা দেওয়া মানে শুধু নিজেকে ভোলান। কারণ আমরা দেখি হিউম্যানিস্ট দার্শনিকদের কাছে প্রকৃত মানবতাই (আইডিয়্যাল হিউম্যানিটি) একমাত্র ধ্যান জ্ঞান।

রবীন্দ্রনাথ মহাশিল্পী। পরলোক বা পরজন্ম বা জন্মের অতীতের সঙ্গে যে সম্পর্ক তা কবির এই জন্মেই ঘটেছিল। কারণ কবির মতে "এক একটি জড় প্রকৃতির লোক আছে জগতের খুব অল্প বিষয়েই যাহাদের হৃদয়ের ঔৎসুক্য, তাহারা জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়াও অধিকাংশ জগৎ হইতে বঞ্চিত। তাহাদের হৃদয়ের গবাক্ষগুলি সংখ্যায় অল্প ও বিস্তৃতিতে সংকীর্ণ বলিয়া বিশ্বের মাঝখানে তাহারা প্রবাসী হইয়া আছে।"

অর্থাৎ কবি তাঁর চোখ, কান এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় খোলা রেখেই দুই জগতের মধ্যে একটু সেতুর সৃষ্টি করেছিলেন। সেই পথেই তাঁর জীবন দেবতার আনাগোনা। ইনি শরীরী নন বা অশরীরীও নন্। দুইয়ের মধ্যে কোনও এক অস্তিত্ব যিনি একান্ত ভাবে শুধু কবির জন্যই। কবি অনেক সময়ই সন্দেহ করেছেন তাঁর কবিতাগুলি তাঁর সজ্ঞানে সুচিন্তিতভাবে লেখা নয়। কবির নিজের মধ্যে যেন আরও এক কবির সৃষ্টির হয়েছে যিনি কবিতা রচনা করেছেন। কবি তাঁকে কখনও দেখেছেন নারীরূপে কখনও পুরুষ বেশে। তাঁকে তিনি বন্ধু বলেছেন, নাথ বলেছেন, দোসর বলে আবাহন জানিয়েছেন,

"শুধু ভাসে তব দেহ সৌরভ,
শুধু কানে আসে জল কলরব,
গায়ে উড়ে পড়ে বায়ু ভরে তব কেশের রাশি"।

ইত্যাদি বহু রূপে তাঁকে বর্ণনা করেছেন। কবি যখন জীবন দেবতার সংস্পর্শে আসতেন, তখন জ্ঞান চৈতন্য কোনও ঊর্ধ্ব স্তরে বিরাজ করত যেখানে জাগতিক চিন্তাধারা পৌঁছয় না। তাই রবীন্দ্রনাথ নিজে, এ্যারিস্টটল্ এবং আরও অনেকেই মনে করেন এ এক অন্য ক্ষমতা, অন্য জগৎ যা নিজের বুদ্ধিতে বিশ্লেষণ করা যায় না। এ্যারিস্টটল বলেছেন কবি যখন রচনা করেন "ইজ্ লিফ্‌টেড আউট অফ হিজ প্রপার সেলফ্"।

অর্থাৎ সচেতন মনে কবিতা সৃষ্টি হয় না। নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আরও

উপরে উঠে যাওয়া। কবি নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন না। শুধু রবীন্দ্রনাথ নন্ কবি ওয়ার্ডস্ওয়র্থ যাকে বলেছেন ব্লেস্ড্ মুড, দার্শনিক ফেকনার এঁকে বলেছেন ডিরেক্টর্। সক্রেটিস্, প্লেটো, গ্যেটে, প্রত্যেকেই এই অস্তিত্বকে অনুভব করেছেন। অর্থাৎ বলা যায় এঁরা প্রত্যেকেই জগতের উর্ধ্বে অন্য এক জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

"সি. জি. য়ুভ শিল্পকলাকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন ; ভিসিয়নারি আর্ট এবং সাইকোলজিক্যাল আর্ট"।[১৮]

ভিসিয়নারি আর্ট এর সৃষ্টির কালে, স্রষ্টার সজ্ঞান মন অবেচতন মনের অধীন। অবচেতন মনই কর্তা, চেতন মন দ্রষ্টা। 'সাইকোলজিক্যাল আর্ট' সৃষ্টি কালে, চেতন মন অনেকটা স্বাধীন ভাবে কাজ করে থাকে। শিল্পকে দুই স্তরে ভাগ করাই যে ভাল, কবিদের, দার্শনিকদের নিজেদের সাক্ষ্যেই এর স্বীকৃতি।

রবীন্দ্রনাথ আর এক অস্তিত্ব অনুভব করেই ক্ষান্ত হননি তিনি বলেছেন তাঁর 'পাগল' প্রবন্ধে,

"এই সৃষ্টির মধ্যে একটি পাগল আছেন, যাহা কিছু অভাবনীয় তাহা খামখা তিনিই আনিয়া উপস্থিত করেন। তিনি কেন্দ্রাতিগ, 'সেন্ট্রিফ্যুগল' তিনি কেবল নিখিলকে নিয়মের বাহিরের দিকে টানিতেছেন।"[১৫] তাই তিনি প্রতিভাবানকে এক শ্রেণীর পাগল বলে অভিহিত কচ্ছেন। তার কারণই হল পাগলের সমস্ত চিত্ত এই জগতে সমর্পিত নয়।

এই সম্বন্ধে আবু সয়ীদ আইয়ুব একটি সুন্দর মন্তব্য করেছেন ভিন্ন প্রসঙ্গে। "পরাবস্তুবাদ। এর প্রভাবও পড়েছে হালে বাঙালি কবিদের উপর, ফরাসি পরাবস্তুবাদীদের সাক্ষাৎ পরিচয়ে ততটা নয় যতটা মার্কিন বীটনিকদের মধ্যস্থতায়। এঁরা বুদ্ধির তথা চৈতন্যের সীমানা অতিক্রম করে ভাঙ, হাশিশ্, মেস্কালিন ইত্যাদির সাহায্যে প্রবেশ করতে উদ্যত হলেন অবচেতনার গহন আদিম অরণ্যে, ভাবলেন সে অরণ্য থেকে কবিতা বেরিয়ে আসবে বন্য হস্তীর মত, সামনে যা পাবে তাই ভেঙেচুরে, শুধু বুদ্ধি নয়, নীতি নয়, রীতি রুচি শালীনতা সব কিছু তছনছ করে। সন্দেহ করলেন না যে সব চেয়ে তলার যা, তার মূল্য সকলের উপর হতে পারে না, জেনেও জানলেন না যে তুচ্ছই সহজ, মহতের জন্য দীর্ঘ কঠিন সাধনার প্রয়োজন।"[২০]

আত্মা আছে কি নেই বা দ্বিতীয় অস্তিত্ব সম্ভব কি না এর সন্দেহ ভঞ্জন করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। "আমি বিনাশী বললে বুঝায়, আমি থাকিব না, কাল থাকিবে। ইহা অর্থশূন্য : কেন না, আমি না থাকিলে আবার কাল কি লইয়া

থাকিবে ? কাল ত আমারই কল্পনা। আমি 'অবিনাশী বলিলে বুঝায় আমি থাকিব, কালও থাকিবে, কাল ব্যাপিয়া আমি থাকিব, অনন্ত ভবিষ্যৎ ব্যাপিয়া থাকিব, ইহারও অর্থ হয় না।...আত্মা বিনাশী কি অবিনাশী এই প্রশ্ন একেবারে অর্থশূন্য। যে প্রশ্নের অর্থ নাই, তাহার উত্তর দানের চেষ্টা মূঢ়তা।"[২১]

যোগ সাধনাও কিন্তু মনোবিজ্ঞানের একটি অঙ্গ। ভারতবর্ষে যোগশাস্ত্র একটি প্রধান স্থান অধিকার করে আছে।

ভারতবর্ষে যোগ সাধনার স্থান কি, তা হ্যাভেল সাহেবের বক্তব্যে বোঝা যায়। এবং ভারতবর্ষে শিল্পসাধনা, যেমন সংগীত, চিত্র, কাব্য ইত্যাদি সচেতন মনের রচনা নয়। যোগসাধনার দ্বারা মনকে উন্নত করতে হয়।

হ্যাভেল বলেছেন,

"যোগ সাধনা শুধুমাত্র আত্মিক উন্নতি বা অতিসুখকর দৃশ্যাবলী দেখার জন্যই মনকে প্রস্তুত করে না। এ দাবী করায় এক ধরনের মানসিক প্রস্তুতি যে প্রস্তুতি মহাকালের গতির সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেওয়ার জন্য টেনে তোলে। যে গতি এই বিশাল বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করছে, এবং সর্বপ্রকার মানসিক এবং শারীরিক তৎপরতাকে উদ্দীপ্ত করছে। এই যোগ সাধনাই আবার প্রেরণা যোগায়, শিল্পীকে, কবিকে, গায়ককে এই সঙ্গে সেই অতীন্দ্রিয় রহস্যের উপরও আলোকপাত করে যোগ সাধনা। এই যোগ সাধনাই কারিগরকে কিছু সৃষ্টি করবার প্রেরণা যোগায়, সেনাপতি সেই ক্ষমতার অধিকারী হয় যার দ্বারা সে সৈন্য নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। রাজনীতিবিদ্‌কে করে তোলে দূরদর্শী, ভবিষ্যদ্বক্তা এবং চিন্তাবিদকে যোগায় অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা।"[২২]

যোগ সাধনার দ্বারা মনকে আয়ত্তে আনা যায়। মনকে আয়ত্তে আনার কতকগুলি প্রক্রিয়া আছে। যার দ্বারা চেতনার সময় ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এই বিষয়ে ভারতবর্ষে পতঞ্জলির বই সুপ্রসিদ্ধ। তাই হ্যাভেল সাহেবের মতে ভারতীয় শিল্প মূলত আদর্শবাদী এবং রহস্যময়। প্রতীকরূপে ব্যবহৃত এবং অতীন্দ্রিয় বা লোকোত্তর। সেইজন্য শিল্পীও একাধারে কবি ও পুরোহিত। তিনি তাঁর মতের সমর্থনে শুক্রাচার্যের শুক্রনীতিসার গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, শিল্পী আধ্যাত্মিক চিন্তার অনুশীলনের দ্বারাই ঈশ্বরের রূপ কল্পনায় সক্ষম হন। শুক্রাচার্য বলেছেন এই আধ্যাত্মিক চিন্তার অধিকারী শিল্পীমাত্রেরই হওয়া উচিত।

কিন্তু কল্পনাও শুধু ঈশ্বরের চিন্তা দ্বারা পরিশীলিত হয় না। কল্পনা প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই কল্পনা প্রভাবিত হয়, অনুভূতি, আবেগ এবং প্রবৃত্তির দ্বারা।

রিবট এর মতে, অনুভূতির উত্তরণ তখনই সম্ভব যখন অনুভূতি এবং আবেগ ঘনীভূত হয়। এই ঘনীভূত অবস্থাকে তিনি বলেছেন দিবাস্বপ্ন বা স্বপ্ন, যখন কল্পনার স্বাধীনতা সীমাহীন। কিন্তু দিবাস্বপ্নও ত সচেতন মস্তিষ্ক প্রসূত হয় না। দিবাস্বপ্নেব মাধ্যমে যে কল্পনার আগমন সেই কল্পনা নানা দিকে প্রধাবিত হতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতে যিনি শিল্পী হবেন তিনি তাঁর অজ্ঞাতসারে ভাব প্রকাশের বাঞ্ছনীয় পথ খুঁজে নেন।

অটো র‍্যাঙ্ক উদ্ধৃতি তুলে তুলে দেখিয়েছেন স্বপ্নের মূল্য, শোপেনহাওয়ারও স্বপ্নের কথা বলেছেন, দান্তে স্বপ্নেব জগতকে বাস্তব করে তুলেছেন। শেক্সপীয়ারের কাছে স্বপ্নের অসীম মূল্য।

এমনকি শিল্পতাত্ত্বিক কান্টও বলেছেন, 'ইনভলানটারি পোয়েট্রি' অর্থাৎ অবশ চেতনার দ্বারা লিখিত কবিতা। স্বপ্নের সঙ্গে শিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন পল সুরিয়ান, এই মতের সমর্থক হলেন বৃটিশ মনস্তাত্ত্বিক প্রেসকল, আলফ্রেড দ্য ভিগনি বলেছেন, স্বপ্নও যখন কল্পনা, দিবাস্বপ্নও তাই, এবং প্রত্যেক শিল্পের জন্য যখন বিভিন্ন কল্পনার ক্ষেত্র নেই, কল্পনারই রূপভেদ কাজেই সবই একই গোত্র। যদিও এ বিষয়ে মত পার্থক্য হওয়া সম্ভব কারণ কল্পনাই শিল্প নয়, শিল্প বহুলাংশে নির্ভরশীল প্রকাশ ক্ষমতার উপর। কাজেই স্বপ্ন এবং শিল্প কখনোই এক গোত্র হতে পারে না। এবং স্বপ্ন ও শিল্প যদি একই হয় তাহলে সচেতন এবং অবচেতন মনের পার্থক্য তুলে দিতে হয় যা কখনোই সম্ভব নয়।

প্রকৃতপক্ষে শিল্পের আবির্ভাব যে কল্পনার দ্বারা সেই কল্পনার জন্ম যেখানে তাকে আমাদের সংস্কৃত গ্রন্থে বলা হয় অন্তর হৃদয়াকাশ।

মহাশূন্যে যে অসীম লোকের প্রতিষ্ঠা, তারই ক্ষুদ্র প্রতিফলন হয় যখন কারও অন্তরে তখনই হয় সেখানে শিল্পের জন্ম।

"হৃদয় নন্দন বনে নিভৃত এ নিকেতনে
এসো হে আনন্দময় এসো চির সুন্দর।"

রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দের মত যিনি এই হৃদি নিকেতনকে চিনতে পারবেন তিনিই শিল্পের স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারবেন। শ্রী কুমারস্বামী বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রসঙ্গ তুলে জানিয়েছেন, যোগ সাধনার দ্বারা মানুষ নিজেকে উন্নত করতে পারে, অর্থাৎ কোনও দেবতাকে সে যখন পূজা করবে, তখন নিজেকে সেই দেবতারই অংশ বলে ধরে নিতে হবে শিল্প সাধনার ক্ষেত্রেও তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করে ইউরোপ ও এশিয়ার শিল্পকলার মূল ক্ষেত্রটিকে একত্র করে দেখানোর প্রয়াস পেয়েছেন।[২৩]

যেমন দান্তে বলেছেন,

কেউ যখন ছবি আঁকবেন, তিনি যদি সেই ছবির মূলে প্রবেশ না করেন, তবে তিনি তা আঁকতে পারবেন না।

সত্য, শিব, সুন্দর হলেন ঈশ্বর। সত্য যা তা হল ধারণা বা জ্ঞান। শিব হল সত্যের প্রকাশ বা ধারণার প্রকাশ। সেই প্রকাশই যদি সুন্দরের পথ প্রদর্শন করায় তবেই আনন্দরূপ ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।

সত, চিৎ, আনন্দ। ধারণা যখন বুদ্ধির সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তখন হল প্রকাশ, প্রকাশই আনন্দের পথ এবং প্রেরণা।

মনের জটিল দিকগুলি যে সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারে সেই শিল্পী। পূর্বে শিল্পের বিষয়বস্তুটিকে সম্ভাব্য (প্রবেবল্) রূপে গ্রহণ করা হত। সম্ভাব্য বলতে এখানে ধরা হয় শৈল্পিক সংগতি (কোহেরেন্স) অর্থাৎ শিল্পের আবেদন ক্ষমতাও তার সঙ্গে যুক্ত। সম্ভাব্যের পরিবর্তে কী হবে চিন্তা করতে গেলেও মনকে কল্পনাশ্রয়ী হতে হয়, সুসঙ্গত কল্পিত রূপটি চিন্তা করবার অধিকার অর্জন করতে হয়। কিন্তু এসমস্ত চিন্তার মধ্যে অবিশ্বাস্য বস্তুকেও কল্পনাযোগ্য করবার প্রয়াস পেতে হয়।

শিল্প প্রকৃতির অন্ধ অনুকরণ নয়, তাহলে সেটি হত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেরই ধারাবাহিক ছবি বা ক্রিয়া পদ্ধতি যা বিশেষ হতে অবিশেষে কোনও দিনও গ্রহণযোগ্য হবে না, কেননা নিয়মের ধারাবাহিক রীতির সঙ্গে শিল্প যুক্ত হলেই তা নূতনত্বের অবকাশ রাখে না। সংকেত উপমা, বক্রোক্তিকে অনেক সময় শিল্পের সার রূপে ধরা হয়েছে। ক্রোচে শৈল্পিক সংজ্ঞালব্ধ ফল ও সংকেতের সঙ্গে ইনটুইশানকে একত্রিত করে দেখেছেন।

ক্রোচের মতে শিল্পের কামিজে দুটো বোতাম নেই, শিল্পে সবই সাংকেতিক কেননা সবই আদর্শনীয়।[১৪]

আর এই সংকেতগুলো যদি চৈতন্য প্রকাশে অভ্রান্তরূপে গ্রহণ করতে হয় তবে রূপকের (এ্যালিগরি) আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় এবং সেই ভাবে সিম্বল যেমন খণ্ড শিল্প ও এককভাবে হতে পারে, রূপকও তেমনি শিল্প জগতে বিশেষের প্রকাশ ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করতে পারে, কিন্তু রূপকের সীমাও তো সীমায়িত। বুদ্ধিবাদীরা এইভাবে শিল্পের স্তর বিন্যাসেও চমৎকারিত্ব দেখিয়ে যাবেন। শৈল্পিক স্তর হতেই মানুষ যৌক্তিক (লজিক্যাল) স্তরে পৌঁছায়। এই ভ্রান্তিমূলক তত্ত্বটির নাম শিল্প ও সাহিত্যমূলক শ্রেণীবাদ (থিওরি অফ্ আর্টিস্টিক এ্যাণ্ড লিট্যারারি কাইণ্ডস্)

ক্রোচে জানিয়েছেন এই সমস্ত ভ্রান্ত তত্ত্বগুলো শুধুমাত্র মুখে স্বীকৃতি এবং কপট আনুগত্য দেখিয়ে বুদ্ধিজীবী সমালোচকদের হাত এড়িয়ে গিয়েছে। এইভাবে ধীরে ধীরে মৌলিক রচনাগুলি প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস, নিয়মতত্ত্বাদি ভেঙে সমালোচকদের ধারণাকে পরিবর্তিত করতে সাহায্য করেছে। ফলিত রূপ বা ক্রিয়া হচ্ছে স্বেচ্ছা (উইল)। প্রকৃত শিল্পসৃষ্টির জন্য যে ইচ্ছা শক্তির প্রয়োজন তা ব্যক্তিগত। অর্থাৎ শিল্পসৃষ্টিতে অপরের ইচ্ছা থাকলেও স্বেচ্ছাই প্রধান। কর্ম সেখানেই ক্রিয়ান্বিত যতদূর এটি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়। (এ্যাকশন্ ইজ রিয়্যালি এ্যাকশন্ ইন সো ফার এ্যাজ ইট ইজ ভলান্টরি)

শিল্পে আনন্দ সৃষ্টি করাই যাঁদের উদ্দেশ্য তাঁদেরও নির্ভর করতে হয় প্রকৃত প্রত্যয়গুলির উপর। শব্দ, সুর, ছন্দ, রেখা ইত্যাদি তখন সংশ্লিষ্টরূপে আনন্দদায়ক হয় এবং বিষাদাত্মক দিকগুলি চিত্তাকর্ষকরূপে প্রকাশিত হয়ে উঠে। শিল্পের প্রকাশ প্রকৃত পক্ষে প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করেই। প্রত্যয়েই শুরু এবং প্রত্যয়েই শেষ হয় শিল্পকর্ম। প্রতিটি প্রকাশ ব্যঞ্জনারই মূল উপাদান স্মৃতিপট হতে সংগ্রহ করা বা বলা যায় স্মৃতিপটের অন্তরালে ভবিষ্যতের সম্ভাবনাগুলি ধরে রাখবার সঠিক বিচার পদ্ধতি বা বুদ্ধির ক্রিয়া ধরা দেয় স্বেচ্ছার মধ্যে। এই স্বেচ্ছাই উদ্দীপনা সৃষ্টি করে কাব্যে, সংগীতে, স্থাপত্যে, চিত্রশিল্পে। কল্পনার এই উদ্দীপকরূপ কোনও পূর্বসৃষ্ট রূপাধার হতেই সংগৃহীত হয়। এই রূপকেই আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব শিল্পীর। স্থির হওয়ার উপায় নেই শিল্পীর। দুর্দম প্রাণের আবেগে ছুটতে হয় নতুবা শিল্প পুঞ্জীভূত বস্তুতে পরিণত হয়। অসুন্দরের আত্মপ্রসাদ যেখানে। আদিকাল থেকে যে সংগীত প্রচলিত তার বাণী বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে প্রকৃতপক্ষে সংগীতের বাণী গূঢ় অর্থ সম্বলিত। সাধক যা উপলব্ধি করে., তা বাণীময় সংগীতের মাধ্যমে মানবের আত্মার নিকট আবেদন স্বরূপ উপস্থাপিত করেন। সংগীত সেইজন্য বিষ্ণুর বাণী। ঈশ্বর সেখানেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত দেখে সুখী হন সেইজন্যই ভক্তকণ্ঠ গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশে ব্যাপৃত হয়। সুর ও স্বরের মাধ্যমে তাই ঈশ্বরের সঙ্গে একটি নৈকট্য বোধ জন্মায়। তাই সংগীত সেখানে তান্ত্রিক সাধনা বা চমৎকারিত্ব প্রদর্শনের দ্বারা শুধুমাত্র আনন্দ বর্ধনকারী নয়।

সংগীতের সাধনা রূপের মধ্য দিয়ে অরূপরতনের অন্বেষণ। তাই সুর বা স্বর ভুলে যেমন তা সম্ভব নয়, তেমন স্থান, কাল ও পাত্রের অবস্থান অস্বীকার করে কোনও অতীন্দ্রিয় লোকে পৌঁছানর পথও প্রশস্ত নয়। চিন্তা ভাবনা সর্বদা শব্দকে নির্ভরশীল করে তুলে ধরে একটি বিশেষ 'চিহ্ন' রূপে। সুতরাং সংগীতের মধ্যে

যেমন রয়েছে চিত্ত বৃত্তির স্থান, তেমনই রয়েছে প্রতীক (সিম্বল) এবং চিন্তনীয় বিষয়ের উপলব্ধি ঘটান।

লাস্তসের মতে 'যিনি জানেন, তিনি প্রকাশ করেন না, যিনি প্রকাশ করেন তিনি জানেন না।' ভাষার মাধ্যমে, কথার প্রতিকৃতি গড়ে ওঠে, অর্থাৎ অর্থ প্রকাশ করে। ভাষার মূল্য অপরিসীম। এ বিষয়ে মিসেস সুসেন ল্যাঙ্গার বলেছেন, "ভাষাই আমাদের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সংকেত। তাদের প্রয়োজনীয়তাও সর্বজনীন। মানুষের পায়ের পাতার উপর চলার মত স্বাভাবিক। মানুষ প্রাথমিক অবস্থায় বাক্যে প্রকাশ করার মত সুবিধাজনক আর কিছুই পায় না এবং যতক্ষণ পারে ভাষায়ই প্রকাশ করে।"[২৫] আসলে প্রতীক কোন বিষয়েব প্রতিরূপ নয়। কিন্তু বিষয়ের বাহনরূপে গণ্য করা যায়। একটা কোন বিষয়ের মধ্যে প্রতীক যদি বন্ধন হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তা চরম বাধা রূপে উপস্থিত হয। প্রতীক ব্যবহাব হবে কিন্তু বিষয়কে সতর্ক করে নয়, বিষয়ের মধ্যে সুপ্ত হয়ে। সেইজন্য শৈল্পিক প্রকাশ যদি 'অর্থের বন্ধন'কে অতিক্রম করতে না পারে তবে প্রকাশক্ষমতা অজ্ঞতারই প্রমাণ। অনুরূপ ক্ষেত্রে প্রকাশের মাধ্যমে জ্ঞানদানে প্রবৃত্ত হলেও সত্যের অবলুপ্তি ঘটে। সেক্ষেত্রে শব্দের শক্তি নিরূপণ করতে হলে প্রকৃত চিহ্ন বা স্বরূপ প্রকাশ করা প্রয়োজন। এবং এক্ষেত্রে দেখা যায় প্রতীক ও চিহ্নীয় বিষয় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে যায়।

শব্দের ক্ষমতা অসীম এবং সেইজন্য ঐন্দ্রজালিকও বটে। কোনও চিহ্ন ফুটিয়ে তোলার জন্য চাই কুহেলী মন। 'চিহ্ন' সমূহও পরস্পর সংগ্রহীত এবং বোধের দ্বারা আয়ত্ত করতে হবে।

অতীতের অভিজ্ঞতা কোনও ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, বর্তমানে সেই একই ঘটনা ঘটে থাকলে সামঞ্জস্য সম্ভব হয়, ব্যক্তিমানসপটে এইভাবে চিহ্নগুলি মাধ্যমের দ্বারা বহন করে নিয়ে চলে চিন্তার অধিরাজ্যে। শিল্পে যে যে সৌন্দর্য স্ফুটিত হয় তার মধ্যে থাকে সত্য (ট্রুথ), বাস্তবতা (রিয়েলিটি), সর্বজনীনতা (ইউনিভার্সালিটি), শুদ্ধসত্ত্ব (অ্যাবস্ট্রাক্শন্) অথবা নেতিবাচক বিষয় (নেগেটিভ ফ্যাক্টস্)। এর যেকোনও একটিকে ফুটিয়ে তুলতে চিহ্ন বা প্রতীকের প্রয়োজন হতে পারে। শব্দ চিন্তনীয় বিষয় (রেফারেন্স)-কে চিহ্নিত করে যখন সুপরিকল্পিতভাবে এগিয়ে যায় তখনই প্রকৃত অর্থের গতি সঞ্চার হয়। সি. কে. অগডেন এবং আই. এ. রিচার্ড চিন্তার প্রসঙ্গ উল্লেখক্রমে একটি ত্রিভুজের উদাহরণ গ্রহণ করেছেন। ত্রিভুজের তিনটি বাহু যথাক্রমে ১) প্রতীক (সিম্বল্) ২) প্রসঙ্গ (রেফারেন্স) ৩) সত্য (ট্রুথ)।

সত্যকে প্রকাশ করার জন্য নানা প্রসঙ্গ প্রতীকের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা হল।

এই ধারণায় সংগীত ও অন্যান্য শিল্পেরও উপলব্ধি ঘটান সম্ভব। তবে অর্থ সম্বন্ধে সচেতনতা প্রয়োজন। শব্দ যেমন নাম ও রূপের অর্থ বহন করে, তেমনই সংগীতও স্বর ও রূপের অর্থ নিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু অর্থের মধ্যেও থাকে অর্থান্তর। সেই অন্য অর্থই অনুভব (ফিলিং) এবং ইচ্ছাশক্তি (ভোলিনন্) দ্বারা বুঝতে হবে এবং তাহলেই শিল্পের প্রকৃত উদ্দেশ্য (মোটিভ) লোকসমক্ষে অনায়াসেই চিহ্নিত হয়ে ওঠে। যেমন বাদীস্বর ও বিবাদীস্বর বারংবার গ্রহণ এবং বর্জনের দ্বারা প্রকৃত সুরের রূপ রচিত হয় তেমনই অগডেন দেখিয়েছেন অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে চিন্তার আদানপ্রদান (কমিউনিকেশন্) প্রতীকের মাধ্যমে, ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায়।

তাই সুসেনল্যাঙ্গার বলেছেন,

'ওয়ার্ক অফ আর্ট এ মেটাফিজিক্যাল সিম্বল' অর্থাৎ শিল্পে ব্যবহৃত হয় রূপক বা অলংকার। কিন্তু দৃশ্যগত শিল্পে ব্যবহৃত হয় প্রাকৃতিক রূপক। সাহিত্যে সর্বাপেক্ষা প্রচলিত প্রতীক ব্যবহৃত হয়। অভ্যাসের দ্বারাই আমরা তার সঙ্গে পরিচিত হই। সংগীতে কোনও প্রতীক ব্যবহার হয়তো হয় কিন্তু সংগীত নিজেই হল পূর্ণতার প্রতীক। প্রথমে ভাষা, তারপর কাব্য তারও পরে সংগীত। শব্দ যখন বিভিন্ন অলংকারে ভূষিত হয়ে এক বা একাধিক ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে তখন শব্দ সমূহের লিখনে বা উচ্চারণে আকার ইঙ্গিত (জেসচার্) আনুষঙ্গিকরূপে দেখা দেয় এবং অর্থের জট খুলে ধরে এবং 'সত্যের আদানপ্রদান' সুষ্ঠুরূপে দেখা দেয়। যেমন,

১। গঙ্গাতীরে ভ্রমণের উপকারিতা আছে।
২। গঙ্গালাভ অদৃষ্টের লিখন।
৩। 'অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনেও নিঃশব্দে নীরবে ও গঙ্গা তুমি বইছ কেন?'
৪। ভাগের মা গঙ্গা পায় না।

এখানে সাধারণ ভাষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই অর্থবোধে সক্ষম। এই অর্থগুলিরও জন্ম হয়েছে অতীত অভিজ্ঞতার সূতিকাগার থেকে যা বর্তমানেও প্রশস্তরূপে উক্ত হয়ে থাকে। প্রথম বাক্যটিতে উপকারিতা শব্দটির মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের লাভকেই তুলে ধরা হয়েছে। ভ্রমণের জন্যও, মুক্ত বায়ু সেবনের জন্যও, চক্ষুর তৃপ্তি সাধনের জন্য, মনকে বিশ্রাম দানের জন্যও যেকোনও লাভই

হতে পারে। আবার গঙ্গালাভ যেমন মৃত্যুরই প্রতীক শব্দ, তেমনি অদৃষ্ট শব্দটিও ভাল বা মন্দের সঙ্গে জড়িত।

তৃতীয় বাক্যে গঙ্গা চিরকালীন সাক্ষীর প্রতীক রূপে চিহ্নিত, দেবদেবীরূপেও চিহ্নিত।

চতুর্থ বাক্যেও গঙ্গা মৃত্যুর প্রতীক কিন্তু অন্য ভাবে। এখানে গঙ্গা মূলতঃ আশ্রয়স্থলরূপে চিহ্নিত। শব্দের আদান প্রদানের মধ্যে যেভাব ও সংকেতগুলি ঐশ্বরিক সেইগুলিই সংগীত ও অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে বরণীয়।

শ্রীসুকুমার সেন 'চর্যা' শব্দের অর্থ সম্পর্কে বলেছেন 'আধ্যাত্মিক'। চর্যাগীতিতে জন্ম মৃত্যু আনন্দ বেদনা হতে অব্যাহতি পাওয়ার পথ, সহজ অবস্থায় মহাসুখ নিবাসে পৌঁছবার ঠিকানা আছে, পরমার্থ উপলব্ধির জন্য গুরু প্রদর্শিত পথের নির্দেশ আছে। কতকগুলি চর্যাগীতিতে তত্ত্ব উপদেশ সাধনার ইঙ্গিত সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখা হয়েছে বাহ্য অর্থের ঢাকনায়।

এ ধরনের চর্যায় এমন সব শব্দ ও উপমা উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করা হয়েছে যার দুটি অর্থ, একটি সাধারণের জানা, অপর অর্থ চর্যাকর্তাদের সাধনার অন্তর্গত।

এ ভাষার নামও 'সন্ধ্যাভাষা' যদিও এর আদি নাম অবহট্‌ঠ। চর্যাপদের প্রকৃত আবিষ্কার কর্তা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই সন্ধ্যাভাষা প্রসঙ্গে বলেছেন,

'আলো আঁধারি ভাষা কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায় খানিক বুঝা যায় না।'

কিন্তু সুকুমার সেন এর মধ্যে আলো আঁধারী সম্পর্ক দেখাননি জানিয়েছেন "যে ভাষায় বা শব্দে অভীষ্ট অর্থ অনুধ্যান করিয়া অর্থাৎ মর্মজ্ঞ হইয়া বুঝিতে হয় অথবা যে ভাষায় শব্দের অর্থ বিশেষভাবে নির্দিষ্ট তাহাই সন্ধ্যাভাষা।"

লৌকিক অর্থ	মূলশব্দ	সন্ধ্যাঅর্থ
ডোমনী	ডোম্বী	শুক্রনাভিকা
নৌকা	নৌকা	মহাসুখকার
বড়ে	বড়িআ	একশত যাট প্রকৃতি
বিষ্ণু	হরি	মূত্রনাড়ী
শিব	হর	শুক্রনাড়ী[২৬]

এই চর্যাকর্তারা ছিলেন বৌদ্ধ তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্য। অথচ বৌদ্ধদর্শন কিন্তু এঁদের আলোচনার মূল ক্ষেত্র ছিল না।

চর্যাশব্দেরও মূল অর্থে পাওয়া যায় আচরণ ব্যবহার যেমন তপস্বীর আচরণ ও

নটের আচরণ। এঁরা যেন বর্তমান যুগের ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাধারায় এক বিশেষ শ্রেণীর আচরণবাদী (বিহেভিয়ারিস্ট)। ঈশ্বরের ধ্যানধারণায় মাতোয়ারা। এই চর্যাগীতির প্রভাব দেখিয়েছেন পণ্ডিতেরা পরবর্তীকালে জয়দেবের গানে, বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে। চর্যাগীতির অবলম্বন সেই সময়ের উৎসব, অবসর বিনোদন, দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখ। তার মধ্য দিয়েই অধ্যাত্ম সাধনা যা বর্তমান যুগেও বাউল, দরবেশ সম্প্রদায়ের গায়কেরা তথা ভক্তেরা গেয়ে থাকেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন চর্যাগীতিগুলি সবই বৌদ্ধ মতে। কিন্তু সুকুমার সেন চর্যাগীতির মধ্যে সাধক গোষ্ঠীর সন্ধান না পেয়ে নিতান্ত 'সহজ' একটি যোগপন্থারূপে তুলে ধরেছেন।

সি. কে. অগডেন ও আই. এ. রিচার্ড তাঁদের মিনিং অব্ মিনিং গ্রন্থে বলেছেন বৌদ্ধেরা আত্মাকে সোল বলেছেন। কিন্তু এই শব্দটির আরও বহু নাম ব্যবহৃত হয়। যেমন সত্ত্বা 'বিং', 'আত্মা', 'সেল্ফ্', 'লিভিং প্রিন্সিপল্' অথবা 'পারসন'। শব্দ যে স্তরে ব্রহ্ম সেখানেই সত্য, বাস্তব জীবনেও অগডেনের মতে শব্দের অমোঘ শক্তি আমাদের জীবনে সর্বাপেক্ষা সংরক্ষণকারী (কনসাবভেটিভ) শক্তি। তাই ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের সর্বএই পবিত্র 'ওঁ' ধ্বনির নীতি অনুসৃত। তাই শব্দকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে এই তন্ত্র সংগীত।

হিন্দু তন্ত্র সাধনার উপর বৌদ্ধদের বজ্রযান প্রভাব দুইভাবে দেখিয়েছেন শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য। প্রথম ক্ষেত্রে তাঁর মতে বৌদ্ধ ও জৈন মহাবীরদের আগমনের বহু পূর্বেই হিন্দুরা দেবদেবীর পূজা করত। হিন্দুদের দেবদেবীর আবাধনা বৌদ্ধেরা গ্রহণ করলেও, বৌদ্ধেরা কালক্রমে তন্ত্রমতের প্রতিষ্ঠা করে তুলল, যার প্রভাবে সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্তিত হল হিন্দুশাস্ত্র। সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রই মিস্টিক অথবা একটি গুপ্তবিদ্যার আশ্রয়রূপে দেখা গেল, এবং সাধনমার্গে পৌঁছনর অন্যতম পথ হিসাবে স্বীকৃত হল 'হঠযোগ', বর্তমান কালে হিন্দু সমাজে যে শক্তিসাধনা প্রচলিত, কালী তারা এমনকি সরস্বতী সবই পৌরাণিক নাম নয় এবং বুদ্ধ তন্ত্রানুসারে অনুসৃত মূর্তির পরিকল্পনাও 'গান্ধার মত' হতেই সৃষ্ট।[১৭]

কিন্তু বুদ্ধকে অবলম্বন করে যেমন রচিত হয়েছে সন্ধ্যাভাষা সম্বলিত চর্যাগীতি। তেমনই সাঁচী স্তূপ, ভরহুট-এর স্তূপ, বৌদ্ধগুহা ইত্যাদি অপরূপ শিল্প সৃষ্টিগুলিও বুদ্ধকে অবলম্বন করেই। এর মধ্যে বুদ্ধদেবের যে চিত্র বা ভাস্কর্য আমরা দেখে থাকি, সেই সব ছবিতেও আছে ভাষার মধ্যে আভাস যা বোঝবার জন্য সময় এবং শিক্ষার প্রয়োজন। বুদ্ধের হস্তে পদে যে মুদ্রা আমরা দেখে থাকি

সেগুলির অর্থ আছে। কিন্তু মুদ্রাগুলি লুপ্ত হয়ে যায়নি, তা আজও প্রচলিত। বৌদ্ধদের উপর গ্রীক সভ্যতার প্রভাব গান্ধার মত প্রতিষ্ঠার অনুকূল হয়ে দাঁড়াল, ফলে সেই সময়ই প্রস্তর হতে মূর্তি রচিত হতে থাকল এবং অপরূপ ভাস্কর্যের উপস্থাপনা তখনই।

ধ্যানী বুদ্ধের পরিকল্পনা থেকেই বিভিন্ন তান্ত্রিক অন্যান্য মূর্তির ধ্যান ধারণা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করলেন, গুহ্য সমাজের গুরুরা বুদ্ধদেবের বাণী সংগীতের আকারে পরিবেশন করতে লাগলেন। সিদ্ধাচার্য ও বজ্রাচার্যেরা প্রাধান্য বিস্তার করতে লাগলেন দশম শতাব্দী পর্যন্ত। তাঁদের গানে শব্দই প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ সুর ছাড়া এই শব্দগুলি এত অনাকর্ষণীয় যে তা মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হত না। এখানেই সংগীতের জাগতিক আবেদন স্বীকৃত হয়ে যায়। কারণ রিবট যেমন বলেছেন যে, সংগীতের ক্ষেত্রে প্রতীকরূপী শব্দ তখন আর নিজস্ব কোনও চিহ্ন ধারণ করে না, ধ্বনিরূপে প্রকাশিত হয়। সেইগুলিই সাংগীতিক সংকেত এবং ভাবপ্রবণ মানসিকতার কার্যে ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে। কবিতা যখন সংগীতের ভাষা হল তখনই ভাবপ্রবণ ও স্পর্শকাতর ব্যক্তিমাত্রেই অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলেন। এরপরই সার্থক গায়ক মাত্রেই সুরের জাল বুনতে সক্ষম হলেন এবং শ্রোতারাও অবাক হয়ে শুনতে লাগলেন। এই ভাবাবেগকেই (ইমোশন্) বলা হয়। কবি ইয়েট্স বলেন অশরীরী শক্তি, (ডিসএম বডিড্ পাওয়ার) যার পদধ্বনি অন্তঃকরণে বেজে ওঠে কিন্তু চিহ্নের স্বরূপকে যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে।

যে কবিতা সংগীতমুখী তার ঈপ্সিত বিষয়ের (রেফারেন্ট্) বহুমুখীন হওয়াই স্বাভাবিক, যেমন একই গানে দেবদেবীর নাম গান, সুখ দুঃখের বেদনা প্রকাশ, সুরের ক্রিয়াকৌশল প্রভৃতি বিভিন্ন দিক যার সম্বন্ধে হয়তো শিল্পী সচেতন হলেন না কিন্তু শ্রোতার কানে বিভিন্নরূপে ধরা দিল।

যে কবিতার ঈপ্সিত বিষয় একটি, অনেক ক্ষেত্রেই সে কবিতার প্রভাব সার্থকরূপে দেখানোর জন্য কিছু প্রতীক কিছু অলংকারের প্রয়োজন হয়।

এইভাবে মানুষের ক্রিয়াকলাপ যা তত্ত্বরূপেও প্রতিভাত হয় না আবার ব্যবহারিক দিকেও তাৎপর্য থাকে না কিন্তু প্রতীক ধর্মীয়তার লক্ষণাক্রান্ত তখন সেই ক্রিয়াটিকেই অ্যাস্থেটিক আখ্যায় ভূষিত করা যায় যা আমরা জানবার জন্যে আগ্রহান্বিত হই অথবা ওরই বিকল্পরূপে অন্য কিছু পরিবর্তিতরূপে পাবার জন্য আগ্রহান্বিত হই তাই সুন্দর।[২৮] কেননা বিউটি, ট্রুথ এগুলি কোনও একক অর্থে বুঝায় না, পরস্পর অপৃথক যোগ্য বিপরীত প্রতীক সমূহের উপর্যপুরি সমাবেশ

মাত্র। এক্ষেত্রে ভাল ভাল শব্দের ও কথার ফুলঝুরি প্রকৃত অবস্থা ও অর্থ বুঝাতে সর্বদা সক্ষম হয় না, তাছাড়া অনেক শব্দ অনেক ক্ষেত্রেই একই অর্থে প্রযুক্ত হয়ে থাকে।[২৯] এদের বিশুদ্ধ রূপ প্রয়োজন।

ম্যাক্সমূলার বলেছেন, আমি বিশ্বাস করি মানসিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উপকার হয় যদি সমস্ত শব্দগুলি যেমন ভাবনা, চেতনা, আত্মা ইত্যাদি সমাজ থেকে বাজেয়াপ্ত করে দেওয়া হয়। এবং পুনরায় প্রবেশে তাদের কোনও দিনই অনুমতি দেওয়া হবে না যতদিন পর্যন্ত না শব্দগুলির উপযুক্ত বিশুদ্ধরূপ পাওয়া যায়।[৩০] এই দ্বন্দ্বমূলক শব্দ সম্পর্কেই ম্যাথিউ আর্নল্ড বলেন যে শব্দগুলি বক্তার মুখনিঃসৃত সেগুলি সবই যে বক্তার বিষয়কে সবদিক দিয়ে পরিস্ফুট করতে সক্ষম হয় তা নয়, আবার সর্বদাই বক্তা যে সচেতন ভাবে উচ্চারণ করেন তাও নয়।[৩১] শব্দ দ্বন্দ্বমূলক হওয়ার জন্য একই শব্দ কখনও প্রতীকরূপে, কখনও অলংকার রূপে কখনও সোজা ভাষায় ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলি সুস্পষ্ট অর্থ ব্যক্ত করণে অক্ষম।

যেমন 'সুন্দর' শব্দটি সি. কে. অগডেন বহু অর্থে প্রকাশ করে বুঝাতে চেয়েছেন। সত্য, প্রকৃতির আত্মা, আদর্শ, সার্বজনীন ক্ষেত্র ইত্যাদি বোঝা যেতে পারে। বলেছেন সৌন্দর্য তত্ত্ব আলোচনায় শিল্প বিচারের মধ্যে সুন্দরের অস্তিত্ব। (অ্যাস্থেটিক ইজ্ দি স্টাডি অব্ বিউটিফুল অর্ আর্ট)। অর্থ (মিনিং) শব্দের ব্যাখ্যাও অনেক। বৌদ্ধ তন্ত্রে গুহ্য অর্থেই সুন্দর বিষয়বস্তুর প্রকাশ চিন্তা করা হত, ব্যবহারিক অর্থে নয়, ভিন্ন অর্থেও নয় এবং এই গুহ্য অর্থটি গুরুর নিকট হতে শিক্ষণীয় ছিল, সিদ্ধাচার্যদের এক্তিয়ারে মহাসুখবাদ।

বর্তমান কালে রাসেল বলেন, শব্দের অর্থের সমস্যা আজকাল ভাবনা প্রকাশের অর্থের দৈন্যে পরিণত হয়েছে।[৩২]

সিগ্‌উইকের ভাষায় অর্থ নির্ভর করে ঘটনাবলীর উপর এবং সত্য নির্ভর করে অর্থের উপর। অর্থাৎ অর্থ তখনই বোধগম্য হয় যখন বিশেষ অনুভূতিসমূহ কোনও পরিচিত বস্তুর গুণসমূহকে অভিজ্ঞতার মারফৎ গ্রহণযোগ্য করে থাকে। এক্ষেত্রে অর্থ হয় সুপ্রকাশিত, অর্থের সঙ্গে পরিবেশের সংযোগ থাকলে জটিলতা বৃদ্ধি করে, কিন্তু প্রকৃত অর্থ বোধের দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে যায়।

সি. কে. অগডেন এখানেও একটি বিরাট তালিকা সহযোগে বুঝাতে প্রয়াসী হয়েছেন, প্রকৃত অর্থ বার করার জন্য 'ক্রিয়া'র পথ ধরে অগ্রসর হতে হয়।

যেমন উদ্দেশ্য (ইনটেনশন্), মূল্যবোধ (ভ্যালু), উদ্দিষ্ট বস্তু (রেফারেন্ট), আবেগ (ইমোশন্) শব্দসমূহ মূলতঃ একই অর্থের বিভিন্ন প্রতিশব্দ বা প্রতীক

বিশেষ করে শিল্পকলার সৌন্দর্য বিচারে।

তেমনই ইচ্ছা (উইশেস্), সংকল্প (ভোলিশন্) এ দুটির একই অর্থ হলেও এগুলি মানসিক ক্রিয়া এবং ব্যক্তিগত। যেমন বেকার সমস্যা, যুদ্ধ, পাপ, পুণ্য এই কথাগুলির অর্থ বিচার করতে গেলে পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। বেকার সমস্যা একটি সামাজিক অবস্থার ফল, যুদ্ধ তেমনই রাজনৈতিক ঘটনা, পাপ পুণ্যের বিচার মাত্রাভিত্তিক ও নিতান্তই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। তেমন ভগবান, প্রেম, স্বাধীনতা শব্দগুলি অনুভূতির ক্ষেত্রে বিস্তারিত এবং এর অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজে পাওয়ার জন্য এই শব্দগুলির বিস্তার ঘটান যায় অনেক, যার দ্বাবা অনেক নূতন শব্দের ব্যবহার ঘটবে, এবং তার অর্থ পরিস্ফুট করার জন্য প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে চিহ্ন ব্যবহারের, মর্মোদ্ধার করার সময় দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে সেই সব চিহ্ন হয়ে ওঠে প্রকৃত অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে অস্পষ্ট বা ভ্রান্ত, বা অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তির অনুভব রূপেও দেখা দিতে পারে। কিন্তু 'প্রতীক' এর আশ্রয় গ্রহণ করলে, শব্দের গুণ, তুলনামূলক বিচার, সংখ্যা, ক্রিয়া তুলে ধরা যায়, কেননা প্রজ্ঞার সঙ্গে প্রতীক অঙ্গাঙ্গীভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে। প্রতীক গ্রহণের সময়ে সর্বদাই খেয়াল রাখতে হবে, শিল্পের প্রাণ প্রতিষ্ঠায় প্রতীক কি পরিমাণে কার্যকরী হতে পারে। কেননা সংস্কৃতির সঙ্গে তাল মিলাতে গেলে, বুদ্ধের কোনও প্রতীক সর্বজাগতিক কিনা বুঝে নেওয়া দরকার। কোনও বিধিবদ্ধ (ইনস্টিটিউশনাল্) রীতি তুলে ধরলেও দেখাতে হয় তার ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ, তার জন্মলগ্নের ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ যে সংগীত পরিবেশনরীতি প্রতিষ্ঠায় উন্মুখ ছিলেন, তার ভিত্তির মূল ছিল পুরাতনের গানে। রবীন্দ্রনাথের ইনস্টিটিউশনালিজম্ তাই সর্বকালে ও দেশে আদৃত হতে পারে। তাই সৃষ্টিকর্মে জীবন নিঙড়ে কিছু বার করার থেকে জীবনে যা প্রচলিত তাকে তুলে ধরার চেষ্টাতে ঐক্য গড়ার চেষ্টাও সার্থক হবে। মানুষ দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণ করবে ভাললাগা অংশ। জীবনমরণের সঙ্গী অন্বেষণে আত্মমুখী হবে। তাই বিশ্বজনীন ক্রিয়াসমূহই গ্রহণ করতে হবে। অনেকক্ষেত্রে প্রতীক এবং প্রজ্ঞাকে সর্বদা বুদ্ধি বা পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। এই কথাটি শ্রীঅরবিন্দ কবিতা প্রসঙ্গে বলেছেন।

উদাহরণস্বরূপ দেখা যায় অনেক বুদ্ধি গ্রাহ্য ভাবনা আমরা বুদ্ধি দ্বারা বুঝতে পারি এবং নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় বাঁধতে পারি কিন্তু অতীন্দ্রিয় ভাবনা বুদ্ধিকে অতিক্রম করে আমাদের নিকট আসে এবং চিনবার জন্য অনুরোধ জানায় তার সমগ্রকে নিয়ে। তেমন ভাবেই আবেগও, কেবলমাত্র সেই আবেগই নয় যা কবি অন্বেষণ করছেন। কিন্তু আবেগের আত্মা যার আলোয় আমাদের আত্মা

আলোকিত হয় কবিতার শব্দও সেই আবেগের দ্বারস্থ হয়। সব মিলিয়ে আমাদের মনে এক আবেগপূর্ণ অভিজ্ঞতার জন্ম হয় যা সাধারণ বুদ্ধিগ্রাহ্য অবস্থার মধ্যে ধরা দেয় না।[৩৩] অর্থাৎ বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না এই শিল্পও পৃথিবীতে সৃষ্টি হচ্ছে। শিল্প ছাড়াও অনেক ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে যা বুদ্ধির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। কিন্তু শিল্পী কেন সেই শিল্প সৃষ্টি করছেন যা বুদ্ধির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না অর্থাৎ তিনি অতীন্দ্রিয় লোকের চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন। সাধারণ মানুষও সেই চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হবে কয়েক যুগ পরে যা আগেই আলোচিত হয়েছে এবং নানা ভাবে প্রমাণিত হয়েছে অর্থাৎ আমরা প্রত্যেকেই সেই অতীন্দ্রিয় লোকের দিকেই অগ্রসর হচ্ছি কিন্তু শিল্পীরা সাধারণ মানুষের থেকে আরও অগ্রসর, তাই তারাশঙ্কর, রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকেই শেষ বয়সে ছবির মধ্য দিয়ে কিছু বলতে চান যা তাঁরা লেখার মধ্য দিয়ে বলতে পারেননি। অরবিন্দ তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে সেই লোকের কথাই ব্যক্ত করতে চান যা সাধারণ মানুষ বুঝতে সক্ষম হয় না। তাই প্রকৃত শিল্পের বিচার হয় শতবর্ষ পরে। শিল্পে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী এবং ব্যঞ্জনাই প্রকৃত শিল্প সৃষ্টি করে অর্থাৎ এর দ্বারাই অতীন্দ্রিয় লোককে শিল্পী পরিচিত জগতে আনবার প্রয়াস করেন। সে ব্যঞ্জনা বুদ্ধিগ্রাহ্য মন হিসাব করে ব্যবহার করে না, তাই ব্যঞ্জনা ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতি এক হয়ে যায় তাই বলা হয় শিল্পের মধ্য দিয়ে মানুষ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে। এর কারণ আর কিছুই নয় মানুষ অতীন্দ্রিয়কে উপলব্ধি করে অর্থাৎ মানুষের চেতনা উন্নতস্তরে বিচরণ করে তখন। তাই ত সংগীত সর্বার্থ সাধক রূপে দেখা দেয়।

উড়ন্ত বলাকার সারি দেখে রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। এর অর্থই হল উড়ন্ত বলাকা আকাশের বুকে এক অবিস্মরণীয় সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলেছিল যা সকলের চোখে পড়ে না কিন্তু রামকৃষ্ণের চোখে তা অসীম ব্যঞ্জনামণ্ডিত হয়ে দেখা দিল। তাঁর চেতনা প্রভাবিত হল। ফলে তাঁর মন অতীন্দ্রিয় লোকে বিচরণ করতে লাগল। ফলে সেই মুহূর্তে ইহজগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না।

কাব্য আর সংগীতের সঙ্গে তাই পার্থক্য আছে। কাব্যে ধ্বনি আছে, রস আছে ভাব আছে ছন্দ আছে। তথাপি কাব্য যদি সংগীতে রূপান্তরিত হয় তবে তা এক মুহূর্তে মানুষের মনকে আকর্ষণ করে। আবার সংগীত যদি অল্প কয়েক মুহূর্তের জন্যও আনন্দ দিতে সক্ষম হয় তবে বুঝতে হবে সেই মুহূর্তে শ্রোতার মন ইহজগতে থাকে না তার চেতনার স্তর উন্নত হয়, মহাকালের সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হয়।

কাব্যপাঠেও আনন্দলাভ হয়, আনন্দ একটি ভাব, ভাব জাগ্রত হচ্ছে রসের দ্বারা।

ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্ত সেই রসেরই ব্যাখ্যা করেছেন, "রস হইতেছে বিভাবাদিজনিত ভাবময় চিত্তে স্বরূপ সংবিদানন্দের প্রকাশ, বিভাবাদি বা তজ্জনিত ভাবকে অবলম্বন করিয়া এমন একটি সত্তার প্রকাশ যাহা বিভাবাদি হইতে পৃথক এবং তাহাদের আশ্রয়স্থল চিত্ত হইতে উর্ধ্বে বর্তমান।"[৩৪]

এর অর্থই হল আনন্দ যখনই মানুষের মনে সঞ্চারিত হয় তখনই তার ঈশ্বর উপলব্ধি বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি হয়।

নবম শতকের পূর্বে সংগীত শাস্ত্রকাররা অতীতের শাস্ত্রালোচনায় কেবল দেখেছিলেন গুণ, অলংকার রীতি বা বক্রতা ধর্মগুলি কেননা এইগুলিকেই শাস্ত্রে কাব্যের আত্মা বলা হত। সেইজন্য সংগীতকেও নাট্যশাস্ত্রসমূহের সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত করবার জন্য গুণমণ্ডিত, অলংকৃত রীতিসম্মত রূপে প্রকাশ করবার জন্য চেষ্টা করা হত। আনন্দবর্ধনই কাব্যের ধ্বনিতত্ত্ব প্রথম আলোচনা করলেন। অভিনব গুপ্ত, লোচনঠাকুর এঁরা আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোক ভুক্ত ধ্বনিতত্ত্ব এবং রসধ্বনির প্রাধান্য ব্যাখ্যা করে তুলে ধরলেন। সাহিত্যতত্ত্ব কেমনভাবে সৌন্দর্যানুভূতি প্রকাশ করে এবং জনসাধারণের মনে রসসৃষ্টির করে তা জানালেন। পাশ্চাত্যে যেটি অধুনাস্বীকৃত অভিব্যক্তিবাদ (একসপ্রেশনিজম্) তার মূল কথা ভরতের রসসূত্রে রয়েছে এবং অভিনবগুপ্ত সেটি 'অভিব্যক্তিবাদ' রূপে প্রকাশিত করে গিয়েছেন। বর্তমানকালে শিল্প ও তৎসহ রসিক, দ্রষ্টা বা শ্রোতার অনুভবগুলি সমস্তরের হওয়া প্রয়োজন এটাই স্বীকৃত হয়েছে। শিল্পী ও জনসাধারণ একই প্রকারে আনন্দানুভব করবেন যার মধ্য দিয়েই শিল্পের সার্থকতা। এই সত্য দর্শনি বস্তুধ্বনি, অলংকার ধ্বনি ও রসধ্বনির মধ্যে এবং রসধ্বনির মধ্যে সেকাল ধ্বনির নয় এই তত্ত্বও আবিষ্কার করেছেন ভারতীয় দার্শনিক।

সংগীতের ক্ষেত্রে কাব্যাংশ যতই মুখ্যস্থল অধিকার করতে থাকে, বিবর্তনের স্রোতও তখন দ্রুত হতে থাকে এবং এই কারণেই সংগীত রচয়িতারা প্রয়োজনের নিমিত্তই সমাজ হতে দেশীয় ভাব, রস প্রভৃতি সংগ্রহ করে তুলতে এগিয়ে দাঁড়ালেন এবং শেষে মুসলিম ভাষা সংস্কৃতির দিকেও ঝোঁক দেখা গেল। ভক্তিবাদীরা সুফীমত ও মুসলিম সংস্কৃতির বাদে যে দৃঢ় সমন্বয় গড়ে তুলতে অগ্রসর হয়েছিল তার সার্থকতা বৈষ্ণব কবি গায়ক মহলে সম্প্রসারিত হলেও

সর্বত্র হল না। তবু সংগীত তার মহত্তর আসন প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হল ধীরে ধীরে।

সৌন্দর্য উপলব্ধির মূলে শিল্প লোকোত্তর হওয়া প্রয়োজন। যেমন কাব্যের ক্ষেত্রে স্বীকৃত জ্ঞানের দ্বারা কাব্যোপলব্ধি হয় না। ব্যঞ্জনার উপলব্ধি না ঘটলে কাব্যকে উপলব্ধি করা যায় না। সেই রকম সংগীতেও যাঁরা শুধু অর্থ নিয়ে মাতামাতি করেন তাঁরা সংগীতের মূল অর্থ অনুধাবনে অসমর্থ হন।

এই বক্তব্যই শ্লোকে উল্লিখিত।

"স্বর তদন্তরালোভয় ভেদ কল্পিতা দ্বাবিংশতি বিধা।
আদিশব্দেন জাত্যবংশক গ্রাম রাগ ভাষা বিভাষান্তর ভাষা
দেশী মার্গা গৃহ্যন্তে।
প্রকৃষ্টং গীতং গানং যেষাংতে প্রগীতাঃ
গাঢ় বা প্রারব্ধা ইত্যাদি কর্মানি ক্তঃ
প্রারম্ভেন চাত্র ফল পর্যন্ত তা লক্ষ্যতে।"

শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় রচিত কাব্যের মধ্যেও কিছু গুণীভূত কাব্যকে শুধু অলংকারের চমৎকারিত্বের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থান দেওয়া হয়েছিল। আর এক শ্রেণীর কাব্য প্রকাশ পেল ধ্বনি কাব্যরূপে। এই গুণীভূত কাব্য বা ধ্বনি কাব্যই বস্তুত ভক্তিরসের প্রাধান্য সৃষ্টি করল এবং সংগীত জগতে যুগান্তর সৃষ্টি করল।

শ্রীঅভিনব গুপ্ত বলেছেন বাচক শব্দ, বাচ্য অর্থ, প্রতীয়মান অর্থ বা ব্যঙ্গার্থ এবং ব্যঞ্জনা এই চার প্রকারের ধ্বনিই সিদ্ধ।

আর একটি শ্লোকে আনন্দবর্ধন জানালেন 'ভক্ত্যা বিভর্ত্তি নৈকত্বং রূপ ভেদোদয়ং ধ্বনিঃ' অর্থাৎ রূপভেদ বশতঃ ভক্তি ও ধ্বনি এক নয়। যেখানে বাচ্য ও বাচকের সাহায্যে বাচ্যাতিরিক্ত অর্থের প্রতীতি ঘটে এবং বাক্যের তাৎপর্য এই প্রতীয়মান অর্থে থাকে এবং তার জন্যই এর প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় সেইটি ধ্বনির ক্ষেত্র। ভক্তি একটি উপচার মাত্র। এর কারণে আনন্দবর্ধন জানিয়েছেন ভক্তির মধ্যে অতি ব্যাপ্তি দোষ রয়েছে। তাই অনেক ক্ষেত্রে শ্যামাসংগীত ভক্তি জাগায় না, কিন্তু আধুনিক গানের ব্যঞ্জনা মনকে মুগ্ধ করে জাগতিক স্তরের উর্ধ্বে মনকে প্রেরিত করে।

অভিনব গুপ্ত লোচনটীকায় আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন,

"কাব্যের রসাস্বাদ আলৌকিক ও চমৎকারাত্মক।" লৌকিক স্মরণ ও অনুমানের দ্বারা এর আস্বাদন সম্ভব হয় না। বিভাব হল পূর্ণ রসাস্বাদের অঙ্কুর

এবং তন্ময় ভাবনার প্রাণ। বাক, অঙ্গ ও সত্ত্বকৃত অভিনয় অনুভব করায় বলে এর নাম অনুভাব। বিভাব হল ব্যঞ্জনার উপযোগী উপাদান। সহৃদয় শ্রোতা বা দর্শকের হৃদয় ব্যতীত অন্যত্র এর অস্তিত্ব না থাকায় এ অলৌকিক। কাজেই ভক্তি, প্রেম সবই উপলক্ষ্য। ধ্বনির লক্ষণ স্বরূপ ভক্তি যে রস সৃষ্টিতে সক্ষম, সেটি ভক্তি রস। অর্থাৎ ভক্তি ও ধ্বনি একাত্ম হয়ে দেখা দেয়।

মধ্যযুগে ভক্তিবাদ সংগীতের মাধ্যমে যে পথটিতে অগ্রসর হল সেখানেই প্রমাণিত হল সংগীত কাব্য হতে অতিরিক্ত কিছু। সংগীতের মাধুর্যে ভক্তিরস এমন ভাবে প্রাণ পেল যে তার স্থান হল চারুতত্ত্বে। সংগীত কাব্যের প্রতীয়মান অর্থ প্রকাশ করল অর্থাৎ অর্থের অতিরিক্ত ব্যুৎপত্তি ব্যঞ্জনার দ্বারা ব্যক্ত করে সংগীত ও ব্যঞ্জনা একাত্ম হয়ে গেল।

যেমন,

"একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়।
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত সাগর ময় ॥
সন্তান যার তিব্বত চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ,
তুই কিনা মাগো তাদের জননী, তুই কিনা মাগো তাদের দেশ।"

এই সংগীতে যে রসটি পরিবেশিত হল সেটি ওজঃগুণসম্পন্ন বীররস। অন্তর্নিহিত অর্থে হতাশা বেদনার মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে সেই আশা যা জাতিকে উন্নততর জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান,

"অবুঝ শিশু মায়ের ঘরে
সহজ মনে বিহার করে
অভিমানী জ্ঞানী তোমার বাহির দ্বারে ঠেকে এসে।"

দুটি লাইনের মধ্যে অনেক না বলা বাণী লুকিয়ে আছে। তার তাৎপর্য গ্রহণ করতে পারলে গানটি প্রাণ পাবে। এখানে শিশুর সঙ্গে আপামর জনসাধারণের তুলনা করা হচ্ছে।

আর একটি গান যেমন,

"সম শৈল কুল মান দূর করি
তব চরণে শরণাগতা কিশোরী
আমি শরণ নিলাম, ঐ চরণে
আমার তৃষিত প্রাণ জুড়াইতে
শরণ নিলাম ॥ "গোবিন্দদাস"

এই লাইনগুলি ব্যঞ্জনামণ্ডিত হয়ে শ্রোতার কর্ণে আসল রূপটি উদ্‌ঘাটিত করে, যখন বার বার করে আখর সংযুক্ত হয়ে গীত হয়।

"হৃদি বৃন্দাবনে বাস কর যদি, হে কমলাপতি
ওহে, ভক্তি প্রিয়! আমার ভক্তি হবে রাধা সতী।
হৃদে কামনা আমারি, হবে বৃন্দে গোপনারী
আমার দেহ হবে নন্দের সুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী
(পাঁচালীকার দাশরথী রায়)

কথা অতি সাধারণ। সুরের মাধ্যমে এই গান যুগ যুগ ধরে আনন্দদানে সক্ষম। অর্থাৎ কাব্যাংশ সুরের দ্বারা ব্যঞ্জনামণ্ডিত হচ্ছে। আনন্দ দান করছে। তাই যুগ অতিবাহিত হলেও গান থেমে যায় না। কারণ আনন্দ দান করে গান মানুষের অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে জাগ্রত করছে। মানুষকে মহাকালের গতির সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করে দেবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। তখন ব্যঞ্জনা, সংগীত, অপূর্ব ইন্দ্রিয়ানুভূতি (এক্সট্রা সেরিব্রাল পারসেপশন্) সব এক হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ রস বাচ্যকে অতিক্রম করে অলংকারকে গুণীভূত করে ধ্বনিতে বিশ্রাম লাভ করে, কাব্যে আনে পরম আস্বাদন।

রবীন্দ্রনাথ তাই অনুভব করেছেন,

"গুণ গুণ করিতে করিতে যখনই একটী লাইন লিখিলাম, তোমার গোপন কথাটি সখী রেখো না মনে তখনই দেখিলাম
সুর যে জায়গায় কথাটা উড়াইয়া লইয়া গেল, কথা আপনি সেখানে পায়ে হাঁটিয়া গিয়া পৌঁছিতে পারিত না। তখন মনে হইতে লাগিল আমি যে গোপন কথাটা শুনিবার জন্য সাধাসাধি করিতেছি তাহা যেন সমস্ত জল স্থল আকাশের নিগূঢ় গোপন কথা।"

তাই আরেক জায়গায় বলেছেন 'গান নিজের ঐশ্বর্যেই বড়.কাব্যের দাসত্ব সে কেন করিতে যাইবে।'

"অনুভব সিদ্ধ সেই সেই রসাদি স্বরূপ অর্থটির অপলাপ করা যায় না বলিয়া, উহা সেই সেই শব্দ প্রকৃতির অন্বয় ব্যতিরেকের অনুসরণ করে বলিয়া, উহা অনুমানাদি প্রমাণের সাহায্যে জানা যায় না বলিয়া উহার একটি চতুর্থ বৃত্তিকে স্বীকার করিতেই হইবে। এই বৃত্তির নাম ব্যঞ্জনাবৃত্তি। ইহা ব্যাপ্তি প্রভৃতির অপেক্ষা না রাখিয়াই হয়। আবার রসাভিব্যক্তির ক্ষেত্রে অপরে ইহাকে রসনাবৃত্তি বলিয়া থাকেন।"[৩৬]

তাই শিল্প আমাদের আবেগ জাগায় অথবা শিল্প আমাদের জীবনীশক্তি দান

করে, শিল্প আমাদের মনকে শান্ত করে তোলে এর কোনও কথাই সম্পূর্ণ সত্য নয়। কি ভারতবর্ষের দার্শনিক কি পাশ্চাত্যের দার্শনিক সকলেই একটি কথার উপরই জোর দিয়েছেন তাহল শিল্পীর প্রকাশ ক্ষমতা।

কিন্তু প্রকাশ ক্ষমতার উপর যখন জোর দেওয়া হবে তখন অন্য সব ভাবনা গৌণ হয়ে যাবে। কিন্তু তাহলে সৌন্দর্য কি শুধু শিল্পীর মস্তিষ্কে চলা ফেরা করবে ? তাহলে সমঝদারের স্থান কোথায় ? অর্থাৎ দেখা যায় সৌন্দর্য তখন প্রকাশ ক্ষমতার বিশ্লেষণের বা ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল।

সুসেন ল্যাঙ্গার বলছেন,

শেষ যুক্তি বা মতই সর্বাপেক্ষা গুরুতর। শৈল্পিক আমদানীর কখনোই বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। এর প্রয়োজন সর্বদাই একটি সুসম্পূর্ণ এবং পরিষ্কার ধারণাগ্রাহ্য উপস্থাপনা। অবশ্য এই আকৃতিরও কখনও কখনও অপরের সমর্থন লাভের জন্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। কোনও সময়ে আক্ষরিক বা বাচনিক ব্যাখ্যা অথবা রচনার বর্ণনারও দরকার,যদি প্রয়োজন হয়। কিন্তু শিল্পের কেন্দ্র বা শিল্পের জীবনের আমদানী যেখানে সেখানে কোনও ভাষ্য বা টীকার প্রয়োজন নেই। পরন্তু এই পদ্ধতিতে শ্রোতার ধারণাকেই বিনষ্ট করা হয়।[৩৭]

তাহলে শিল্পী ত আমাদের বলে বলে বুঝাবেন না। তখনই প্রয়োজন হবে ব্যঞ্জনার যার দ্বারা শেষ কথা বলা হবে। যার দ্বারা সহৃদয় সংবাদীরা একত্র হবেন। শিল্পের স্থান হবে ধূলি মলিন বাস্তব পৃথিবীর ঊর্ধ্বে। তাই প্রত্যেকটি শিল্প সৃষ্টিই অদ্বিতীয়।

সমগ্র শিল্পকলার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল সংগীত তার কারণ সংগীতই ব্যঞ্জনা। সমগ্র সৃষ্টিকে ফেলে রেখে সে এগিয়ে যায়।

তাই আর্নল্ড সোয়েনবার্গ তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন যে সংগীত ? তা হল এমন প্রত্যক্ষ, অকলুষিত এবং শুদ্ধ যে তার বাহ্যিক প্রকাশে সে অনেক ক্ষেত্রে কবিতাকেও অস্বীকার করে, যখন কবিতা নিতান্ত জাগতিক বস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।[৩৮]

সুর সৃষ্টি হয় মানুষের মনের গহন প্রদেশে। বুদ্ধিচেতনার জগৎ পেরিয়ে। কবি তাঁর গানে সেটি স্পষ্টই স্বীকার করেছেন।

"আমার যে গান তোমার পরশ পাবে"

অর্থাৎ ঈশ্বরের পরশ লাভ করবে। কোন গান ? না যে গানের সুর থাকে 'গহন মনের ভাবে' এবং শেষ বাণী যা সুরের মাধ্যমে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে তাও পৌঁছাবে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের চরণে।

"আমার যে শেষ বাণী তোমার দ্বারে যাবে।"

ঈশ্বরের অর্থ এখানে সেই স্থান বা অনন্ত, অতীন্দ্রিয় লোকে অবস্থিত। যেখানে মানুষ সংগীতের মাধ্যমেই পৌঁছাতে পারবে। কারণ সংগীতই শেষ ধ্যান, সংগীতই চরম তপস্যা।

চতুর্থ অধ্যায়

চিত্র, ভাস্কর্য, নাটক ও সংগীত

বাৎসায়ন যা কিছু সৃষ্টিমূলক তাকেই শিল্প বা কলা আখ্যা দিয়েছেন। তিনি চতুঃষষ্ঠিকলাব কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। ইন্দ্রিয়েব উপলব্ধিকে আশ্রয় করেই চতুঃষষ্ঠিকলার সৃষ্টি। কিন্তু বাৎসায়ন নিতান্ত দেশীয় মতে শ্রেণীবিভাগ করেছেন কাজেই তাঁর শিল্পের শ্রেণীবিভাগ সর্বজনীন হয়ে উঠতে পারেনি।

এই গুলির মধ্যে মাত্র কুড়িটিকে আমরা শিল্প আখ্যা দিয়ে থাকি। তার মধ্যে প্রধান তিনটি হল গীত, বাদ্য, নৃত্য যা সংগীতের অন্তর্ভুক্ত। সমগ্র পৃথিবীতে শিল্পরূপে যা অভিনন্দিত হয়ে এসেছে, তাব মধ্যে আছে গীত, বাদ্য, নৃত্য, চিত্রাঙ্কন, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, ইন্দ্রজাল, কাব্যপাঠ, কাব্যবচনা, সাহিত্যসৃষ্টি, নাট্যশিল্প, কারো মানসিক অবস্থা অনুধাবন করে কাব্য বচনা, ছদ্মবেশ ধারণ, পুতুল বা নানা প্রকাব খেলনা প্রস্তুতি, ছন্দজ্ঞান ও বিভিন্ন ছন্দে শব্দ যোজনার সামর্থ্য নানাবিধ যন্ত্রের জ্ঞান ও তার পরিচালনা, বন্ধনশিল্প ইত্যাদি।

বর্তমানেব নিয়ম অনুযায়ী এই কুড়িটি শিল্পকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। কারুশিল্প ও চারুশিল্প। কারুশিল্প ও চারুশিল্প বিভাগে যেসব শিল্প শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে তা হল ভাস্কর্য, স্থাপত্য, চিত্র, নাটক, কাব্য, সাহিত্য ও সংগীত।

পুরাতন শিল্পকার্য বলতে সর্বত্রই প্রস্তরে খোদিত মূর্তি আমরা পেয়ে থাকি। পিত্তলিথিক এবং প্যালিওলিথিক যুগ থেকেই বহু উল্লিখিত শিল্পকার্য উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতে দেখতে পাওয়া যায়।

এই মূর্তিগুলি অধিকাংশই জীবজন্তুকে কেন্দ্র করে অঙ্কিত হয়েছে। যেমন গণ্ডার, জিরাফ, হরিণ, সিংহ ইত্যাদির মূর্তিই অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, মেসোপটেমিয়া ইত্যাদি বহু জায়গায় প্রস্তরে খোদিত শিল্পকলা সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ ধরা হয়।

ভারতবর্ষে সিন্ধুসভ্যতাই সর্বাপেক্ষা পুরাতন বলে ধার্য করা হয়েছে। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় সেই সময়ের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য উভয়েরই উৎকৃষ্ট নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। এই সময়েই শিল্পকলার উত্তরণ হয় প্রস্তর যুগ থেকে তাম্র যুগে। হরপ্পায় মানুষের মূর্তিও পাওয়া গিয়েছে। এরপর যে মূর্তিগুলি প্রস্তর গাত্রে ফুটে উঠেছে তা মানুষ এবং পশুকে কেন্দ্র করে।

এরপর উল্লেখযোগ্য দক্ষিণ দিকের দ্রাবিড় সভ্যতা। এই সময়ে নাগ, যক্ষ ইত্যাদির মূর্তি বেশি দেখা যায়, এর পরেই দেবীর আবির্ভাব। দ্রাবিড় সভ্যতার যুগে দেখা গেল বাঁশের কারুকার্য যা ভারতবর্ষেই পাওয়া যায়। খিলানযুক্ত ছাদ যা পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না তারও আবির্ভাব ভারতবর্ষে।

বৈদিক সভ্যতার যুগে কাঠ, লোহা, তামা, রূপা, সোনা, সীসা সবেরই আবির্ভাব ঘটেছে এবং তা দিয়ে রকমারী শিল্পসামগ্রী প্রস্তুত করা হয়েছে।

ভারতের ধর্মসাধনা এবং ধর্মপ্রচার বহু পুরাতন ঐতিহ্য। ধর্মপ্রচারকেরা যখন এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিলেন, তখন তাঁদের সঙ্গে ছিলেন বিভিন্ন শিল্পী। তাঁরা নানা স্থানে পৌঁছে সেই স্থানে বহু অপরূপ মূর্তি সৃষ্টি করেছেন। এই মূর্তিগুলির অধিকাংশই দুর্লভ শিল্পসৃষ্টি।

এই ভাবে চীনের বহু পুরাতন মূর্তি বা চিত্রের সঙ্গে সিংহলের এবং সিংহলের সঙ্গে ভারতবর্ষের এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে জাপানের চিত্র বা ভাস্কর্যের বহু মিল দেখতে পাওয়া যায়। এর প্রধান কারণই হল বৌদ্ধধর্ম। বৌদ্ধধর্ম যেসব দেশে সর্বাধিক প্রচারিত হয়েছিল সেই সব দেশে চিত্র এবং স্থাপত্য শিল্পেরও প্রসার ঘটে।

মৌর্যযুগের শিল্পকলা, শুঙ্গ শিল্পকলা বৌদ্ধযুগের মধ্যেই ধরা হয়ে থাকে। সেই সময়ে সূর্য এবং ইন্দ্রের মূর্তি খুব প্রসিদ্ধ ছিল। সম্রাট অশোকের সময়ে কিছু স্থাপত্যের নিদর্শন আমরা পেয়ে থাকি। যেমন স্তম্ভ, খিলান ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে এই সময়েই স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের যুগ শুরু হয়। এই সময়েরই প্রখ্যাত সাঁচীস্তূপের নাম উল্লেখযোগ্য। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে বৌদ্ধধর্মের দ্বারা ভারতবর্ষ প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত হওয়ার ফলে এর পর থেকে বহু বৌদ্ধমূর্তির স্থাপনা হয়।

সেই সময়েই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মিলন ঘটে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে, এবং তার নাম হয় গান্ধার শিল্পকলা। কিন্তু গান্ধার শিল্প উচ্চস্তরের শিল্পরূপে পরিগণিত হতে পারেনি।

এরপর কুষাণ রাজত্বে শিল্পের অবদান দেখা যায় মথুরা, অমরাবতী এবং সিংহলে।

বৌদ্ধযুগে অন্য কোন মূর্তি প্রতিষ্ঠা নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু মানুষের চিরন্তন শিল্প ভাবনাকে অবদমিত করে রাখা যায় না ফলে তার পরেই সৃষ্টি হয় অজন্তা গুহার অভ্যন্তরে বিভিন্ন খোদাই চিত্র। এঁটেল মাটি, তুষ ও গোময়ের দ্বারা গুহার দেওয়ালগুলি লেপন করে তার উপরে প্রলেপ দিয়ে অঙ্কিত করা হয়েছে নানা চিত্র। এরপরই গুপ্তযুগের নাম উল্লেখ করা যায়। কারণ শিল্পের ক্ষেত্রে গুপ্ত যুগ হল স্বর্ণযুগ।

প্রখ্যাত শিল্প সমালোচক কুমারস্বামীর মতে প্রথমে বৌদ্ধযুগের শিল্পসৃষ্টি হয়েছিল সাধারণ লোকের দ্বারা। তারপর বৌদ্ধযুগের মধ্যগগনে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা বিভিন্ন শিল্পসৃষ্টি করেন। তারপরই বুদ্ধের বিভিন্ন মুদ্রা সমন্বিত বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মুদ্রাকে যদি শিল্পসৃষ্টি রূপে গণ্য করা হয় তবে তা সমুদ্রগুপ্তের সময়েই প্রথম প্রচলিত হয়।

এর সময়কাল হল ছয়শত খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে খ্রীষ্টের মৃত্যু সময় পর্যন্ত। শিবমূর্তির কল্পনাও এই সময়ে প্রথম করা হয়। টেরাকোটা শিল্প বলে যা পরিচিত হয়ে এসেছে তার প্রচলনও এই সময় থেকে এবং অতিশয় উন্নত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয় এই টেরাকোটা শিল্প।

ভাস্কর্য এবং স্থাপত্য শিল্পের প্রকৃত উন্নতি দেখা যায় মৌর্যযুগে। এই শিল্প শাখা দুটি ধারায় বিকশিত হয়। একটি বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করে অশোকের সময়ে। অপরটি দেশজ শিল্প। যেমন কোনও কোনও অঞ্চলে স্থাপত্য শিল্পের প্রাধান্য দেখা গেছে। প্রধানত বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করেই এশিয়ার বহু দেশের মধ্যে শিল্পের সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

খ্রীষ্টপূর্ব একশত পঁচাত্তর থেকে দেড়শত বৎসর পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে আমরা ভরহুত স্তূপের শিল্পকলার পরিচয় পাই যা বেদী তোরণ সমন্বিত গৃহ এবং স্থাপত্যশিল্পের অপরূপ নিদর্শন।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে উদয়গিরি এবং খণ্ডগিরির প্রতিষ্ঠা। এছাড়া সম্রাট অশোকের সময়ে সাঁচী স্তূপ হল বিশিষ্ট শিল্পসৃষ্টির নিদর্শন। এরপর এল রামায়ণ, মহাভারত ও ভরতের নাট্যশাস্ত্রের যুগ। এই সময়েও বিভিন্ন প্রকারের স্তম্ভ, যক্ষমূর্তি ইত্যাদি কিছু মূর্তি স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন স্বরূপ খুঁজে পাওয়া যায়। তবে এই সময়ের শিল্পকলাও ছিল বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত।

জাভার বরবদুরের মন্দিরটিও ভারতীয়দের অপরূপ শিল্পকার্যের প্রমাণ।

কাম্বোডিয়ার নাখোনভাটে বিরাট এলাকা জুড়ে মন্দির আছে। সেই মন্দির গাত্রে ভারতীয় শিল্পীরাই খোদাই করেছেন নানাপ্রকার রামায়ণ মহাভারতের ঘটনা সম্বলিত ছবি।

ভারতীয় ভাস্কর্য এবং স্থাপত্য শিল্পের সব থেকে বড় প্রকাশ দেখা গিয়েছে সিংহলে। এশিয়ার নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির মধ্যেও ধর্মের প্রাধান্যের ফলে ভারতের শিল্প ছড়িয়ে পড়েছিল।

গ্রীক এবং লাতিন শিল্পীদের মধ্যে এশিয়ার প্রভাব পড়েছে। অতঃপর ইওরোপের সমগ্র দেশে এই প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে। তাই ই. বি. হ্যাভেল বলেছেন, ইউরোপের শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন সমস্তই ভারতের কাছে ঋণী।[১]

ভারতবর্ষের শিল্পসভ্যতাই সর্বাপেক্ষা পুরাতন। ভারতবর্ষে বহু জাতির বহু ধর্মের সমন্বয় ঘটবার ফলেই ভারতের ধর্মনীতি চিরদিনই উদারপন্থী।

স্থাপত্য শিল্পের উদাহরণ স্বরূপ অজন্তা, ইলোরা, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, সঙ্গে কোণারক ভুবনেশ্বরের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া দক্ষিণ ভারতের বহু মন্দিরগাত্র। উত্তর পশ্চিমভারতেও মন্দিরের প্রাচুর্য। সারনাথ, কুশীনগর ইত্যাদি জায়গার স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন অপরূপ। এছাড়া দিল্লীর কুতুবমিনার, তবে এই মিনার রচনায় ভারত ও পারস্যের সাধনার সমন্বয় ঘটেছে। শাহ্জাহান সৃষ্ট তাজমহল অপরূপ ঐশ্বরিক সৃষ্টি। তাজমহল অষ্টভুজ ভিত্তিতে রচিত হয়েছে।

ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী বলেছেন, "পঞ্চদশ শতাব্দীতে তাব্রিজের নিকটে উজুনহসন এমন এক অষ্টভুজ ভিত্তির প্রাসাদ রচনা করেন যাহা ইওরোপীয়গণের বিস্ময়ের বস্তু ছিল।...অথচ ভারতে অষ্টভুজভিত্তিতে রচনা অতি প্রাচীনকাল থেকেই শাস্ত্রসম্মত ও বিশেষ পবিত্র।"[২]

প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের স্থাপত্যশিল্প বহু পুরাতন। শাহজাহানের পর আর উল্লেখযোগ্য কোন স্থাপত্যশিল্প দেখা যায় না, এর কারণ শাহজাহানের প্রথম পুত্র দারা হিন্দু এবং মুসলমানকে সমদৃষ্টিতে দেখলেও সম্রাট ঔরংজেব ছিলেন ধর্মান্ধ। তাঁর মনোভাব ছিল সংস্কারাচ্ছন্ন। শুধুমাত্র গোঁড়া মুসলমান শিল্পী ছাড়া আর কেউই তাঁর চোখে প্রিয় হল না। ফলে উল্লেখযোগ্য শিল্পসৃষ্টি আর সম্ভব হয়নি। যাই হোক সেই সময়েই শিল্পীরা ভারতবর্ষের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়লেন। এরপরে হিন্দু শিল্পীদের মধ্যে বিভিন্ন মন্দিরের কারুকার্য রচনার প্রবণতা দেখা দেয়। এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে ভারতের স্থাপত্য শিল্পের যে নিদর্শন পাওয়া যায়, তার একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। তা হল হিংস্রতা বা কুটিলতার স্থান

নেই সেখানে। শিল্পী দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্রতা এবং নগ্নতাকে এড়িয়ে গিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত সত্যকে তাঁরা এড়িয়ে যাননি। এটি হল ভারতবর্ষের চিরাচরিত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি যে জীবনকে শিল্পের অঙ্গীভূত করে নেওয়া। মন্দিরের কারুকার্যে উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলি শিল্পভাবনার চরমপ্রকাশ। কিন্তু উত্তর ভারতে মন্দিরগুলির ভাবনার মধ্যে বাণী রূপ লাভ করেছে। সেই বৃহৎ বাণীটি হল 'দেবতা দূরে নাই···তিনি আমাদেরই মধ্যে আছেন। তিনি জন্ম মৃত্যু, সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য মিলন বিচ্ছেদের মাঝখানে স্তব্ধভাবে বিরাজমান। এই সংসারই তাঁহার চিরন্তন মন্দির।'[৩]

মন্দিরের গায়ে চিত্রিত হয়েছে সংসারের যাবতীয় নিত্যলীলার ছবি। এই শিল্প অনুকরণ। কিন্তু কিসের অনুকরণ? এই অনুকরণের মধ্যে গূঢ় ভাবার্থ রয়েছে এবং তাই ব্যক্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপরোক্ত মন্দির প্রবন্ধে।

সুমাত্রা, জাভা, তিব্বত, নেপাল ও সিংহল ইত্যাদি স্থানের স্থাপত্য শিল্প ভারতেরই অনুরূপ। সম্ভবত বৌদ্ধধর্মের প্রভাব যে সমস্ত স্থানে আছে সেই সকল স্থানেই শিল্পকলার পরিস্ফুটন একই প্রকার। গবেষকদের মতে ইউরোপীয় শিল্প বস্তুনির্ভর এবং বহির্মুখী কিন্তু ভারতীয় শিল্প বিষয় নির্ভর হলেও অন্তর্মুখী।

বৌদ্ধযুগে সর্বপ্রকার শিল্পেরই আবির্ভাব দেখা যায় কিন্তু চিত্রশিল্পের বিশেষ কোনও ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় না। বোধহয় এর প্রধান কারণ চিত্রশিল্পের স্থায়িত্বকাল বেশিদিন হয় না উপযুক্ত পরিচর্যার অভাবে।

ভারতবর্ষের চিত্রাঙ্কনের পরিচয় পাওয়া যায় মোগলযুগের পূর্বে হিন্দু রাজাদের রাজত্বকালে। কিন্তু অঙ্কিতচিত্র যা রক্ষিত আছে তা অধিকাংশই মুঘল যুগের। ফলে এই ধারণা হয় যে মুঘলরাজাদের একটি পছন্দসই বিষয় ছিল চিত্রাঙ্কন।

মোঘল যুগের অধিকাংশ নৃপতিকে একটি বিষয়ে প্রশংসা করা যায় যা শিল্পীদের ক্ষেত্রে অন্তত হিন্দু মুসলমান বলে তাঁদের কোন ভেদাভেদ ছিল না। মোগলযুগে প্রাচীব চিত্র, পুঁথিতে অঙ্কিত চিত্র এবং পটের উপর অঙ্কিত চিত্রেরই প্রাধান্য ছিল। তখন তৈলচিত্রের প্রচলন ছিল না।

আইন-ই-আকবরী গ্রন্থের লেখক আবুল ফজল তাঁর পুস্তকে আকবরের সময়ের চারজন শিল্পীর নাম করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই জাতশিল্পী ছিলেন।[৪] আকবরের সময়ে সংগীত, চিত্র, ভাস্কর্য সমস্ত প্রকার শিল্পেরই উন্নতি ঘটেছিল।

জাহাঙ্গীর ছিলেন প্রকৃত শিল্পরসিক। চিত্রশিল্পের প্রতিটি সূক্ষ্ম বিষয় তিনি পর্যবেক্ষণ করতেন এবং এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করতেন। ফলে সেই সময়ে

অনেক উৎকৃষ্ট চিত্র অঙ্কিত হয়।

আকবর,জাহাঙ্গীর, শাহ্জাহান প্রত্যেকেই শিল্পরসিক ছিলেন সেইজন্য তাঁদের সময়েই তেলরঙ এবং জলরঙে অঙ্কিত চিত্র বহু দেখতে পাওয়া যায়। সেই সময়ে অঙ্কনরীতির একটি বিশিষ্ট ধারা দেখতে পাওয়া যায়। আকবরের সময়ের একটি তেলরঙের অঙ্কিত চিত্র এখনও আছে সেটি হল আকবরের স্ত্রী মরিয়মের। চিত্রটি পূর্ণাবয়ব।

প্রকৃতপক্ষে চিত্রাঙ্কনের শুরু আকবরের সময়কাল হতেই। রাজ্যসভা, তাঁর ধর্মমত তাঁর সময়ের পরিবেশ ইত্যাদি চিত্রের মধ্য দিয়ে আকবরের দেখার বাসনা ছিল। ফলে সেই সময় চিত্রাঙ্কন অপরিহার্য হয়ে যায়। আকবরের মনোভাবটিই জাহাঙ্গীরের মধ্যে বর্তমান ছিল, কিন্তু জাহাঙ্গীর ছিলেন শিল্পরসিক এবং সমঝদার। ফলে সংগীত চিত্র ইত্যাদি শিল্পক্ষেত্রে রসিক লোকের আবির্ভাবের বিরতি ঘটেনি।

এই সময়ে ভারতবর্ষের চিত্রশিল্পে প্রভাব পড়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার। তখন শুরু হয় প্রকৃতির অনুকরণে শিল্প যাকে বলা হয় ল্যাণ্ডস্কেপ।

দুই সভ্যতার এবং শিল্পীর সম্মেলনে শিল্পকলার আরো উন্নতি ঘটে। ভারতের শিল্পী তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়ে ধরে ফেললেন তাঁদের অপূর্ণতা। অপরপক্ষও তাই, ফলে তার সঙ্গে অনুকরণের কোন সম্বন্ধ রইল না।

শিল্পী অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুললেন তাঁর শিল্পে এবং সেই শিল্পই হল সত্য এবং সুন্দর। সেই সময়ে অঙ্কিত হত তুলি এবং সরু পেন্সিলের দ্বারা। কাঠবেড়ালীর লেজে সেই তুলি নির্মিত হত ফলে তা ছিল অত্যন্ত সরু আর ঝরঝরে। যার কাজ যত পরিষ্কার হত সেই শিল্পীর সার্থকতা সেখানেই।

ঔরংজেবের সময়ে ইসলাম ধর্মে নৃত্যগীত, শিল্প সৌন্দর্য ইত্যাদি নিষিদ্ধ ছিল বলে ঐ সময়ে শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করেনি এই মতটিই প্রচলিত আছে। কিন্তু তা নয়, তাঁর এই ধর্মান্ধতার ফলে শিল্পের ক্ষেত্রে ধর্মীয় সংস্কার লুপ্ত হয়ে যায়, ফলে শুধু জৈবিক আনন্দলাভের জন্যই নৃত্য গীত চিত্রাঙ্কন শুরু হল যা মোটেই অপাংক্তেয় শিল্প নয় এবং তা মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট করে। বহুদিন পর্যন্ত শিল্প সৃষ্টির এই অবস্থাই চলতে থাকে, অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত আর কোনও উল্লেখযোগ্য চিত্রশিল্পের আবির্ভাব আমরা দেখি না।

অতঃপর ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্পীরা শিল্পের উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্পের বৈশিষ্ট্য হল উজ্জ্বলতা, প্রখরতা কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। বর্ণাঢ্য চিত্রকলা। বিভিন্ন রং-এর সমাবেশে, চিত্রের মধ্য দিয়ে একটি

আলোকজ্জ্বল পরিবেশ সৃষ্টি করাই ছিল এই শিল্পের উদ্দেশ্য। বৈচিত্র্য আনাই ছিল এই শিল্পের বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শিল্পীরা চেয়েছিলেন নূতন পথের সৃষ্টি করতে রং এবং রেখার মাধ্যমে। রং ব্যবহারের গতি ছিল তীব্র এবং অতিমাত্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ যা আপনা থেকেই শিল্পের মধ্যে গতিবেগ সৃষ্টি করে। ভারতবর্ষের চিত্রাঙ্কন পদ্ধতিতে প্রধান ভূমিকা ছিল রাজস্থান এবং গুজরাটের।

সাধারণত শিল্প মাত্রেই যে একটি ভঙ্গির (প্যাটার্ন) অঙ্গীভূত করা হত এর ব্যতিক্রম হল মৃৎশিল্প।

মানুষ মনের আনন্দে গান গেয়েছে তাই হয়েছে সংগীত। মানুষের অবয়ব দেখে মানুষ সৃষ্টি করেছে পাথরের গায়ে প্রতিকৃতি তাই হল ভাস্কর্য। প্রকৃতির অফুরন্ত বৈচিত্র্য মানুষের মনকে করেছে লীলাচঞ্চল,ফলতঃ মানুষ সৃষ্টি করেছে চিত্র, তুলিতে আঁকা হয়েছে ছবি। কিন্তু মানুষ সম্পূর্ণ নিজের প্রয়োজনে সম্পূর্ণ জাগতিক সমস্যাপূরণের জন্য পৃথিবীর আদি ও অকৃত্রিম উপাদান মাটি দিয়ে যা সৃষ্টি করেছে তাই হল প্রথম শৈল্পিক সৃষ্টি।

এর পরই শুরু হয়েছে পাথর এবং কাঠের উপর দিয়ে মানুষের পরীক্ষা। তবে তা কোন বিষয় বস্তুকে কেন্দ্র করে মানুষের মন থেকে স্বতোৎসারিত হয়ে নয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মানুষের প্রতিকৃতি অঙ্কন হয়ে যায় একটি স্টাইল। সেই সময়ে মানুষের একটি প্রধান শখই ছিল নিজের প্রতিকৃতি করিয়ে নেওয়া এবং সেটি বিশেষ শিল্পপর্যায়ের ছিল।

মৃৎশিল্পকে বলা যেতে পারে বিমূর্ত শিল্প (এ্যাবস্ট্রাকট্ আর্ট) অর্থাৎ যে শিল্প কোনও সৃষ্টিকে অনুকরণ করেনি।

একটি মানুষের প্রতিকৃতি যথাযথ হয় তখনই যখন তার চেহারার সঙ্গে পোশাক এবং তার পারিপার্শ্বিকও হুবহু ফুটিয়ে তোলা হয়। একটি বাঙালী মহিলাকে এলিজাবেথের সিংহাসনে বসিয়ে দিলেই তাকে কখনোই রানী এলিজাবেথ বলে চিহ্নিত করা যাবে না। এর সঙ্গে চাই কল্পনা। মানুষের মনের ভাব ফুটে ওঠে তার মুখের রেখায় চোখের দৃষ্টিতে। কারো ওষ্ঠে সর্বদাই ফুটে থাকে হাসির রেখা, কারো মুখাবয়ব হয় দৃঢ়তাব্যঞ্জক কিন্তু তার পরিবর্তে যদি শিল্পী বিপরীত ভঙ্গি ফুটিয়ে তোলেন তাহলে সেই প্রতিকৃতি কখনোই বাস্তব হবে না আবার বাস্তব হলেই যে তা উৎকৃষ্ট শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছে যাবে তা নয়। কোনও শিল্পী অনেক দিনের পরিশ্রমে, অনেক রাত্রি জাগরণের পর দেখার অভিজ্ঞতায় একটি ছবি অঙ্কিত করেন যা হল একটি মানুষ, যার মুখের রেখায় চিরন্তন লোভের চিহ্ন ফুটে উঠেছে যা সচরারচর চোখে পড়ে না। কিন্তু পার্থিব

বাসনা কামনার মধ্যে আবদ্ধ এই সংসারের সমস্ত মানুষেরই মুখে কোনও এক সময়ে সেই লোভের ছবি ফুটে ওঠে সম্পূর্ণ তারই অজান্তে। শিল্পী সেই ক্ষণিকের ছবিটিকেই করে তোলেন অবিস্মরণীয় এবং তখনই ছবিটি বাস্তব জগৎকে অতিক্রম করে অনেক উপরে উঠে যায়।

চিত্রকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য যাই হোক সবের মধ্যেই আছে আলোছায়ার খেলা।

প্রথমেই রেখার দ্বারা কাঠামো সৃষ্টি হয় তখনও তাতে প্রাণ সঞ্চার করা হয়নি। অতঃপর সেই রেখার বিন্যাস, সামঞ্জস্য এবং সমতার প্রশ্ন।

চিত্র শিল্পে লোভ প্রতিহিংসা ইত্যাদি মানুষের আদিম রিপুগুলিকে যত সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় এমন আর কোন শিল্পেই নয়। সামঞ্জস্য না থাকলেও শিল্প হয় না। যে রূপই শিল্পী সৃষ্টি করুন তাতে সামঞ্জস্য থাকতেই হবে। এরপর আসে রং-এর প্রশ্ন। মাঠের রং সবুজ বলেই শুধু সবুজ রং-এ তুলি চালনা করলেই তা মাঠে পরিণত হবে না, শিল্পীর যদি অনুভব করার মত চোখ এবং মন থাকে তবেই হয় শিল্পে প্রাণ প্রতিষ্ঠা। শিল্পী তাঁর নিজস্ব প্রতিভার দ্বারা সৃষ্টি করবেন শিল্পকলা।

পাশ্চাত্যে শিল্প সমঝদারগণ চিত্রকলাকে চারিটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। রেখা (লাইন), রং (কালার), আকার (ফর্ম), বিন্যাস (টোন)।

আকারকে পাশ্চাত্যের গবেষকেরা দুটিরূপে দেখানর প্রয়াস পেয়েছেন। একটি হল স্থাপত্য বিদ্যা বিষয়ক অপরটি হল প্রতীকধর্মী শিল্প।

স্থাপত্য বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত যে শিল্পগুলি সেগুলি চক্ষু এবং মনের তৃপ্তিদায়ক নিঃসন্দেহে। তবে এগুলি অধিকাংশই অনুকৃতি শিল্প পর্যায়ের।

কিন্তু প্রতীকধর্মী চিত্রগুলি দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটিকে গবেষকরা বলেছেন বিমূর্তশিল্প (অ্যাবস্ট্রাকট্ আর্ট) অপরটি সম্পূর্ণ শিল্প (অ্যাবসলিউট আর্ট)। কিন্তু এই দুটি শব্দের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা টেনে যদি সুপ্রযুক্ত সংজ্ঞা দেওয়া যেত তাহলে শিল্পের সংজ্ঞা বহুদিন পূর্বেই স্থিরীকৃত হত।

মানুষের মনের একটি গভীরতর স্তর থাকে যার মধ্যে কিছুই স্পষ্ট নয় বা প্রত্যক্ষ নয়। মানুষের দেখার এবং শোনার উপর নির্ভর করেই এই জগৎ গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে মনের প্রত্যেকটি স্তর পেরিয়ে পরিশুদ্ধ হতে হতে তা আসে জ্ঞানের জগতে। যে জগতে মিশে আছে বাস্তব জগতের বিভিন্ন রং ও রস।

দুইয়ে মিলে শিল্পীর মনে সৃষ্টি করে এক রহস্যময়তা, চঞ্চলতার জগৎ। সেই মন তখন হয়ে যায় প্রকাশের জন্য উন্মুখ কিছু ব্যক্ত করবার জন্য ব্যগ্র। সেই সৃষ্টি ত কোনও সীমারেখা মেনে চলে না, নির্দিষ্ট দিক ধরে চলে না শিল্পীর মন।

যদি তাই হয় তবে তাকে প্রতীক ধর্মী শিল্প (সিম্বলিক্ আর্ট) বলা যাবে না, তা তখন অনুকৃতির পর্যায়ভুক্ত হবে।

পাশ্চাত্যে ব্যারাক পিরিয়ডে সংগীতের যেমন বহুমুখী প্রতিভা লক্ষিত হয়, প্রতীকধর্মী শিল্পেরও বহুমুখী প্রকাশ তখনই হয়। তবে ব্যারাক পিরিয়ডের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন থেকে যায়। প্রত্যেক মানুষেরই মনে জাতীয়তাবোধ থাকা বাঞ্ছনীয় এবং দেশের প্রত্যেক মানুষেরই মনে যখন সেই বোধ জাগে তখন তা দেশের পক্ষেই হয় গৌরবের। কিন্তু শিল্প ও সাহিত্যের সঙ্গে স্বাদেশিকতা বোধের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকাই বাঞ্ছনীয়। কারণ তখনই আর শিল্প সর্ব সংস্কার মুক্ত হয়ে দেখা দেয় না, হয় জাতীয়তাবোধে দুষ্ট। ফলে শিল্প সংস্কৃতির অগ্রগতি ব্যাহত হয়। শিল্পের প্রকাশের জন্য রেখা, রং, বিন্যাস ইত্যাদির সঙ্গে একটি প্রধান উপাদান জড়িত আছে তা হল ছন্দ। ছন্দ শুধু সংগীত, চিত্রকলা এবং ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেই অপরিহার্য নয় শিল্পের প্রতিটি শাখায়ই— অর্থাৎ বাৎসায়নের চৌষট্টিটি শিল্পকলাতেই ছন্দ অপারিহার্য। সমগ্রের সম্মেলনেই শিল্পের পরিপূর্ণ প্রকাশ।

চিত্রকলা এবং ভাস্কর্যের প্রথম প্রকাশ কবে তার সঠিক সময় নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কারণ সংগীতের মতই চিত্রশিল্পও মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ।

শিল্প ছিল একান্তভাবে প্রকৃতি এবং সহবাসীদের উপর নির্ভরশীল। মানুষ তখন গুহাগাত্রের উপর নিজের শিল্পপ্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে।

সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় তখনকার শিল্পীরাও তাদের চিত্রাঙ্কনে রং ব্যবহার করেছেন। জন্তুর দেহ নিঃসৃত তৈলাক্ত পদার্থ দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে রং। অতি স্বল্প সামগ্রী নামমাত্র উপকরণ দিয়ে তারা ক্ষণিকের দুর্লভ মুহূর্তটিকে চিরন্তন করে রেখেছে। প্রস্তর দিয়ে তৈরি হয়েছে অপরূপ মূর্তি। কিন্তু সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে সিম্বলিক কথাটির চলন ছিল না। আলো এবং অন্ধকারের সীমানায় সৃষ্টি হয়েছে মূর্তির বহিরঙ্গ। গুহাগাত্রে সেই যুগের চিত্রের যে নমুনা পাওয়া যায় তা এখন সিম্বলিক আর্ট-এর অতি আধুনিক নিদর্শন।

প্রাচীন যুগে ছবি ছিল একরঙা তারপর সুরের পর যেমন সুর আবিষ্কৃত হয়েছে, তেমনই ছবির জগতে সৃষ্টি হয়েছে রঙ। কিন্তু রং মিলিয়ে গাঢ়, মৃদু, ভিন্ন ভিন্ন আলো, ছায়া অন্ধকারের সাহায্যে রূপ ফুটিয়ে তোলা সম্ভব ছিল না তখন, তার পরিবর্তে ছবিতে ছিল একধরনের ছন্দ এবং গতিময়তা যা ছবিগুলিকে প্রাণাবেগসম্পন্ন করে তুলেছে।

ফলে অনুধাবন করা যায় শিল্পীরা কি বলতে চান। বর্তমান কালের চিত্রকলার

মত তখনকার ছবিগুলির ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না, সমগ্রকে নিয়েই ছিল তার ব্যক্তিত্ব এবং রূপ।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিল্পীদের সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক ছিল গভীর এবং নিবিড়। বর্তমান যুগের মত পেশার সঙ্গে শিল্পের কোনও সম্পর্ক ছিল না। দৈনন্দিন একঘেয়েমির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, জীবনে পরম কিছু লাভের জন্যই তারা রচনা করেছে সংগীত ও অন্যান্য শিল্প।

চিত্রশিল্প আরও দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

জ্যামিতিক (জিওমেট্রিক্যাল) ও আঙ্গিক (অরগ্যানিক) চিত্রাবলী। জ্যামিতিক শিল্পের বিকাশ ঘটে প্রথমে। চার্চের পুরোহিতেরা এই অঙ্কনপ্রণালী চর্চা করতেন তবে আঙ্গিক শিল্পকলার প্রসার হয় প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যেমন চার্চ মিউজিক ও সেকুলার মিউজিক পাশ্চাত্যে সংগীতের দুটি ধারা দুটিই সমান্তরালভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আফ্রিকা মহাদেশের নিগ্রো জাতির মধ্যেও অঙ্কন শিল্প বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল।

আরববাসীদের মধ্যে জাপানে, জাভায়, গ্রীসে শিল্পকলার প্রভূত চর্চা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

মিশরে, রোমের ভূগর্ভস্থ কবরে বা বিভিন্ন ধ্বংসস্তূপে যে শিল্পরীতির নমুনা পাওয়া যায় তা বর্তমানের প্রকৃষ্ট শিল্পকলার উদাহরণ।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের দুষ্প্রাপ্য বহু অপরূপ মূর্তি মৃত্তিকা খনন করে পাওয়া গিয়েছে। সেইগুলির নির্মাণ কৌশল আধুনিক পৃথিবীতে এখনও অজানা। এই সব মূর্তিগুলি সেই যুগের বিভিন্ন আরাধ্য দেবতার মূর্তি। তবু বহু ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্প বহুক্ষেত্রেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। আদিম বনচর জাতির সংরক্ষিত যে সব মূর্তি বা ভাস্কর্য তা হয়ে গিয়েছে সীমাবদ্ধ। বংশ পরম্পরায় তা সংরক্ষিত কিন্তু সভ্যজগতে এসে তা আলোড়ন সৃষ্টি করে না। মিশরে মৃতরাজাদের সংরক্ষণের জন্য যে পিরামিড সৃষ্টি হত তা এক অসাধারণ শিল্প সৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে, এবং এই সৃষ্টি রহস্য আজ পর্যন্ত প্রকৃত আবিষ্কৃত হয়নি। পিরামিড জ্যামিতিক শিল্প পর্যায়ে পড়ে। পিরামিড ভাস্কর্যে প্রতিটি পদক্ষেপ হিসাবের আওতায় পড়ে।

অনেকে বলে থাকেন, গ্রীসের শিল্প সভ্যতা সর্বাপেক্ষা পুরাতন, কাজেই তার প্রভাব পড়েছে চীন, ইতালী, স্পেন, জার্মান ইত্যাদি দেশের শিল্পকলার উপর। কিন্তু সমসাময়িক ইতিহাস যা পাওয়া যায় তা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় চৌষট্টি শিল্পকলার বহির্ভূত আর কোনও শিল্প নতুন করে আবিষ্কৃত হয়নি। চৌষট্টি শিল্পকলার প্রত্যেকটি শাখারই চর্চা ভারতবর্ষে আদিকাল থেকে হয়ে

চলেছে, এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ভারতবর্ষের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। সেই তুলনায় চীনের শিল্পকলার বয়স অনেক কম, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এর শুরু।

পাশ্চাত্য শিল্প বিপ্লবের পর অর্থাৎ সতেরশ কুড়ি খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী সময়ের চিত্রশিল্পের একটি নিজস্ব ভূমিকা আছে। শিল্পকে সেই সময়ে দুটি শ্রেণীভুক্ত করা হয়। ক্লাসিক্যাল এবং রোমান্‌টিক। এছাড়া সেই সময়ে একটি ধরন শিল্পের সব ক্ষেত্রেই জনপ্রিয় হয়। যাকে বলা হয় 'রোকোকো স্টাইল'। রোকোকো কথাটির উদ্ভব হয় ফ্রান্সে। কিন্তু এই স্টাইল বিস্তৃতি লাভ করে জার্মানে। এর পরবর্তী সময়ে অঙ্কনশিল্পের প্রসার ঘটলেও কোনও নির্দিষ্ট ধারা ছিল না। অর্থাৎ সতেরশ পঁচিশ খ্রীষ্টাব্দ থেকে উনিশশো পঁচিশ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের প্রচার এবং প্রসার হয় এবং অঙ্কনশিল্পের দুটি ধারা প্রচলিত হয়। (১) প্রতীক ধর্মী (সিম্‌বলিজ্‌ম্‌) যা পূর্বেই প্রচলিত ছিল আর গীতিধর্মী (লিরিসিজ্‌ম্‌)। সাধারণত কাব্যকেই আমরা গীতিধর্মীরূপে চিহ্নিত করে থাকি। চিত্রেও গীতিধর্মিতার সৃষ্টি করে রং।

রং-এর প্রয়োগ নৈপুণ্যেই মূলতঃ লিরিসিজ্‌ম্‌-এর আবির্ভাব। আর সিম্বলিক চিত্র অপেক্ষাকৃত উচ্চতর বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। কোনও একটি বিশেষ ধারণা বিশেষ রীতি যখন চিত্রে রূপায়িত হয় তখনই তা হয় সিম্বলিক পর্যায়ের। চিত্রশিল্পকে এর পরও আবার দুটি ধারায় বিভক্ত হতে দেখা গেল। ইমপ্রেশনিজ্‌ম্‌, এবং সুপাররিয়ালিজ্‌ম্‌। দুটি পরস্পর বিপরীত। ইমপ্রেশনিজ্‌ম্‌-এর একটি বিশেষত্ব এই যে এটি দর্শক অপেক্ষা শিল্পীর মনের ভাবটি প্রকাশ করে এবং সেই ভাবটি বুঝে নেওয়ার জন্য দর্শকের কিছু শিক্ষার এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। শিল্পী যা দেখলেন বা শুনলেন তাঁর চিত্রে সেই বস্তু যথাযথ রূপায়িত করলেন না। কতকগুলি রেখা, কতকগুলি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ছবিতে তুলে দিলেন। দর্শকের উপর ছেড়ে দিলেন বিচারের ভার। ইমপ্রেশনিস্ট বলেন রেখা এবং রং-এর সামঞ্জস্যই বড় কথা বস্তুভাবনা কিছু নয়, কিন্তু এ কখনও সম্ভব নয়। মানুষ তার নিজের অজান্তেই একজন সমালোচনা প্রবণ দর্শক হয় এবং ভাবের বিচার করে। কিন্তু যখন গ্রীসের মতে আমরা বলি ভাবই বড় এবং রেখা এবং রং-এর স্থান নেই তাও কিন্তু ঠিক নয়। রেখা এবং রং-এর বিন্যাসে দর্শক কিছুই বুঝল না, কিন্তু ভাবটি তাকে বলে দেওয়া হল তাহলে কি দর্শক তাকে মহানশিল্প আখ্যা দেবে তা ত নয় তাহলে আর চিত্র, ভাস্কর্য, কাব্যের মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকত না। অবশ্য গ্রীসের মতামত শিরোধার্য নয় কারণ চিত্রকে তারা জীবনযাত্রা প্রণালী প্রকাশের মাধ্যমরূপে ব্যবহার করত, শিল্প রূপে নয়। কিন্তু পল গঁগ্যা একটি প্রবন্ধে

(নোট্স্ অন্ পেইন্টিং) বলেছেন, তাঁর মতে চিত্রাঙ্কনের জন্য কোনও স্মরণশক্তির প্রয়োজন হয় না। যখনই ইচ্ছা সে যে কোনও ছবির মধ্য দিয়ে তার ভাব ফুটিয়ে তুলতে পারে। কিন্তু গঁগ্যার মধ্যে ঐশ্বরিক প্রতিভা ছিল বলেই তিনি অনেক বয়সে শিল্প সৃষ্টি করেছেন তাঁর বুদ্ধি এবং প্রতিভা বলে। কিন্তু আঁকতে না জানলে কি আঁকা যায় ? মানুষের অবয়ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান না থাকলে কি একটা মানুষের ছবি সম্পূর্ণ আঁকা যায় ?

মোনালিসার ছবি যে আজও বিখ্যাত হয়ে আছে তার কারণ লিওনার্দোর অঙ্কন শৈলীর নিপুণতা। এ বিষয়ে বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "তিনি তাঁর প্রতিকৃতির সব কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এঁকে অনেকখানিই দর্শকদের কল্পনার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। সাধারণত প্রতিকৃতি মাত্রেরই অভিব্যক্তির সাফল্য দুটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। (১) মুখের কোণ, (২) চোখের কোল।

ঠিক ঐ দুটি স্থানকেই লিওনার্দো স্বেচ্ছায় অস্পষ্ট রেখেছেন, তারা ঘনায়মান ছায়ায় ক্রমশ মিলিয়ে গেছে। আর ঠিক সেইজন্যে মোনালিসা কি ভাবছে কেন হাসছে সে সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত নই।"[৫]

আইডিয়ালিজ্ম বা সুপাররিয়ালিজ্মে কিন্তু ভাবের চেয়ে রূপের প্রকাশই বেশি যথাযথ ফুটিয়ে তোলার দিকেই তার ঝোঁক। একস্প্রেশনিজমে কিন্তু কোনটিই প্রাধান্য পায় না। শিল্পীর মনের ভাবনাই চিত্রে রূপায়িত হয় কিন্তু তার জন্য বস্তুর যথার্থ রূপকেও সে অতিক্রম করে না। যথার্থ ভাবকেও উপেক্ষা করে না। পৃথিবীর শিল্পসৃষ্টি এই একস্প্রেশনিজম্-এর উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বর্তমানে। কিন্তু এক্সপ্রেশনিস্টদের বিরুদ্ধে আকারের বিকার ঘটানোর চেয়েও ব্যাপকতর অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে তা কুৎসিত। তখন প্রকাশবাদীর বক্তব্য হল, জগতে যখন এত দৈন্য এত হাহাকার, এত বেদনা, তখন শুধু সৌন্দর্যের অনুধাবন হচ্ছে মিথ্যার বেসাতি। শুধু লালিত্য ; মাধুর্য ও সমন্বয়ের সাধনা হচ্ছে সত্যের অপলাপ। তাই ধ্রুপদী মহাশিল্পীদের সৃষ্টি যেমন রাফায়েল, করেজ্জোর সাধনা আত্মপ্রতারণা ও ভণ্ডামী। সুতরাং প্রকাশবাদীরা যা কিছু সুন্দর, যা কিছু ললিত, তা পরিহার করে মানব অস্তিত্বের নিষ্করুণ, রুক্ষ ও কঠোর ভাবকে তুলে ধরলেন।

জার্মান শিল্পীদের শিল্পের বৈশিষ্ট্য হল যেমন রোম্যানটিসিজ্ম। ভারতবর্ষের শিল্পকলা অধিকাংশই আইডিয়ালিজমকে অনুসরণ করে। ইংলণ্ডেও রোম্যানটিসিজ্ম মুখ্য। উত্তর পাশ্চাত্যে এক্সপ্রেসনিজ্ম মুখ্য। কাজেই দেখা

যায়, শিল্পীরা শিল্প সৃষ্টি করেন নিজের মনে ; কিন্তু তাঁরা প্রভাবিত হন দেশ কাল এবং পূর্বসূরীদের দ্বারা।

বর্তমানের শ্রেষ্ঠ আলোচ্যশিল্পী পিকাসো, কাটালনিয়া অঞ্চলের আদিম শিল্পীদের ফ্রেসকো ও পরবর্তীকালের রোমানেস্‌ক ঐতিহ্য, মিশরী শিল্প, প্রাগহেলেনিক গ্রীক্ বাইজানটাইন ও গথিক ভাস্কর্য, ষোড়শ শতাব্দীর স্পানিশ শিল্পশৈলী এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে তাঁর পূর্ববর্তী পলসেজা:স প্রবর্তিত রীতি, গঁগ্যা ও ভ্যান গখ্ অনুপ্রাণিত ফোভিজম ও একস্‌প্রেশানিজ্‌ম বা প্রকাশবাদ, জাপানী শিল্পাঙ্গিক, নিগ্রো ভাস্কর্য ও তাঁর অব্যবহিত পূর্বসূরী তুলো জলত্রেক সবায়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।[৬]

অন্যদিকে তিনি নিজেই একাধিক শিল্পশৈলীর পথিকৃৎ ও নবনব প্রেরণার উৎস। এছাড়া পাশ্চাত্যে এবং বর্তমানে ভারতবর্ষে আরও কতকগুলি শিল্পসৃষ্টির ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। যেমন এচিং-এর পদ্ধতি আবিষ্কার করেন রেমব্রান্ট। তার বৈশিষ্ট্য হল, ছবির মধ্যেই তার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবে, তার পরিবেশ, প্রকৃতি, আবহাওয়া, আলো ও তার ছায়া, গতি কিংবা জড়তা সবই ফুটে উঠবে।

এছাড়া এল ফোভিজম্।

এই পদ্ধতির শিল্পীরা মনে করলেন, শিল্প অবলুপ্তির পথে, ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে তাকে সুস্থ করে তুলতে হবে। অশ্লীলতা বর্জন করতে হবে। তাই শিশুর সারল্যকে ফুটিয়ে তুলতে হবে চিত্রে। সর্বপ্রকার সংস্কারকে লুপ্ত করে, পূর্বসূরীদের অঙ্কনশৈলীকে উপেক্ষা করে, শিল্পচর্চার পুনরারম্ভ করতে হবে। তাকেই বলা হল বুনো জন্তুবাদ বা ফোভিজম্।

সুপাররিয়ালিজম্ এল চিত্রশিল্পের আর একটি বৈশিষ্ট্যরূপে। তাঁরা স্বপ্নলোককে তাঁদের শিল্পে স্থান দিলেন। স্বপ্ন নিঃসন্দেহে বাস্তব এবং অবাস্তবের সংমিশ্রণ। মানুষ পশু সবই আবির্ভূত হয় আধিভৌতিকরূপে। কিন্তু শিল্পে তার স্থান কোথায় এ সমালোচনা করেন শিল্প সমঝদার। যাই হোক্ সুপাররিয়ালিস্টদের ছবিতে বাস্তব অবাস্তবের ছবি একই সঙ্গে ফুটে ওঠে। এরপর সর্বাধুনিক রূপে এল কিউবিজম্। এতে স্থান পেল বিভিন্ন রেখা সমন্বিত নকশা। যার দ্বারা কখনও চিত্রের বিষয়বস্তু প্রকাশিত হয় কখনো বা নকশার আড়ালে বিষয়বস্তু আত্মগোপন করে। কাজেই তা হয়ে ওঠে অনেকক্ষেত্রেই দুর্বোধ্য। এই দুর্বোধ্য ছবির নাম কিউবিজম্।

চিত্রাঙ্কনের জন্য এবং সেই চিত্র সম্পর্কে দর্শকের একটি নির্দিষ্ট ধারণার জন্য সঠিকক্ষেত্র এবং সঠিক দূরত্বের প্রয়োজন। কেননা চিত্রটিকে সর্বদাই সুন্দর রূপে

এবং প্রভাবকরূপে প্রতিভাত করতে হবে। দূরত্ব সর্বদাই বৈপরীত্যের সমতুল নয়। বলা যায় বৈপরীত্য হল বিষয়ের অন্তর্নিহিত গুণ। বলা যায় রচনা পদ্ধতির কাঠামো। প্রত্যেকটি শিল্পকর্মই তার আকার এবং পরিমাণের বৈপরীত্যের উপর নির্ভর করে।[৬ক]

ডিসট্যান্স কথাটিকেও সুসেন ল্যাঙ্গার খুব সুন্দর ভাবে বিবৃত করেছেন যার বিশেষ প্রয়োজন চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে। ডিসট্যান্স হল ক্ষণিকের দূরত্ব যা ছড়িয়ে পড়ে স্মরণের ছবিতে কিছু বিক্ষিপ্ত সময়ের মাধ্যমে। একথাও তিনি বলেননি সময়ের দূরত্ব অনেক হলে তা আরও সুন্দর, শুধু শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে সেই পরিমাণ দূরত্ব থাকা প্রয়োজন যা দর্শক এবং শিল্পী উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয়।

কোনও প্রথাই নির্দিষ্ট কিছু নয়। প্রত্যেক প্রথাই শিল্পীকে তাঁর পথ চিনে নিতে সাহায্য করে। কিন্তু ক্রেতা বা দর্শকের চাহিদা একই রকম থেকে যায়।

ক্রেতা যখন কোনও ছবি ক্রয় করেন তখন তাঁর মনে কি ভাবের উদয় হয়? মনে করা যাক শিল্পী একটি ছবি এঁকেছেন, তার বিষয়বস্তু হল একজন লোক আরেকজনের গলা টিপে ধরেছে। তার চোখে ফুটে উঠেছে হত্যার উন্মাদনা। সর্ব শরীরে জিঘাংসার ছাপ। ক্রেতা ছবিটিকে ক্রয় করলেন, তার অর্থ কি এই যে সেই হত্যাকারীকে দেখে তাঁর মনেও জেগে উঠেছে ক্রোধ, হত্যা করার আকাঙ্ক্ষা। অথবা ধরা যাক নদীর পাশে শ্মশানে চিতা জ্বলছে পাশে একটি বালিকা ক্রন্দনরতা। ক্রেতা সে ছবিটিও ক্রয় করলেন, তার অর্থ কি এই যে মেয়েটিকে দেখে তাঁর মনেও অত্যন্ত দুঃখ জেগেছে। দুটির একটি ক্ষেত্রেও কিন্তু ক্রেতার মনের ভাব তা হয় না বা বলা যায় হতে পারে না। এখানেই অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে চিত্র এবং ভাস্কর্যের প্রভেদ। ক্রেতা শুধু এই জন্যেই ছবি ক্রয় করেন তার প্রধান কারণ হল কোনও ছবি দেখে ক্রেতা বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সেই ছবিটি মিলিয়ে নেন। চিন্তা করে দেখেন ছবিটি সেই দিক থেকে নিখুঁত হয়েছে কি না। অথবা বলা যায় ছবিটি দেখেই যখন তাঁর 'রিয়াল' বলে মনে হয় তখনই তিনি ছবিটির দিকে দৃষ্টিপাত করেন, চিন্তা করেন এবং ক্রমান্বয়ে মুগ্ধ হন। ঠিক এই কারণেই সংগীত, নাটক অপেক্ষা চিত্র এবং ভাস্কর্যকে দেশকালের উর্ধ্বে সর্বজনীন আখ্যা দেওয়া যায়। কারণ ছবি দেখে তার ভাব বোঝা সহজ হয় যদি বাস্তবের সঙ্গে তার মিল থাকে। কিন্তু তাই বলেই যে সে শিল্প 'অনুকরণ' হবে এবং শিল্প পদবাচ্য হবে না তাও নয় এবং সমস্ত 'মডার্ন আর্ট, যা শিল্পীর অবচেতন মনকে আশ্রয় করে আঁকা তাই শিল্প পদবাচ্য হবে যেহেতু তা বাস্তবের অনুকরণ নয় তাও হতে পারে না। তাই সমঝদার দর্শকের

একটি বিশেষ স্থান আছে শিল্পের ক্ষেত্রে। নন্দলাল বসু সমগ্র চিত্র শিল্পকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন, ১) অনুকারক ২) ব্যঞ্জক ৩) ছান্দসিক। সংকেতে যে ছবি আঁকা হয় তাকে তিনি বলেছেন ব্যঞ্জক বা ব্যঞ্জনা প্রধান ছবি। এই ধরনের ছবিতে চোখের দেখা ও মনের দেখা এক হয়ে যায়। ছান্দসিক বলতে ছন্দনির্ভর ছবি বুঝায়। ১) স্বগত ছন্দ ২) শ্রেণীগত ছন্দ ৩) সাধারণ ছন্দ। অনুকারক বলতে যে ছবি বুঝায় তার কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে।[৭]

যে কোনও অঙ্কনশিল্পই সর্বদা কিছু না কিছু ব্যক্ত করে। আবেগ, লোভ, তীব্র হিংসা, ঘৃণা ইত্যাদি যে পরিমাণে চিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা যায় অন্য কোনও শিল্পের মাধ্যমে এই রূপগুলি তত বাস্তবায়িত করা যায় না। কিন্তু চিত্রকর একটি সমগ্র ঘটনাকে উপস্থাপিত করতে পারেন না।

তাই চিত্রশিল্পের সঙ্গে নাটকের যোগ আছে কারণ নাটকও সর্বদাই কিছু বলবার অপেক্ষা রাখে। কিন্তু কবিতার সঙ্গে নাটক এবং ভাস্কর্যের তফাৎ আছে। কবিতা যে সর্বদাই কিছু ব্যক্ত (রিপ্রেজেন্ট) করবে সেরকম বাধ্যবাধকতা নেই। এখানে আরেকটি কথা প্রসঙ্গক্রমে এসে যায়। শিল্পকে যথার্থরূপে প্রতিষ্ঠিত করা এবং শিল্পের মাধ্যমে কিছু ব্যক্ত করা দুটি এক বলা যায় না। যেমন কবি কবিতার ছন্দের মধ্য দিয়ে শরতকালের রূপ বর্ণনা করতে চেয়েছেন। শরতের নীলাকাশ, প্রসন্ন রৌদ্র সবই তিনি ব্যক্ত করলেন কবিতায় এবং শরতের যথার্থরূপ ফুটিয়ে তুললেন। তখন কবিতাটি পড়ে সকলে প্রকৃতির শরতকালের রূপটি কল্পনা করলেন। কবির দায়িত্ব শেষ। পাঠকেরও। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ', শুধু চৈত্রমাসের বিদায়সম্বর্ধনা এবং বৈশাখের আবাহনেই শেষ নয়, আরও কিছু আছে যা ধ্বনি, ছন্দ ব্যঞ্জনা সব কিছু মিলিয়ে আবার সব কিছুকে অতিক্রম করে অন্য কোনও কথা অন্য কোনও সুরকে ব্যক্ত করেছে। অর্থাৎ শ্রোতার সামনে পাঠকের সামনে কবি কোনও এক মুহূর্তের বিশেষ মানসিক অবস্থাকে উপস্থাপিত করলেন। প্রত্যেক শিল্পের ক্ষেত্রেই এই ব্যাখ্যাটি প্রযোজ্য। তবে নাটক সর্বদাই স্পষ্ট। কিছু তাকে উপস্থাপিত করতেই হয়। তা না হলে এই নাটক হয় অর্থহীন, অবাস্তব এবং তা জনপ্রিয়তা হারায়। সংগীতের আর একটি শাখা নৃত্যের ক্ষেত্রেও একই কথা আমরা বলতে পারি। দর্শক যখন নৃত্যরতার ছবি দেখেন সেটি কোনও এক মুহূর্তের ছবি। সেটি মুহূর্তের সত্য হলেও কিছু উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয় না। কিন্তু দর্শক যখন কয়েক ঘণ্টার কত্থক নৃত্য দর্শন করেন, তিনি তখন অনুধাবন করতে পারবেন নৃত্যের মধ্য দিয়ে কোন্ ভাব ব্যক্ত হচ্ছে। তাই এক অর্থে নৃত্য এবং নাটক দুইই কিছু না কিছু ব্যক্ত করছে। তবে

পৃথিবীতে প্রত্যেক শিল্পেরই কিছু না কিছু বক্তব্য বিষয় থেকে যায়ই। শুধুমাত্র 'শিল্পের জন্য শিল্প' একথা যখন বলি তখনও শিল্পের কিছু বক্তব্য বিষয় থাকেই। কারও কম কারও বেশি। তাই প্লেটো বললেন শিল্প দুই রকমের, একটি উপস্থাপিত করছে এবং একটি করছে না বলে তার মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা টানার প্রয়াস করলেন। তাঁর মতে সংগীত, চিত্র, ভাস্কর্য প্রত্যেকটিই কিছু কিছু 'উপস্থাপিত' করে এবং কোনটি করে না এবং যে শিল্পই কিছু ব্যক্ত করছে সে-ই দর্শক তথা শ্রোতার মনে আবেগ জাগাচ্ছে এবং নৈতিক অবনতি ঘটাচ্ছে ফলে প্লেটো সেই সব শিল্পের প্রতি রুষ্ট হলেন যা কিছু ব্যক্ত করে।

কিন্তু প্লেটোর শিষ্য এ্যারিস্টটল্ বললেন কিছুই ব্যক্ত করে না এরকম কোনও শিল্প সৃষ্টি হতে পারে না। তবে দর্শনের মতামত কখনও স্থির থাকে না। একজনের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী বিশ্লেষণপূর্বক ভূতপূর্ব মতামত খণ্ডন করেন। তবে শিল্প যেমন আবেগ জাগাতে পারে, তেমনই আবেগ জাগলে তবে শিল্প সৃষ্টি হয়। যেমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁরা বৃষ্টি পড়লেই গান করেন, অনেক অবিস্মরণীয় কবিতার জন্ম দুঃখের মধ্যে কাজেই শিল্পসৃষ্টি কখনও অপবিত্র হতে পারে না। শিল্প মানুষের চেতনাকে জাগ্রত করে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছেন 'এ ম্যান স্পিকিং টু মেন', তিনি কয়েকটি শব্দের মধ্য দিয়ে শিল্পের সংজ্ঞা নির্ণয়ের একটি ধাপ রচনা করেছেন।

একটি ছবি তার সমগ্রকে নিয়ে হয়ে ওঠে শিল্প। চিত্রে একটি সুন্দর মুখ দর্শকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছে,বার বার দর্শক ঘাড় ফিরিয়ে অবলোকন করছেন সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখাবয়ব, সেই মুখের পাশেই আছে একটি ছোট্ট জানালা যা দর্শকের চোখে পড়ল কিন্তু মনে রইল না, অথচ মুখের ভাবটি সম্পূর্ণ ফুটিয়ে তুলতে সেই জানালাটি অনেকাংশে সাহায্য করেছে, শুধু তাই নয়, ছবিটুকুই ছবি নয়, ছবির পাশের সাদা জায়গাটিও ছবি, তার পারিপার্শ্বিক রচনা করেছে। কিন্তু ছবির মধ্যে ছোট্ট জানালাটি যে দর্শকের মনে থাকেনি সেটিই শিল্পীর কৃতিত্ব। জানালাটি নিজের সত্তা হারিয়ে ছবির সামঞ্জস্য রক্ষা করতে সাহায্য করে। সুরের পর সুর যেমন সৃষ্টি করে তোলে শ্রোতার মনে মাযাজাল। রং-এর পর রং-ও দর্শকের মনে সৃষ্টি করে সচেতনতা। তখন একটি রং কোনও বিশেষ রং নয়, সমস্ত রং মিলিয়ে একটি সম্পূর্ণ ছবি। প্রথমে রূপ দর্শককে আকৃষ্ট করে অতঃপর ভাব ক্রিয়া করে : কিন্তু শিল্পীর পক্ষে সেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করাই বড় কঠিন এবং শিল্পীর যোগ্যতার ক্ষেত্রে সেই প্রশ্নই প্রধান হয়ে দেখা দেয়। কারণ ছন্দ, সুর, সামঞ্জস্য যেগুলি শিল্পের প্রধান উপাদান সেইগুলি সুসংবদ্ধ হলে তবেই তা

মানুষের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের মনকে পরিশুদ্ধ করে, অনন্তলোকে যাত্রার কয়েকটি ধাপ নির্মাণ করে। তাই হারবার্ট রিড বলেছেন, "শিল্পীর প্রতি আমাদের আনুগত্য অর্থাৎ সেই মানুষের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা যে তার বিশেষ ক্ষমতার দ্বারা আমাদের মানসিক প্রতিক্রিয়ার সমাধান করে।[৮]" এই কথা বিশেষভাবে ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই ভরতের নাট্যশাস্ত্রের আমলেই এবং তার পূর্ব থেকেই নৃত্য, নাটক, কাব্য সংগীত, চিত্র ভাস্কর্য সবেরই মূল্য নিরূপিত হয়েছে যখন সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে ভারতের চিত্র এবং ভাস্কর্য শিল্পই সর্বাপেক্ষা উন্নত। বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে সমগ্র এশিয়ার শ্রেষ্ঠ শিল্পীর দ্বারা ভারত তখন সমৃদ্ধশালী। এরপরই এল রামায়ণ মহাভারতের যুগ। মহাভারতের মধ্যেই ভারতের শিল্প সংস্কৃতির পরিচয় সুবিস্তৃত। ভারতের শিল্পে অর্ধনারীশ্বরের রূপ স্বীকৃত এবং সমাদৃত। দুইয়ের মিলনে এই রূপ পুরুষ এবং প্রকৃতি। ভারতের শিল্পসাধনায় নারীকে দেওয়া হয়েছে শক্তির ভূমিকা, তাই কৃষ্ণকে শক্তিদান করেছেন রাধা। দেবী দুর্গা হয়েছেন শক্তিরূপিণী। মহাকালী হয়েছেন রক্ষাকালী। ভক্তরা দেখেছেন দেবীর মাতৃরূপ এবং সেইজন্যই অতীতের শিল্পকলা দেবদেবী নির্ভর। বহু বিবর্তনের মাধ্যমে বহু পথ অতিক্রম করে শিল্পে আজ কি সাহিত্য, কি চিত্র ভাস্কর্য সবের মধ্যে মানুষই প্রধান স্থান অধিকার করেছে।

যে শিল্পের মধ্যে মানুষই প্রধান তা হল নাটক। "ঋগ্বেদের 'পাঠ্য' যজুর্বেদের 'ক্রিয়া' অভিনয় সামবেদের 'গান' এবং অথর্ববেদের 'রস' এই সমস্ত উপাদানের সংযোগে নাট্যের সৃষ্টি এবং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা।"[৯]

নাটকের প্রথম এবং প্রধান অবলম্বন সংঘাত। আবার দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে সংঘাত।

'প্রবৃত্তির সঙ্গে প্রবৃত্তির, হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে কর্তব্যবোধের, সমাজ চেতনার সঙ্গে ব্যক্তি চেতনাব, অপরিমিত উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সীমায়িত সামর্থ্যের স্বাদেশিকতার সঙ্গে ব্যক্তি অনুরাগের, বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ের, আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের, এক জীবননীতির সঙ্গে অপর জীবননীতির নানা বিচিত্র দ্বন্দ্ব মানবচরিত্রের মধ্যে চলতে পারে।"[১০]

নাটকে কৌতূহল জাগানো যায় আরেকটি উপায়ে। ঘটনায় আকস্মিকতার আবির্ভাব বা কোনও চরিত্রের মধ্যে অসংগতি। অবশ্য সেই চরিত্র যদি কাহিনীর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় হয় তবে তা কোনও উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করে না। রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ দ্বার থাকে দর্শকের অজানা কাজেই অভিনেতা বা অভিনেত্রীর

আগমন বা নির্গমনের চাতুর্যেও দর্শক মনে কৌতূহল সৃষ্টি করা যায়।

নাটক গড়ে তুলতে হলে তার কয়েকটি পর্যায় সম্বন্ধে চিন্তা করতে হয়। গল্পাংশ, চরিত্র, গঠন নৈপুণ্য, চিন্তা বা মূল ভাব, দৃশ্য এবং সুর ও ছন্দ।[১১]

প্রত্যেকটি পৃথক রূপে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, নাটকের গল্পাংশ যদি দুর্বল হয় তবে তা নাটক হয় না। কারণ কোনও একটি চরিত্র বা ভাষার কুশলতা বা কোনও বিশেষ গান এর উপরেই মূল নাটক খাড়া করা যায় না। ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে নাটকেব পাঁচটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। আরম্ভ, প্রযত্ন, প্রত্যাশা, নিয়তাপ্তি, ফলাগম। এই পর্যায় বিভাগ করেছেন দর্শকের মনের অবস্থাকে ভিত্তি করে।

সাধারণত তিনটি অঙ্ক থাকলেই একটি নাটক সুসমাপ্ত হতে পারে।

প্রথম অঙ্কে নাটকটির মূল কাহিনীর কিছু অংশ বিবৃত হয়। দ্বিতীয় অংশে থাকে তার বর্ণনা। তৃতীয় অংশে তারই পরিসমাপ্তি ঘটে। নাটকের প্রধান অবলম্বন হল চরিত্র। সব চরিত্রই যদি অবিমিশ্র ভাল হয় বা অবিমিশ্র খারাপ হয় তাহলে নাটক সার্থক হয় না। দর্শক তখন বুঝতে পারে তাদের কিছু বোঝান হচ্ছে তখন তা হয় রূপক চরিত্র। আবার চরিত্রের মধ্যে যদি কোনও অসংগতি না থাকে, অসংগতি বলতে বোঝান হচ্ছে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য না থাকে অর্থাৎ সবই ভালো বা সবই খারাপ হয় তাহলে সেই চরিত্র হয় অবাস্তব।

সংস্কৃত নাটকের নিয়মানুযায়ী নায়িকা হবে আট প্রকার। বাসকসজ্জিকা, অভিসারিকা, বিরহোৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, বিপ্রলব্ধা, প্রোষিত প্রিয়া ও স্বাধীনপতিকা। কালিদাস, মধুসূদন, শেক্‌সপীয়র নাটক রচনা করেছেন কাব্যে।

তখন মানুষ সেই নাটকেই রস আস্বাদনে অভ্যস্ত ছিল। গ্রীক নাটকও রচিত হত কাব্যে। ধীরে ধীরে গদ্য অর্থাৎ কথ্যভাষা জনপ্রিয় হল সর্বদেশেই।

ভারতবর্ষের আর্যসম্প্রদায়ের দ্বারা নাটকের সূচনা দেখা দিয়েছিল এগারোশো খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে।[১২] এরপর এসেছেন অশ্বঘোষ, ভাস। অশ্বঘোষের পূর্বে যে নাটকগুলি রচিত হয়েছে সেগুলি ছিল আর্য ভাষায় রচিত। অশ্বঘোষের নাট্য রচনা থেকে আমরা পাই সংস্কৃত ভাষায় রচিত নাটক। সুললিত শব্দে গাঁথা, সংগীতের পরিপূর্ণ অধিকারে নৃত্যগীত সম্বলিত নাটক।

নৃত্যগীতের প্রচলন প্রথম থেকেই, যখন অমৃত মন্থন নামক নাটক সৃষ্টি হয়েছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগে।

প্রথম কথা হল সুরে তা এক স্বরেরই হোক, দুই স্বরেরই হোক। শিল্পী সুরের

দ্বারাই বক্তব্য প্রকাশের চেষ্টা করলেন নিজের মন এবং শ্রোতাকে পরিতৃপ্ত করার জন্য।

ঘটনা যখন বলা শুরু হল সুরের মধ্য দিয়ে তখন তা শুধু সুর নয় তাহল কবিতার ছন্দে গাঁথা। মধ্যে মধ্যে প্রবেশ করল গান। বর্ণনাকারের নাম হল সূত্রধার, তিনিই প্রধান। দীর্ঘদিন এই নিয়মেই চলল নাট্যসৃষ্টি, কিন্তু চমকবিহীন। ফলে যখন দেখা গেল একই লোকের মুখে বিভিন্ন চরিত্রের কথা শোভা পায় না তখন আবির্ভাব ঘটানো হল দ্বিতীয় অভিনেতার। যখন দেখা গেল দুটি ভিন্নধর্মী ঘটনা পাশাপাশি শোভা পায় না, দর্শককে আনন্দ দেয় না তখন আবির্ভাব হল অংকের। কিন্তু নৃত্য ও গীত ব্যবহারের কোনও ব্যতিক্রম হল না। প্রাগৈতিহাসিক যুগেও ছিল সংগীতের স্থান, বর্তমানে আঞ্চলিক ভাষার উপরে রচিত নাটকেও আছে সংগীতের স্থান। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সংগীতের দ্বারাই নাটকের মান নির্ধারিত হয়ে যায় বর্তমান যুগে, যখন সমালোচনা অতি প্রখর, মানুষের মন সতত ক্রিয়াশীল, নতুন কিছু সৃষ্টির ভাবনায় রত।

আমাদের দেশে নাটক যখন প্রথম প্রচলিত হল, তখন প্রথম ছিল একজনের দ্বারা অভিনীত একাঙ্ক নাটক। তারপর অভিনেতার সংখ্যা বেড়ে হল দুই। এর পর অভিনেতার সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল। ফলে নাটকের অঙ্কও দুই থেকে তিন প্রয়োজনানুসারে আরও বেশি হল। বর্তমানে নাটক নিয়ে গবেষণা চলেছে বহু প্রকারের। একে উন্নত মানের করে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চলেছে ফলে নাটক হয়েছে বহুমুখী। নাটক হল রসের আকর। বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে যে রসের উৎপত্তি। নাটক অভিনয়ের ক্ষেত্রে অভিনেতা নবরসের যে রসই শ্রোতার মনে সঞ্চার করুন পরিশেষে তা শান্ত রসে পরিণত হয় যার পরিণতি মনের এক আনন্দঘন অবস্থা।

"লৌকিক ভাব শোক, হর্ষ প্রভৃতি হতে পারে, কিন্তু বিভাব, অনুভাব প্রভৃতির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যখন সেই ভাব দর্শকের চিত্তে রসে পরিণত হয় তখন সেই রস শুধুমাত্র আনন্দজনক হয়। শোক যখন করুণ রসে পরিণত হয় তখন সেই করুণ রস লৌকিকতা হতে মুক্তি পায় এবং এক অলৌকিক আনন্দ উদ্রেক করে।"[১৩]

নাটক সর্ব শিল্পের সমন্বয়। এর জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন, সেই সঙ্গে থাকা চাই পরিমিতি বোধ এবং সৌন্দর্যচেতনা। নাটকের আবির্ভাব ভরতের নাট্যশাস্ত্রেরও পূর্বে। কারণ নাট্যশাস্ত্রে যেভাবে নাটকের বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে পূর্ণাঙ্গ নাটক তার পূর্বে সৃষ্টি না হলে তাই নিয়ে নাট্যশাস্ত্রে আলোচনা সম্ভব ছিল না।

শিল্প যে শুধু শিল্পের জন্যই নয়, শিল্পে যে প্রয়োজনবাদ স্বীকৃত হয়েছে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ নাট্যশিল্প।

"নাট্যবেদে মানুষের সর্ববিধ কল্যাণ করবার দায়িত্বটুকু নাট্যের উপর অর্পণ করেছেন নাট্যশাস্ত্রকার ভরত। শুধু ক্ষণিক আনন্দদানই নাটকের কাজ নয়। নাটকের কাজ হল মানুষের জীবনে পূর্ণ কল্যাণের প্রতিষ্ঠা এই মহৎ তত্ত্বের উত্তরাধিকার আমাদের দিয়েছেন আচার্য ভরত।"[১৪]

রোমা রোঁলা বলেছেন 'পিপল্‌স্‌ থিয়েটারে' যে সমস্ত নাটকের অভিনয় হবে তার মধ্যে মানুষের মনের কোনও ক্ষুদ্রতা, নীচতা, স্বার্থ ইত্যাদির দ্বন্দ্ব দেখান চলবে না কারণ তা মানুষের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী। অর্থাৎ যে নাটকটি পরিবেশিত হচ্ছে তা মানুষের কল্যাণের জন্য একান্তভাবে নিয়োজিত। এখানেই শিল্পের উদ্দেশ্য হল মানুষের মঙ্গল করা। শিল্প এখানে প্রয়োজনের জন্য ব্যবহৃত। তবে ব্যাপারটি শিল্পসম্মত কিনা তা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে কারণ এখানে শিল্পের স্বরূপ বিকৃত হতে পারে।

ভারতবর্ষে সকল সভ্যতারই বিকাশ দেখা গেছে বৈদিক যুগে। কাজেই শিল্প ও সংস্কৃতির ইতিহাস মনে হয় ভারতবর্ষেরই সর্বাপেক্ষা পুরাতন। গ্রীসের শিল্প ইতিহাসের কালও অনেক পুরাতন, সেইজন্য অনেকেই বলে থাকেন, ভারতবর্ষের শিল্পচর্চায় গ্রীসের প্রভাব পড়েছে, যেমন ভারতের নাটকের ইতিহাস, কিন্তু ইতিহাস আলোচনায় দেখা গেছে ঋগ্‌বেদের স্তোত্রগুলি এবং মন্ত্রগুলি পর পর এক একজনের উত্তর প্রত্যুত্তর, বর্ণনা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বলে যাওয়ার রীতি ছিল, সেই পাঠের ধরনটি ছিল নাটকীয়। তারপর পৃথিবীর আদি সাহিত্য রামায়ণ এবং মহাভারতেও নাটকের আভাষ বহু স্থানে আছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্র লিখিত হওয়ার পূর্বেই আমাদের দেশে নাট্য সাহিত্যের প্রচলন ছিল আমরা দেখেছি। খ্রীষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতেই ভারতবর্ষে নাটকের প্রচলন হয়েছে। ভাসের তেরটি নাট্যসৃষ্টি। উল্লেখযোগ্য নাটক স্বপ্নবাসবদত্তা, উরুভঙ্গ। অশ্বঘোষের উল্লেখযোগ্য নাট্যসৃষ্টি বুদ্ধচরিত। কালিদাস রচনা করেছেন বিক্রমোর্বশী শকুন্তলা, মেঘদূত ইত্যাদি অনেক স্মরণীয় নাটক। কালিদাসের পূর্বে লিখিত হয়েছে শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক। এই রচনাটির বৈশিষ্ট্য হল এর থেকে সেই সময়কার পরিবেশ এবং জীবনধারা নির্বাহ সম্পর্কে আমরা জ্ঞান লাভ করি। চতুর্থ শতাব্দীতেই আরেকটি নাটক লিখিত হয় বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস যার বিষয়বস্তু তৎকালীন রাজনীতি।

কালিদাসের সময়কাল খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্য ভাগে গুপ্ত সাম্রাজ্যের

সম্রাট বিক্রমাদিত্যের সময়ে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রাজা হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে ছিলেন ভবভূতি। তিনি বহু সংস্কৃত কাব্য এবং নাটকের রচয়িতা। 'মালতী মাধব' তাঁর উল্লেখযোগ্য নাট্যসৃষ্টি।

দশম শতাব্দীতে ছিলেন ধনঞ্জয়, তিনিও নাটকের সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন :

'অবস্থানুকৃতির্নাট্যং রূপং দৃশ্য তয়োচ্যতে।
রূপকং তৎ সমারোপাৎ দশধৈব রসাশ্রয়ম।"

সাধনকুমার ভট্টাচার্যের মতে চতুর্দশ শতাব্দী বা তারও আগে এই দেশের নাটক দশ অঙ্ক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

ভারতবর্ষের প্রথম মৌলিক বাংলা নাটক কীর্তিবিলাস। এরপর অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করলেন প্রসিদ্ধ নাট্যকারেরা যেমন মধুসূদন, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি।

প্রথম নাটক কীর্তিবিলাসের সুর বিয়োগান্ত। এটি রচনা করেছেন ১৮৫২ সালে গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত। এটি প্রথম ট্রাজেডির সুরে বাংলা নাটক। এই সালেই রচিত তারাচরণ শিকদারের ভদ্রার্জুন কমেডি বাংলা নাটক। এর পরেই প্রকৃত নাটক লেখা শুরু হল। সংস্কৃত নাটক প্রচলিত ছিল একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। অর্থাৎ হিন্দু রাজাদের সময়কাল পর্যন্ত। এরপর কয়েকশত বৎসর কোনও রকম নাটকেরই প্রচলন ছিল না। তারপর মানুষের ভাব প্রকাশের এবং দর্শকদের আনন্দ পরিবেশনের বাহন হল যথাক্রমে লোকসংগীত। মঙ্গলগান, পালাগান, পাঁচালীগান ইত্যাদি। কিন্তু ওই গান মানুষের আনন্দের খোরাক যোগালেও থেকে গেল কিছু অসম্পূর্ণতা। অব্যক্ত ভাষাকে সংগীত রূপ দেয় সত্য, তথাপি শুধু গানের মধ্য দিয়ে নৃত্যের মধ্য দিয়ে সব ভাষাই ব্যক্ত করা যায় না। অতএব এর ফলশ্রুতি হল যাত্রা। তথাপি এই যাত্রার মধ্যেও মুখ্যস্থান অধিকার করল সংগীত। কারণ মানুষ তখন অনেক কথাই কথ্য ভাষার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে সংকোচ বোধ করত। এই ভাবে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে যাত্রার প্রারম্ভিক রূপ দেখা গেল।

কীর্তন, মঙ্গল গান, ঝুমুর, ঢপকীর্তন যাত্রার অন্তর্ভুক্ত ছিল। নাটকের সূচনা প্রকৃতপক্ষে দেখা গেল ইংরেজ আমলে। যাত্রার স্থান অধিকার করল নাটক। নাটকের সঙ্গে অন্যান্য ভাব প্রকাশের মাধ্যমের পার্থক্য হল নাটক পূর্বপরিকল্পিত। এটি একটি নির্দিষ্ট স্থানে পরিবেশিত হওয়ার যোগ্য। এর বাহন হল কথ্য ভাষা।

ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন একজন রুশীয় নাম হেরাসিম লেবেডফ্। সেখানে ইংরাজী প্রহসনের বাংলা অনুবাদ অভিনীত হয় যা সম্ভবত প্রথম বাংলা নাটক।[১৫]

নাটক রচনায় যাঁরা মৌলিকতা দেখিয়েছেন এবং যাঁদের রচনা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

মাইকেলের নাটকের নাম পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী, শর্মিষ্ঠা ইত্যাদি। এর মধ্যে কৃষ্ণকুমারী পরিবেশনের দিক দিয়ে আধুনিক এবং অন্যান্য রচনার মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠ। এরপর দীনবন্ধু রচনা করেছেন নবীনতপস্বিনী, বিয়ে পাগলা বুড়ো, সধবার একাদশী, লীলাবতী, জামাইবারিক ইত্যাদি।

দীনবন্ধু রচিত নীলদর্পণ নীলকর সাহেবের অত্যাচারকেই সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত করেছে। এটি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত। দীনবন্ধুর লীলাবতী নাটকটিও নিছক গল্প নয়, নাট্যকার মানব সমাজের একটি বিশেষরূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন নাটকের মধ্য দিয়ে। এরপর মনোমোহন বসু ছয় সাতটি নাটক রচনা করেন। এঁর রচিত রামাভিষেক নাটকটি বিশেষ জনপ্রিয় হয়।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কামিনী সুন্দরীদেবী নামে একজন মহিলা নাট্যকার তিনটি নাটক রচনা করেছেন। নাট্যকার মীর মশাররফ হোসেন রচনা করেছেন বসন্তকুমারী এবং জমিদার দর্পণ ১৮৭৩ সালে। নাট্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি আঠেরো উনিশটি নাটক এবং গীতিনাট্য রচনা করেন। সবকটিই সমান উল্লেখযোগ্য এবং প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। গিরিশ ঘোষ ছিলেন একাধারে নাট্যকার এবং অভিনেতা। গিরিশচন্দ্র জীবনী অবলম্বনে ভক্তিমূলক নাটক রচনা করেছেন তাহল চৈতন্যলীলা, নিমাই সন্ন্যাস, বিল্বমঙ্গল, বুদ্ধদেব চরিত ইত্যাদি। এইগুলি অসাধারণ জনপ্রিয় হয় কারণ মানুষ তাঁদের যে রূপের সঙ্গে পরিচিত নাট্যকার তাঁদের সেই রূপেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। উপরন্তু তাঁদের জীবনের কতকগুলি অলৌকিক ঘটনা, কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনা করে তাঁদের আরও সত্য করে তোলা হল। এই ধরনের নাটকে আনন্দ দান এবং উদ্দেশ্য সাধন একই সাথে হয়।

গিরিশ ঘোষের নাটকগুলি অধিকতর মঞ্চ সফল হয়েছিল এর কারণ তাঁর নাটকে নব রসই সোচ্চার। এছাড়া ধর্মপ্রাণ ভারতবাসী সংগীত প্রেমী। গিরিশ ঘোষের নাটকে সংগীতের স্থান মুখ্য। তিনি জনা, প্রফুল্ল, পূর্ণচন্দ্র, নসীরাম,

বিষাদ, কালাপাহাড় ইত্যাদি জনপ্রিয় নাটকের স্রষ্টা। এছাড়া তাঁর কতকগুলি ঐতিহাসিক নাট্যসৃষ্টিও স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

গিরিশ ঘোষের মত অমৃতলাল বসুও নাট্যকার ও অভিনেতা ছিলেন। এঁর নাটকের বৈশিষ্ট্য হল পর্যাপ্ত পরিমাণে হাস্যরস পরিবেশন। এঁর রচিত সাত আটটি নাটক সমাদৃত হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে গিরিশ ঘোষের সমসাময়িক আরেকজন নাট্যকার ঐতিহাসিক নাটক রচনা করে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন, তিনি হলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

এই নাটকের বৈশিষ্ট্য হল এই নাট্যকারের রচিত নাটকেই প্রথম আধুনিক নাটকের স্বাদ পাওয়া যায়। যদিও তাঁর নাটকের চরিত্র সবই বিগত যুগের এবং যা ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে। তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রতাপসিংহ, নূরজাহান, শাজাহান, মেবার পতন, চন্দ্রগুপ্ত ইত্যাদি। এর মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় হল শাজাহান এবং চন্দ্রগুপ্ত।

এরপর নাট্যসৃষ্টির আসরে প্রবেশ করলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি রচনা করলেন রক্তকরবী, মুক্তধারা, ডাকঘর, ফাল্গুনী, অচলায়তন। এর মধ্যে উদ্দেশ্যমূলক নাট্যসৃষ্টি হল অচলায়তন, ফাল্গুনী ইত্যাদি আর বৈকুণ্ঠের খাতা, চিরকুমার সভা ইত্যাদি ভিন্ন শ্রেণীর এবং ভিন্ন রসের নাটক।

এছাড়া তিনি রচনা করেছেন, গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য নৃত্যনাট্য। গীতিনাট্য বলতে বুঝায় যে নাটকে গীতের স্থান মুখ্য। নৃত্যনাট্যে নৃত্যের স্থান প্রধান। কাব্যনাট্যে সমগ্র রচনায়ই কাব্যের সুর ধ্বনিত হয়। গীতিনাট্য রবীন্দ্রনাথের পূর্বেও রচনা করেছেন একজন তিনি হলেন ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান হল আলিবাবা। যা আজও সমানভাবে জনপ্রিয়। এছাড়া আছে ভীষ্ম, নরনারায়ণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য নাট্যসৃষ্টি।

বাংলা নাটক চিরদিনই নিজের পারিপার্শ্বিক সমাজ জীবনকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। ফলে অনেক সময় দেশের সমসাময়িক অবস্থা নাটকের পাত্রপাত্রীর সংলাপের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে।

বিশেষভাবে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিংশশতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত যে সমস্ত নাটক রচিত হয়েছে তার মধ্য দিয়ে সমাজের প্রচলিত কুসংস্কার, বিধবা বিবাহ বা বহুবিবাহ, বা ইংরেজের অত্যাচার ইত্যাদি বিশেষ সামাজিক অবস্থাগুলির প্রতি কখনও বা বিদ্রূপ বর্ষিত হয়েছে কখনো বা আঘাত করা হয়েছে সমস্তই নাটকের মাধ্যমে। তবে এর মধ্য দিয়ে নাট্যকারের সাধু উদ্দেশ্য যে

অনেকক্ষেত্রে চরিতার্থ হয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী যুগে নাটকের ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হয়েছে। বর্তমানযুগে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে নাটক নিয়ে বহু পরীক্ষা এবং গবেষণা চলেছে ফলে নাটকের ক্ষেত্র বহু উন্নত এবং সেই সঙ্গে তারই পাশাপাশি যাত্রার ক্ষেত্রও প্রসার লাভ করেছে।

বর্তমানে যাত্রার পরিবেশন হচ্ছে সুগঠিত এবং সুসংবদ্ধভাবে। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী নাট্যকার হলেন শ্রী বিধায়ক ভট্টাচার্য, মন্মথ রায়, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ধনঞ্জয় বৈরাগী, দেবনারায়ণ গুপ্ত ইত্যাদি আরো অনেকে।

শিব সৃষ্টি করেছিলেন তাণ্ডব নৃত্য এবং লাস্য নৃত্য। ব্রহ্মা সৃষ্ট নাটকে শিব সেই নৃত্য সংযুক্ত করেছিলেন, সৃষ্টি হয়েছিল পূর্ণাঙ্গ নাটক। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের বহু পূর্বেই ভারতবর্ষে নাটকের উদ্ভব হয়েছিল, সেই রকম গ্রীসেও খ্রীষ্টের জন্মের বহু পূর্ব থেকেই নাটক প্রচলিত হয়েছে। গ্রীসে প্রথমে চার্চের ধর্মোপাসনাকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য পুরোহিতেরা নাটকের উদ্ভব ঘটান। এই নাটকের উপাদান দেবতা। তাঁকে সকলে উপাসনা করেছে এবং এই উপাসনাকে কেন্দ্র করে এক উৎসব সৃষ্টি হয়েছে। এই নাটকেরও দুটি পর্ব ছিল। প্রথম অঙ্কে দেবতার মৃত্যু এবং তজ্জনিত শোক, দ্বিতীয় অঙ্কে দেবতার পুনর্জীবন লাভ এবং তজ্জনিত আনন্দ। তখনও ট্রাজেডি, কমেডি ইত্যাদি শ্রেণীবিভাগ শুরু হয়নি। কিন্তু বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে এটির প্রথম অঙ্কে আমরা দেখি ট্রাজেডি, দ্বিতীয় অঙ্কে কমেডি। দেখা গেল ধর্ম নয়, নাটকের প্রভাবই মানুষের মনে নেশার মত ছড়িয়ে পড়েছে। তখন পুরোহিতেরা প্রমাদ গুণলেন এবং নাটকের মাধ্যমে ধর্মপ্রচার বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু জনসাধারণ তাতে সন্তুষ্ট নয় ফলে নাটক তখন গীর্জার প্রভাব মুক্ত হয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়ল এবং অভিজাত সম্প্রদায় নাটকের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

ষষ্ঠদশ শতাব্দীর পূর্বে চার্চে যে ধরনের নাটক পরিবেশিত হত তা ছিল নিতান্ত উদ্দেশ্যমূলক। শিল্পের ক্ষেত্রে নিতান্ত নবীন বলে এই শাখাটি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। কিন্তু রেনেসাঁসের পর, প্রত্যেক জায়গায়ই প্রকৃত নাট্যসৃষ্টির একটা প্রচেষ্টা দেখা গেল।

কিন্তু সেই সময়কার নাটকও একটা নির্দিষ্ট পথ ধরে চলেছিল তাকে বলা হয় ক্লাসিক্যাল স্টাইল। তবু এই স্টাইলের প্রতি আনুগত্য রেখেও সপ্তদশ শতাব্দীতে নাটক বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয় এবং নূতন কিছু পরিবেশিত হয়। সেই সময়ে সাহিত্যে অতিপ্রাকৃতের স্থান ছিল অনেক বেশি, ফলে নাটকে তার আবির্ভাব সর্বত্র। চরিত্রগুলিও অধিকাংশ হত বীররসের দাক্ষিণ্যে পুষ্ট। কিন্তু অষ্টাদশ

শতাব্দীতে সাহিত্যে বাস্তবতার প্রবেশ দেখা গেল। এর আগেই নাট্যসাহিত্য রচনা করে শেকস্‌পীয়র অমর হয়েছেন। শেক্‌সপীয়র রচনা করেছেন সাঁইত্রিশ খানি নাটক। তার মধ্যে ঐতিহাসিক, সামাজিক সব ঘটনাই স্থানলাভ করেছে। শেক্‌সপীয়রের রচনা ছিল সম্পূর্ণরূপে ক্লাসিক্যাল। তাঁর কোন্ নাটক ট্রাজেডি এবং কোনটি কমেডি তা প্রায় চিহ্নিত। যে নাটকগুলি ট্রাজেডি সেগুলির মধ্য থেকে সান্ত্বনা পাওয়ার মত অবশিষ্ট আর কিছুই থাকে না। আর যেগুলি কমেডি সেগুলি অধিকাংশই হাস্যরসের উপর নির্ভর করে লিখেছেন। তার মধ্যে কোনও বিয়োগান্ত সুর অনুপস্থিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে সংগীতের মত নাটকও ছিল ক্ল্যাসিক্যাল। শিল্প ও সাহিত্যের নবজাগরণের পর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে রোমান্টিক নাটকের আবির্ভাব হল। রোমান্টিক নাটকের বৈশিষ্ট্যই হল লোকের অবচেতন মনের চিন্তাধারা যা মানুষ স্বীকার করে কি করে না, তারই বিশ্বাসযোগ্য রূপ প্রদান।

কমুটন রিকেট বলেছেন,

রহস্যময়তা, অসীম কৌতূহল, জীবনের সরলতা রোমান্টিক নাটকের উপাদান।[১৬]

স্লেগেল তাঁর গ্রন্থে সুন্দর ভাবে রোমান্টিক নাটকের বিশ্লেষণ করেছেন।

'সমস্ত বৈপরীত্য, প্রকৃতি ও শিল্প, আধ্যাত্মিকতা এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতি, পার্থিব এবং স্বর্গীয়, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে নিকটতম সম্বন্ধ গড়ে ওঠে।[১৭]

স্পেন রোমান্টিক নাটকের ক্ষেত্রে সবার আগেই অগ্রসর হয়েছে। কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই স্পেনে রোমান্টিক নাটক প্রসার লাভ করেছে। গ্রীসের নাটক ছিল ক্ল্যাসিক্যাল। এই নাটক একটি ধারায় শুরু হত এবং প্রথম থেকে শেষ অবধি সেই ধারায়ই নাটকটি পরিবেশিত হত।

রোমের নাটকও ছিল ক্ল্যাসিক্যাল। এই নাটকের একজন উল্লেখযোগ্য স্রষ্টা হলেন রোমের সেনেকা। শিল্পের যেকোন শাখাই যখন আর আনন্দ দান করতে পারে না তখনই তা নতুন কোনও পথ ধরে অগ্রসর হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে নাটকের ক্ষেত্রে শুধু নাট্যবিষয়ই বাস্তব হল না, পরিবেশনের ক্ষেত্রেও আরও বাস্তব পরিবেশের দাবী উঠল। বাস্তব অবস্থা বলতে দেশের সেই সময়ের রাজনৈতিক আবহাওয়া সেই সময়ের সমাজচিত্রই বুঝায়। ফলে নাটকের মধ্যে স্থান পেল একাধারে রাজনৈতিক এবং সমসাময়িক সমাজের ঘটনা। মধ্যবিত্ত জীবনের ছবি ফুটে ওঠে নাটকের মধ্য দিয়ে।

এই সমস্যাসংকুল নাটক যা মানুষকে শুধুমাত্র পূর্বের মত আনন্দিত না করে

চিন্তিতও করে তাকে দেনিস দি দেরো বলেছেন 'মর‍্যাল ড্রামা'। ইনি হলেন ফ্রান্সের লোক। এই সময়েই অনেকের মনে মতদ্বৈধতা দেখা গেল, ভাল নাটক কার উপরে নির্ভর করে? প্রথমত ভাল সংলাপ রচনার উপব না নাটকের পরিবেশনার উপর। কারণ নাটকের উপস্থাপনা এবং সংলাপেব উপরেই তার গতি নির্ভরশীল। নাট্যসৃষ্টির মূল কথা নিয়েই যখন আলোচনা এবং পরীক্ষা আরম্ভ হয় তখন তার অগ্রসরের পথে বিশেষ বাধা থাকে না। কারণ ত্রুটি যখন ধরা পড়ে তখনই স্রষ্টা সে বিষয়ে সচেতন হন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতেই আবিষ্কৃত হল কয়েকটি তথ্য, শুধুমাত্র সংলাপের উপর নাট্যকৌতূহল সৃষ্টি হয় না, কোনও একটি মাত্র চরিত্র বা একাধিক চরিত্রকে প্রাধান্য দিয়েও নাটক মঞ্চ সফল হয় না বা দুর্বলতম নাটক দিয়ে শুধুমাত্র মঞ্চসজ্জার উপর নির্ভর করেই নাটক জনপ্রিয় হয় না। কারণ সাহিত্য সৃষ্টি এবং নাট্যরচনা এক নয়। নাট্যকারকে উপরের প্রত্যেকটি বিষয় চিন্তা করতে হবে, একদিকে রাখতে হবে তাঁর স্রষ্টামনকে অপর দিকে রাখতে হবে তাঁর বিচারকমনকে। দুইয়ের সমন্বয়ে সৃষ্টি হবে প্রকৃত নাটক যা জনসাধারণের মনকে আকৃষ্ট করবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতেই নাট্যসমালোচকও খ্যাতিমান হলেন। জার্মানী সর্ববিষয়েই অগ্রগণ্য কি সংগীতে কি নাটকে। জার্মান সমালোচক লেসিংই সর্বপ্রথম বলেন নাটকে অতিপ্রাকৃতের প্রাধান্য রাখা উচিত নয়, কারণ মানুষের মন তাতেই বিশ্বাসী ও নির্ভরশীল হয়ে উঠবে ফলে পুরুষকারের প্রতি জাগবে অনাস্থা।

মন্দ লোক শুধুই মন্দ, ভাল লোক শুধুই ভাল, ট্রাজেডি নাটক শেষ পর্যন্ত ট্রাজেডিই থেকে যাবে এই চিন্তাধারাটি সমালোচকের দৃষ্টিতে আলোচিত হল। শিলার যিনি প্রখ্যাত নাট্যকার এবং সমালোচক নাটককে সর্বদিক দিয়ে বিশ্লেষণ করে উপরোক্ত চিন্তার বিরুদ্ধতা করলেন। তাঁর মতে যে খারাপ তার মধ্যে ভাল কিছু নিশ্চয়ই থাকবে কারণ সে মানুষ। মন্দের সঙ্গে এই ভালটিকেও ফুটিয়ে তুললে দর্শকের পক্ষে সেই চরিত্র বিচারের সুবিধা হয়। কারণ চরিত্র তখনই হয় বাস্তব। নাট্যসৃষ্টির নানা দিক নিয়ে আলোচনা হওয়ার ফলে এই সময়ই জন্ম নেয় রোমান্টিক নাটক।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই জর্জ ফার্কুহার নামে একজন নাট্য সমালোচক ইংলণ্ডে আত্মপ্রকাশ করলেন তাঁর চিন্তাধারা রোমান্টিক নাটকের সমর্থক।

স্যামুয়েল জনসন আরেকজন ইংলণ্ডের অধিবাসী তিনিও নাট্যসৃষ্টিতে

রোমান্টিক চিন্তাধারারই সাক্ষর রেখেছেন। নাটকের যেগুলি মূল কথা সেগুলি বললেন জার্মানের অগাস্ট উইলহেল্‌ম স্লেগেল।

নাটকে প্রত্যেকটি দৃশ্য এবং ঘটনার চাই সুস্পষ্ট প্রকাশ (পার্‌স্‌পিকুইটি) কোনওরকম সংশয় থাকলে হবে না তাহলেই জনসাধারণ অর্থাৎ দর্শকের মন তৃপ্ত হবে না।

এর সঙ্গে চাই নাটক পরিবেশনের মধ্যে ক্ষিপ্রতা (র‍্যাপিডিটি)। কোনও ব্যক্তি উপন্যাসে দশ মিনিট কাল বক্তৃতা দিতে পারে, পাঠক তা ধৈর্য ধরে পাঠ করবে কিন্তু নাটকে তা সম্ভব নয়।' সেখানে দর্শক অধৈর্য হয়ে উঠবে। সর্বোপরি সবার মধ্যেই থাকবে একটা তেজ বা শক্তি বা বেগ যা নাটকটিকে চালিয়ে নিয়ে যাবে। এর সঙ্গে থাকবে নাটকের ক্রমবর্ধমানতা, অর্থাৎ নাটকের গতি যা অব্যাহত থাকবে। নাটকের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় অংশ থাকবে না।

উনবিংশ শতাব্দীর নাটকের একটি বৈশিষ্ট্যই হল একই নাটকে ট্রাজেডি এবং কমেডি এই দুইকেই স্থান দেওয়ার প্রচেষ্টা।

উপন্যাসের সঙ্গে নাটকের পার্থক্য হল উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্টি করেন লেখক। প্রতি অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে তিনি সেই চরিত্রকে পূর্ণতার পথে এগিয়ে নিয়ে যান, কিন্তু নাটকের মধ্য দিয়ে এইভাবে চরিত্রের উদ্‌ঘাটন সম্ভব নয়। এখানে চরিত্রের ব্যাখ্যাতা চরিত্র নিজে। দর্শক যদি প্রথম থেকেই চরিত্র চিনে নিতে না পারেন বা সেই চরিত্র সম্বন্ধে কৌতূহল না জাগে তাহলে সেই সৃষ্টি অসার্থক। জীবনের চলমান বিচিত্র রূপের একটিকে ফুটিয়ে তোলা এবং তাকে উপস্থাপিত করা এর জন্য নাট্যকারকে ভাবুক হতে হবে না হতে হবে বাস্তব চিন্তা সম্পন্ন। তাই আধুনিক ছায়া চিত্রে অধিকাংশ সময়েই লেখক একজন, চিত্রনাট্যকার একজন। তিনি জানবেন কোথায় কি পরিমাণ চরিত্র রূপায়ণে তার যথার্থ প্রকাশ। সেইজন্যই নাট্যকারের প্রধান গুণ তাঁর পরিমিতি বোধ।

বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবী যেমন সব দিক থেকেই এগিয়ে গিয়েছে, যাতায়াতের পথও সুগম হয়েছে, তেমনই শিল্পে, সাহিত্যের চিন্তাধারার মধ্যেও সামঞ্জস্য দেখা যায়। নানা রকম সংস্থার দ্বারা শিল্পের প্রসার ঘটেছে একে অন্যের শিল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। কাজেই শিল্পের ক্ষেত্রে কোনও সমালোচক বা চিন্তাশীল ব্যক্তি যে মত প্রকাশ করবেন তাকে যদি আন্তর্জাতিক মত বলে ধরে নিই তাহলে পর্যালোচনা করা যাক্ আধুনিক নাটক সম্বন্ধে দুই একটি মতামত।

নাট্যকার সমালোচক বার্ণার্ড শ দেখিয়েছেন নতুন রীতির নাটকের রস

পরিস্থিতির অসাধারণত্ব বা আকস্মিকত্ব 'অপ্রত্যাশিতত্বের' উপর নির্ভর করে না।"[১৮]

শ্রীসাধন ভট্টাচার্য সি কে মুনরোর মত পর্যালোচনা করেছেন। আধুনিক নাটকের রীতি হচ্ছে

ক) অতি নিকটবর্তী বিষয় বস্তুর উপস্থাপনা,

খ) ঘটনার বা আবেগের কেন্দ্র থেকে রসকেন্দ্রকে 'আইডিয়া'র কেন্দ্রে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া।

গ) ঔৎসুক্য বজায় রাখার জন্য নতুন অস্ত্র যুক্তি বিচার প্রয়োগ করা।

ঘ) কৌতূহল বৃদ্ধির উপায় হিসাবে অদ্ভুত ও আকস্মিক ঘটনার প্রয়োগ না করা, সহজ সতেজ জীবনের আচরণ দিয়ে দর্শকচিত্ত আকর্ষণ করা।

বর্তমানে নাট্যসৃষ্টির মাধ্যম তিনটি। থিয়েটার, যাত্রা এবং ছায়াছবি। প্রত্যেকের ভিত্তিই নাটক। সেই নাটক কখনও ক্লাসিক্যাল কখনও রোমান্টিক। কখনও গীতিনাট্য কখনও নৃত্যনাট্য কখনও অপেরা।

বাংলাদেশে উন্মুক্ত স্থানে কবিগান, তর্জাগান, পালাগান পরিবেশিত হয়। যার মধ্যেও নাট্যরস অন্তঃসলিলার মত বয়ে চলেছে।

শুধুমাত্র ট্রাজেডি বা কমেডি বর্তমান নাটকে প্রাধান্য পায় না। হেগেল প্রমুখ দার্শনিকদের মতো অধ্যাপক নিকল ট্রাজেডিকে স্থায়ী বলে একান্তভাবে মেনে নেননি। তাঁর মতে ট্রাজেডি নিছক শোককে জাগ্রত করে না, ট্রাজেডির উদ্দেশ্য শোচনার উদ্রেক করা নয়, উদ্দেশ্য বিস্ময়ভাব তথা উদাত্ত মহিমাবোধ জাগানো।"[১৯]

কমেডি বলতে বুঝি পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক নাটকগুলি যখন মিলনান্ত হয়। অর্থাৎ 'সব ভাল যার শেষ ভাল'। আমাদের জীবনের ত্রুটি নিয়েই কমেডি নাটকের ভিত্তিভূমি স্থাপিত হয়েছে।

নৃত্য, নাটক, সংগীত যদিও একই গোত্র তথাপি নাটকের জন্য কতকগুলি বিশেষ গুণের প্রয়োজন, যেগুলি নৃত্য এবং গানের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় না। নাটক অর্থেই বুঝায় অভিনয়। অভিনয় বলতে বুঝায় অন্য কোনও রূপকে নিজের মধ্যে ধরে নিয়ে তার বক্তব্য প্রকাশ করা। এক কথায় দ্বিতীয় মানুষ হতে হবে, তার মধ্যে কোনও ফাঁকি থাকবে না। এর জন্য প্রয়োজন হয় বাচনভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গি, সর্বোপরি সমুচিত বেশবাস।

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক নেতাজী সুভাষচন্দ্র একটি চরিত্র। যাঁর বেশবাস, দৃপ্ত ভঙ্গির সঙ্গে বাঙালী মাত্রেরই পরিচয় আছে। যিনি নেতাজীর চরিত্রে রূপদান

করবেন তাঁর প্রথমেই চাই অনুরূপ বেশ, দ্বিতীয়ত অঙ্গ চালনা, তৃতীয়ত বাচন ভঙ্গি। এরজন্য অভিনেতাকে উল্লিখিত চরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করতে হবে। অতঃপর আসে একাত্ম বোধ, চাই দিনের পর দিন অনুশীলন। চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা। অর্থাৎ অভিনীত চরিত্রটি অভিনেতার ধ্যান জ্ঞান হওয়া উচিত। কল্পিত চরিত্রও অভিনয়ের জন্য অনুরূপ পরিশ্রমের প্রয়োজন।

অভিনীত চরিত্রটিকে নাটকের অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। দর্শক তা নাহলে চরিত্রটির গুরুত্ব অনুভব করতে পারবে না।

ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থে নাটকের সমস্ত প্রয়োজনীয় অংশের অতি সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন। তাই নাট্যশাস্ত্র হাজার বৎসর পরেও একটি অতি প্রয়োজনীয় ও বিতর্কমূলক গ্রন্থ।

পাশ্চাত্য থিয়েটারের জন্মকথা আলোচনা করলে দেখা যায়, ভরত তাঁর গ্রন্থে সবকিছুরই বর্ণনা দিয়েছেন অর্থাৎ ভরতের নাটকে কিছুই নূতন নয়। পার্থক্য হল দৃশ্যসজ্জাগুলি বর্তমানে আরও উন্নত মানের এবং বিজ্ঞানসম্মত।

ভরত অনেকক্ষেত্রে ইওরোপের অনুসরণে মঞ্চ প্রস্তুত করেছেন। সুদৃশ্য করে তোলার জন্য এবং সময় বাঁচাবার জন্য কোনও প্রথা যে দেশেই আবিষ্কৃত হোক না কেন সর্বত্রই বরণীয়।

নাটক বলতে সাধারণত আমরা চার শ্রেণীর নাটক বুঝে থাকি। দুঃখের, আনন্দের, হাসির বা ব্যঙ্গের। ব্যঙ্গ কবিতা প্রথম রচনা করেন হোমার।

আদি কবিতা এবং কাব্য বলতে বুঝায় হোমারের ইলিয়ড এবং অডিসি। যেমন ভারতের রামায়ণ এবং মহাভারত। সুখ এবং দুঃখের নাটক বলতে বুঝায় মিলনান্ত এবং বিয়োগান্ত নাটক। ব্যঙ্গ নাটক বলতে সাধারণত ব্যক্তি বা সমাজকে ব্যঙ্গ করে যে নাটক সৃষ্টি হয়।

বর্তমানে নাটকের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ধরনের সুর ধ্বনিত হচ্ছে। যার কিছু অংশ দর্শকের সমাদর লাভ করে কিছু বা অনাদর লাভ করে। তবে নাটক তারই মধ্য দিয়ে জয়যাত্রার পথে ক্রমশই অগ্রসর হচ্ছে।

শিল্পজগতে নাটকের ক্ষেত্রটি ঊর্ধ্বে। বিষয়বস্তু পরিবেশনার জন্য নাটকের এলাকাটিও সুবিস্তৃত। নাটক তত্ত্ব ও বিরোধী তত্ত্বকে একই ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। সাধারণ জীবনের কোনও বিশেষ গুণ আদর্শ, ঘাত প্রতিঘাতজনিত ফলশ্রুতি প্রদর্শনই বড় হওয়ায় নাটক অসাধারণ। সাধারণত নাটক জাতীয় জীবন, ধর্ম ও সংস্কৃতির বাহক হয়ে ওঠে বিভিন্ন পটভূমিকায়, কখনো বা

কাব্যছন্দে, কখনও বা গানের সুরে, ফলত কোনও সুদূরপথের সন্ধানলাভ নাটকের দ্বারাই সক্ষম।

নাটকের প্রধান ভূমিকায় থাকে নায়ক নায়িকা, এদেরই পরিবেষ্টনে বিভিন্ন চরিত্রের এবং আদর্শের সমাবশ ঘটে।

নায়ক নায়িকার উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে ধর্ম, সংস্কার রীতি, নীতি, প্রচলিত ভাবধারা সম্বন্ধে একটি ধারণা জন্মায়। অন্তিমে একটি সচেতন প্রেরণার উৎস স্থান রূপে গণ্য হবার জন্যই নাটক হয়ে থাকে ভাবোদ্দীপক এবং এই ভাব সম্প্রসারণ ক্রিয়ায় একটি ঐশী শক্তি তার নৈতিক গুণাবলী নিয়ে যবনিকার অন্তরালে সুপ্ত থাকে ইচ্ছা কামনা বাসনা ইত্যাদিকে রূপায়িত করে তুলবার জন্য। এইভাবে নাটক সর্বজনগ্রাহ্য বিষয়বস্তু পরিবেশন করে সর্বকালে এবং সর্বস্থানে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম। ব্যক্তির মধ্য দিয়ে সুন্দর এবং সত্যের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই নাটকের সৌন্দর্যানুভূতির উপলব্ধি হয়।

মহাকাব্যকে জাতির কোনও বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঐক্য সাধনায় লিপ্ত হতে দেখা যায়, নাটকে এই ঘটনাটি হয় ব্যক্তিকেন্দ্রিক, ব্যক্তির জীবন হতেই পাওয়া যায় জাতীয় জীবন-মহাজীবনের সংবাদ। নাটকে যে ঘটনা বা আদর্শের প্রতিষ্ঠা নেই, মহাকাব্যে তার চিন্তা অলীক। মহাকাব্য উদ্দেশ্যমূলক কিন্তু নাটক একটি বিষয় ও সবিশেষ কর্মসূচী নিয়ে অগ্রসর হয়।

নাটকের রচনা শৈলীতে ঘটনা, স্থান ও কালের উল্লেখ করেছেন হেগেল। এ্যারিস্টটল্ এই কালও স্বল্পকাল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং নাটকীয় ঐক্য সাধনে স্থানের কোনও ভূমিকা দেখেননি। কিন্তু গ্রীক নাটকে স্থানের গুরুত্ব স্বীকৃত,, সমবেত ভাবে অংশগ্রহণে যন্ত্রসংগীতের অবস্থিতি সাবলীলভাবে গ্রীক ট্রাজেডি সার্থক করে তুলেছে। নাটক মহাকাব্যের মত কল্পনার আশ্রয়ে ইন্দ্রিয়ানুভূতি জাগায় না, নাটকের সৌন্দর্যসৃষ্টির মূলে যে ইন্দ্রিয় সচেতনতা তার মূলে চক্ষু কর্ণ সমপর্যায়ে ক্রিয়াশীল থাকে। তাই পট পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছেন হেগেল। কালবিচারের ক্ষেত্রেও সেই একই নির্দেশ করেছেন। একটি বিরাট সময়ের অবতারণা করলে বা ব্যবধান দেখিয়ে ঘটনা রূপায়িত করলে অনেক ক্ষেত্রে তা অবাস্তব ঠেকে। সেইজন্য কালকে দুই চার বৎসরের মধ্যেই সীমিত রাখলে ভাল হয়—যার মধ্যে দেশের কিংবা জাতির জীবনে বিরাট কোনও পরিবর্তন ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে।

নাটকের ক্ষেত্রে বিপরীত চরিত্রের পাত্রপাত্রী নাটকের নায়ক নায়িকার পথ সুগম করে এবং নাটক বিপরীত ধর্মের সংঘাতেই বিশেষ রূপটি লাভ করে।

নাটক যদি জাতীয় জীবনে সাধারণ চরিত্র সমূহের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত করে রচিত হয় তবে সে নাটক জনচিত্ত জয়ে অক্ষম হয় কেননা মানুষের জীবনে বিভিন্ন আদর্শের সংঘর্ষ হয়, বিভিন্ন ঘাতপ্রতিঘাতের সৃষ্টি হয়, এর মধ্যেও মানুষের মহত্তর জীবনের স্বাদ গ্রহণের লিপ্সা সজাগ থাকে। নাটকে ব্যক্তিসত্ত্বা বিশ্বসত্ত্বাকে উদ্ভাসিত করে। সেইজন্যই স্থানকাল বিচারের মত ব্যক্তি বিশেষের চরিত্র প্রদর্শনও নাটকের প্রধান গুণ স্বরূপ বিবেচিত হয়, কেননা চারিত্রিক সংঘর্ষই অবশেষে মহৎসত্ত্বাটিকে তুলে ধরে।

নাটকের সৌন্দর্য নির্ভর করে বহুল পরিমাণে শিল্পীর কর্মদক্ষতার উপর। মানুষের দৃষ্টি সাজসজ্জা, চাকচিক্যের প্রতি থাকে না। নায়ক এখানে নিজেকে বিলুপ্ত করে দিয়ে অভিনীত চরিত্রকে অবলম্বন করে এগিয়ে দাঁড়ান। দৈহিক গঠন, কণ্ঠ, বুদ্ধি পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা এইগুলি অভিনেতার মুলধন স্বরূপ বিবেচিত হয়। শ্রোতা স্বভাবতই আকুল হন ভাব পরিবেশনের ক্ষেত্রে। নায়কের অঙ্গভঙ্গি বাক্ বিনিময় কুশলতা, চালচলন এমনকি মুখের ভাবটুকুও স্মরণীয় হতে পারে এবং স্বীকৃতি লাভ করে শ্রোতার কাছে।

চিত্রে ভাস্কর্যে শিল্পী দেখান তুলি রং-এর ছাপ কাগজে অথবা প্রস্তরের উপর হাতুড়ি বাটালির ক্রিয়া কিন্তু নাটকে শিল্পীর নিজস্ব কোনও ধ্যান ধারণা রূপায়িত করবার থাকে না, নাট্যকারের সৃষ্ট চরিত্রের রূপদান করার দায়িত্ব শিল্পীর যেখানে শিল্পী নাট্য চরিত্রের সঙ্গে নিজের ব্যক্তি চরিত্র মিলিয়ে ধরেন। এক্ষেত্রে কোনও প্রকার খুঁত থাকলে ব্যর্থ হয়ে যায় নাট্যকারের চরিত্র চিত্রণ, ব্যর্থ হয় নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভাব ও রসের সৃষ্টির ক্ষেত্র বিচারে সংগীত শিল্পীর সঙ্গে নাট্যশিল্পীর একটি গুণগত মিল সাময়িক ভাবে খুঁজে পাওয়া গেলেও নাট্যশিল্পীর পক্ষে নির্দিষ্ট স্থানকালের ব্যবধানে ভাব হতে অন্য ভাবে, রস হতে ভিন্ন রসে, নিজের ব্যক্তিসত্ত্বাকে নাট্যচরিত্রের সঙ্গে প্রবাহিত করে দেওয়া শ্রম ও সাধনার চরম পরীক্ষা স্বরূপ। সর্বমানুষেরই ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করা নাট্যকারের গুরুদায়িত্ব। শেক্সপীয়রের নাটকগুলি হতে শিল্পীরা এখনও পর্যন্ত মানবিক ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করতে সক্ষম যদিও ভাষার রাজ্যে মানুষের জাতীয় জীবনের পটভূমিকায় বহু পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে।

নাটক দর্শনে মানুষের জীবনেও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সারিপুত্র বুদ্ধদেবের জীবনাদর্শমূলক নাটক দেখেই অনুপ্রাণিত হয়ে সংসার ত্যাগ করেছিলেন। বর্তমান যুগে মহাত্মা গান্ধীর সত্যানুসন্ধান কার্যে ব্রতী হওয়ার মূলেও হরিশচন্দ্র নাটক পরিদর্শনের কথা তাঁর জীবনীতে স্বীকৃত হয়েছে।

ভরত এবং এ্যারিস্টটল্ উভয়েই নাটকের রস ও কাহিনী এই উভয়বিধ মৌল উপাদানের কথাই স্বীকার করেন। ভরত যেখানে রসই প্রধান উপজীব্য বলেন, এ্যারিস্টটল্ সেখানে কাহিনীর উপর জোর দেন কেননা নাটক সাধারণতই কোনও ঘটনা অনুযায়ী হয়ে থাকে। এছাড়া নাটমঞ্চ, নাটকে কোন বিষয় প্রকাশিত কি অপ্রকাশিত থাকবে, নাটকের সময় স্থান ও ক্রিয়া সম্পর্কে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করেছেন। দৃশ্যপট এবং সংগীতের প্রয়োজনীয়তা উভয় ক্ষেত্রেই স্বীকৃত।

ভরত নাটকে স্ত্রীলোকের অংশগ্রহণ প্রয়োজনীয় দেখেছেন যা পাশ্চাত্যের বিবেচনায় অতি সাম্প্রতিক কালের গ্রহণীয় ঘটনা। নাটকের বিষয়বস্তু ঘটনা কেন্দ্রিক। ইতিহাস, ধর্মগ্রন্থ অথবা সমাজ জীবন হতে এই ঘটনার উপকরণ সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

নাটকের নায়ক-নায়িকার জীবনকে কেন্দ্র করে কোনও বিশেষ সুখদুঃখের ঘটনা পরিচালিত করা হয়ে থাকে। সংগীত সংলাপ ইত্যাদি ছাড়াও নাটকের পরিধি আরও বিস্তৃত হয়ে দেখা দেয় তাই নাটকের মধ্যে হাস্যরস পরিবেশন অথবা নাটকের মধ্যে কোনও ক্ষুদ্র একাংক নাটকের অবতারণা কিছুই অবাস্তব বলে ধরা হয়নি।

নাটকে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিত্তে দুর্বল শ্রেণীর লোকেরাই চিরদিন এগিয়ে এসেছেন। নাটকের আবেদন সর্বস্তরে প্রসারিত হওয়ায় ধনী দরিদ্র সর্বশ্রেণীর লোকেরাই সমভাবে নাট্যসমাদরে এগিয়ে আসেন। নাটকের অভিনয়ে দেশকালের বিভেদ নেই, সুঅভিনীত হলে সর্বকালের সব নাটকই সর্ব শ্রেণীর দর্শক আকর্ষণ করতে সক্ষম। নাটকের ভাষা যেখানে দুরূহ, অভিনয় কুশলতা প্রাঞ্জল করে মূল বক্তব্য। নাটকের ভাষা সাধারণ হলেও অভিনয় কৌশলে নাটক অনেক ক্ষেত্রে রাজকীয় মর্যাদা অর্জনে সক্ষম হয়। বর্তমানে সংগীত ও অন্যান্য শিল্পকলা চর্চার মধ্যে যে আধুনিকতার অনুসন্ধান নাটকেও তার অনুপ্রবেশ লক্ষণীয়।

ঘটনা আজগুবি, তুচ্ছাতিতুচ্ছ হলেও ক্ষতি নেই, কোনও নির্দিষ্ট কাহিনী বা চরিত্রের পরিণতির দিকে নাটকের লক্ষ্য না থাকলেও সমঝদারের ক্ষোভ নেই, কাহিনী যত বিক্ষুব্ধ আকারই নিক, বিচ্ছেদ বা প্রতারণা যতই ভীষণ আকার ধারণ করুক, দর্শক কিন্তু নাটকে স্বীয় জীবনের সামান্যতম প্রতিফলন দেখেও খুশী হয়; সমাজে যারা নিপীড়িত তারা আনন্দ লাভ করে নিপীড়নের তীব্রতা উপলব্ধি করে। শেক্সপীয়র বলেছেন পৃথিবী হচ্ছে রঙ্গমঞ্চ, আমরা অভিনেতা। সার্থক

নাটক মাত্রেই বিশ্বজনীন হয়ে ওঠে কারণ পাত্রপাত্রীদের স্বভাবগত মিল থেকেই যায়, সে পৃথিবীর যে কোনও দেশই হোক না কেন।

এবার চিত্র, স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের প্রসঙ্গে আসা যাক। চিত্র, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য এই তিন শিল্পেরই গুণ বিচার মূলত চোখের উপর নির্ভরশীল, সেই কারণে অর্থানুসন্ধানে চোখেরই প্রধান স্থান ধরা হয়। স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যে অবশ্য স্পর্শবোধেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। মানুষের নিত্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রে স্থাপত্য শিল্পের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক, সেক্ষেত্রে কাব্য, চিত্র, ও ভাস্কর্যের স্থান গৌণ।

মানুষ প্রথম স্তরে দর্শনে উৎফুল্ল হয়, তারপর স্পর্শ করবার জন্য ব্যগ্র হয় তার জ্ঞান এবং উপলব্ধিকে সম্পূর্ণ করবে বলে।

চিত্র স্পর্শ দ্বারা বোঝা যায় না কিন্তু মানুষের বাসনার নিবৃত্তি হতে চায় না বিশেষ করে কয়েকটি ক্ষেত্রে যেমন যে সমস্ত চিত্রে রং-এর দ্বারা ত্রিতল ক্ষেত্র রচনার চেষ্টা করা হয়। চিত্রাঙ্কন ও রঙীন ভাস্কর্য উভয়েরই পৃথক রূপে বৈশিষ্ট্য বিচার করলে উভয়েরই সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়।

ভাস্কর্যের শেষ যেখানে সেখানে চিত্রের আরম্ভ অথবা চিত্রের প্রয়োজনে ভাস্কর্য, অথবা ভাস্কর্য প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য চিত্র ইত্যাদি তত্ত্ব এবং তথ্যগুলি উল্লেখযোগ্য। কারণ মানুষ অপরূপ চিত্র, ভাস্কর্য স্থাপত্য দর্শনে চক্ষুর তৃষ্ণা নিবারণেই ক্ষান্ত, শিল্পরূপে তার অর্থ হয়ত অনির্বচনীয়। অথচ ব্যবহারিক জীবনে এগুলির প্রয়োজন কোথায় ? দৈনন্দিন জীবনের সংগ্রহার্থে শিল্পসৃষ্টি হলে শিল্পের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় মূল্যের চুলচেরা বিচার দেখা দিলে শিল্পের উদ্দেশ্যরূপে প্রমাণিত হয় ভোগসুখ (হেডনিজম্) নিবারণ।

শিল্প সুন্দরকে অতিক্রম করে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় না। এছাড়া শিল্প যে সত্যের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় সে সত্য ধারণা সঞ্জাত এবং অভিজ্ঞতাজনিত। উপরোক্ত মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হলে এই শাশ্বত মতবাদের বিকৃতি ঘটে।

চিত্র তার দ্বিতল বিশিষ্ট আকৃতি নিয়ে তুলে ধরে সুন্দরের একটি সত্যধারণা, ছায়াসদৃশ অবিকলতা, সঠিকের অনুকৃতি না হয়েও 'হতে পারে' এই মনোভাব গড়ে তোলে।

স্থপতিকার চোখের সামনে মহৎকে ক্ষুদ্র বা বৃহদাকারে প্রতিষ্ঠিত করেন, তার মধ্যে বহু দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মনোভাবের সুষ্ঠু সংমিশ্রণ ঘটে, তবুও সেই সৃষ্টি মানুষের মনে সাড়া জাগায় যেমন অজন্তা গুহার চিত্রাবলী, গুহাগুলিও লক্ষণীয়। বুদ্ধের স্তূপ, অশোকের স্তম্ভ, কোনারক, অঙ্করবোট, বোরোবদুর ইত্যাদি মানুষের

মনে আলোড়ন তোলে সেগুলি চিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্যের এক একটি মহাযজ্ঞশালা।

কয়েক ধরনের শিল্পকলা, চিত্রকলার পাশাপাশি ধরা হয়। যেমন কাগজ, কাপড় বা বিভিন্ন বস্ত্র একত্র জুড়ে শিল্প প্রচেষ্টাকে বলা হয় 'কোলাজ'। প্রস্তর অথবা ধাতুপাত্রে খোদাই চিত্রসমূহ, দেওয়াল চিত্র, মোজেইকের কাজ, উচ্চনীচ ক্ষেত্রের উপর শিল্পসৃষ্টি ইত্যাদি সমগ্র শিল্পসৃষ্টিই নয়নাভিরাম, চিত্রের অতি সন্নিকট হয়েও কোথাও প্রদান করে ভাস্করের প্রতিভা, কোথাও বা স্থপতিকারের নৈপুণ্য।

ছায়াছবি, ছবিযুক্ত কাচ (স্লাইড) যেগুলি আলোকসম্পাতের দ্বারা দেখান হয়ে থাকে সেগুলি 'নাট্যরূপ', 'চিত্ররূপ' রূপে বর্ণিত হয়েছে। ধাতু বা মৃৎ পাত্রে চিত্রণ বহু পুরাতন রীতি।

ভারতে চৌষট্টি প্রকার কলাবিদ্যার মধ্যে অনেক শিল্পকলাকেই চিত্র, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ইত্যাদি মর্যাদা হতে বিচ্ছিন্ন করে জীবনের প্রয়োজনের তালিকায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ভাস্কর্যে জড়পিণ্ডের মধ্য দিয়ে ত্রিতলবিশিষ্ট রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়। সামঞ্জস্যের জন্য স্থানের পরিমাপে বিশেষজ্ঞ হওয়াও ভাস্কর্যের একটি প্রধান অঙ্গ।

রীডের মতে চিত্রের মত দ্বিতল বিশিষ্ট রূপ প্রকাশে ভাস্কর্যের দক্ষতা নয়। ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্য হল একটি নিষ্প্রাণ জড়পিণ্ড, বাস্তব সদৃশ হয়ে দর্শকের নিকট পৌঁছাতে চায়। তাই ভাস্কর্যের প্রথম এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তাকে প্রাণবন্ত করে তুলতে হয়। দর্শনে এবং স্পর্শনে এর পরিতৃপ্তি। ফলত ভাস্কর্য যখন ত্রিতল বিশিষ্ট রূপ প্রকাশ করে তা এইভাবেই আমাদের প্রাণে সাড়া জাগায় এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে সতেজ করে। ভাস্কর্য এইভাবেই চিত্রের প্রভাবমুক্ত হয়ে দর্শনীয় এবং স্পর্শনীয় হয়। খোদাই ক্রিয়াসমূহ অথবা খোদাই করা রঙীনচিত্রসমূহ যা দর্শন করবার তা স্পর্শানুভূতি জাগাতে পারে না—তাই তার আনন্দ জাগাবার সীমাও সীমিত। যেমন রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

'তুমি কি কেবলি ছবি, শুধু পটে লিখা'

অবশ্য একথা চূড়ান্ত সত্য নয় বা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্যও নয়। রীডের মতে ভাস্কর্যের স্পর্শানুভূতি জন্মায় সঠিকভাবে স্থান (স্পেস) গুলি তৈরি হলেই। এক্ষেত্রে কোথাও বা শূন্যস্থান, কোথাও ভিতরে বা কোনো ঘেরা জায়গার মধ্যে খোদাই করার প্রয়োজন দেখা দেয় যা পরিমাণগত এবং সঠিকভাবে অনুধাবনীয়। যেহেতু ভাস্কর্যের সর্বত্রই পরিমাপের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে

সেইজন্য এই ক্রিয়া স্থপতিকারের প্রতিভার একটি পর্যায়রূপে তুলে ধরলে ভাস্কর্যের সঙ্গে স্থাপত্য শিল্পের মিল খুঁজে পাওয়া যাবে।

শুক্রনীতিশাস্ত্রে ভাস্কর্যের এই মাপগুলি মুঠি, অঙ্গুলী, যব, অঙ্গ ইত্যাদি নামে ভূষিত করা হয়েছে। চিত্রের মধ্য দিয়ে যে দ্বিতল বিশিষ্ট রূপ ফুটিয়ে তোলা হয় তা কাগজে, কাপড়ে বা কোনও বস্তুখণ্ডের উপরে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে বা স্থানটির বিস্তৃতির মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়, কাজেই ত্রিতলের অস্তিত্ব মানুষের মনেই থেকে যায়, স্পর্শানুভূতির দ্বারা উপলব্ধির ইচ্ছা জাগরিত হয় না। কাজেই চিত্রের অস্তিত্ব থেকে কিন্তু প্রাণস্পন্দন অনভূত হয় না।

হাইআগ তাঁর প্রবন্ধে সমঝদারের অবস্থাটিও কল্পনা করেছেন যা বাহ্যত অবাস্তব নয়। যেমন কোনও মহৎ শিল্প অনুধাবনের সময় যদি শিল্পকার্যের উপলব্ধির ছাড়াও, অপর কার্যের দ্বারা ইন্দ্রিয়ানুভূতি ভিন্নপথে চালিত হয় তবে মূল শিল্পকর্মটি থেকে প্রকৃত রসাস্বাদন সম্ভব হয় না। সমগ্র শিল্পসৃষ্টি প্রসঙ্গেই এ প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। নাটমঞ্চের সাজসজ্জা, চিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে নায়ককে উপস্থাপিত করা, গায়ক কোনও মহৎ ভাস্কর্যের অথবা স্থাপত্য শিল্পের পটভূমিকায় যদি গান ধরে, চিত্র পরিদর্শনের সময় যদি তীব্র বিলাসদ্রব্যের গন্ধের দ্বারা সুরভিত হয় বা সেই পরিবেশেই যদি অন্য শিল্পের প্রদর্শনী চলে, তখন বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে একটি সহ অবস্থানের মানসিকতা তৈরি হয় যাতে সমঝদারের সামগ্রিক রসাস্বাদনে বিঘ্ন ঘটে।

কোনও গীত শ্রবণ কালে সংলাপে উদ্দেশ্যের প্রতি ঝোঁক দেওয়া হলে, বিদেশে সমাদৃত সুর বা যন্ত্রের অপপ্রয়োগ হলে, শিল্পীর কণ্ঠ সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও শ্রোতা অনীহা প্রকাশ করতে পারেন। যেমন বাংলার পল্লীগীতি, লোকগীতি গুলি প্রান্তীয় ভাষার উচ্চারণেরবৈশিষ্ট্য হারিয়ে গাওয়ার ফলে গানগুলির আকর্ষণ ক্রমশই নষ্ট হওয়ার উপক্রম দেখা দেয়।

অনেক সার্থক শিল্পকর্মই একঘেয়েমি ও বিশেষ কোনও পদ্ধতির উপর সামঞ্জস্যহীন ভাবে জোর দেওয়ার জন্য নিন্দিত হয়, কোনও শিল্পী বা গোষ্ঠীরই আধুনিকতার অজুহাতে নিজেদের দুর্বলতা ঢাকবার প্রয়াস দেখা দিলে, সমাদৃত ক্রিয়াও অপাংক্তেয় থেকে যায়।

অনেক ক্ষেত্রে শিল্প সমালোচক শিল্পসৃষ্টিকে সমাদৃত বা অনাদৃত করে তুলতে সক্ষম হন। ফলত দেখা যায় সাধারণ শিক্ষিত জনগণই শিল্পকর্মের যথার্থ সমাদর করতে সক্ষম। প্রচারকার্য অনেকক্ষেত্রে প্রকৃত শিল্পসৃষ্টির প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে।

প্রশ্ন থেকে যায় চিত্রের মাধ্যমে কি ত্রিতল বিশিষ্ট রূপ ফুটিয়ে তোলা যায় না ? হয়তো বা যায়। রং-এর উপর রং-এর প্রলেপ দিয়ে যদি চিত্রকে ত্রিতল বিশিষ্ট করে তোলা যায়ও তবে তাকে বলা যায় রঙীন ভাস্কর্য।

চিত্রের ব্যাপকতা বা গভীরতা ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইলেও চিত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার ভাবনার ক্ষেত্র সুদূর প্রসারিত। মানুষের বোধ, ইচ্ছা, অনুপ্রেরণা, উদ্দেশ্য ঐগুলিকে চিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে হলে প্রাথমিক বুদ্ধির চেয়েও যে চিত্তবৃত্তির বেশি প্রয়োজন সেটি হল জ্ঞান।

জ্ঞানের স্ফূরণ যে ক্ষেত্রে স্পষ্ট নয়, যে চিত্র মানুষকে বিভিন্ন রূপে ভাবিয়ে তোলে না, সর্বচিন্তায় সর্বংসহা করে তোলে না, সর্বক্ষেত্রে বা সর্বকালে যার আলোড়ন নেই তা চিত্র হয়েও অনুকৃতি মাত্র, মনমাতানো শোভাবর্দ্ধক স্বরূপ। যেগুলি প্রায়ই অলীক, নকল বা ভ্রান্তরূপ পরিগ্রহ করে। কোনও বিশেষ আদর্শ খাড়া করে যদি চিত্র সৃষ্টি হয় তবে মানুষ আদর্শকেই প্রধান বিবেচ্য করে তোলে, চিত্র সেখানে লোকচলাচলের মধ্যস্থতা স্বীকার করেই ক্ষান্ত হয়। এখানেই হেগেলের মতবাদ সার্থক রূপে পরিগণিত হয়। শিল্পের শেষ নেই আমরা ক্রমশই সেই পরমসত্তার দিকে এগিয়ে চলেছি, শিল্প যার বাহন। সেই শিল্প সৃষ্টির পথ কি কখনও শেষ হয় ? পৃথিবী থেকে বুদ্ধি যেদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, শিল্পেরও শেষ হবে সেইদিন। সক্রেটিসও শিল্পের মূলতত্ত্বে পৌঁছাতে পারেননি অবশ্য পৃথিবীতে আরও পরে জন্মগ্রহণ করলে হয়ত পারতেন, যাই হোক তিনি চিত্র ও ভাস্কর্যের বিচারে অন্যান্য শিল্পের মত অনুকরণের তত্ত্বকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং কালে অনুভূতির ক্ষেত্রে এর পরিধি বিস্তার করেছিলেন।

যেভাবে পাশ্চাত্যে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে শিল্পসমূহের বিচার করা হয়, প্রাচ্যের ক্ষেত্রে আদি ইতিহাস তেমন ছিল না। ভরতমুনি নাটকের গুণধর্ম ক্রিয়াশীলতাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। অন্যান্য শিল্পকর্ম আনুষঙ্গিক রূপে উপস্থাপিত।

> ন তজ্জ্ঞানং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা।
> ন তৎকর্ম ন বা যোগো নাটকে যন্ন দৃশ্যতে ॥
> সর্বশাস্ত্রানি শিল্পানি কর্মানি বিবিধানিব ॥
> অস্মিন্নার্থ্যে সমেতানি তস্মাদেতন্ময়া কৃতম।"

পাশ্চাত্যে অনুকরণ তত্ত্বটির ক্রম রূপায়ণ ঘটতে থাকে এবং আনন্দদায়ক রূপে কাব্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য ইত্যাদি শিল্পকর্মের অস্তিত্ব স্বীকৃত হতে থাকে যা হেডনিজমকেই বড় করে তুলেছিল।

প্লেটো এই অবস্থার নিন্দা করেছেন এবং সেইজন্যই তিনি 'রিগেরিস্টিক হেডনিজম' রূপে শিল্পের স্থান চিহ্নিত করেছেন আবেগ জাগরণকারী রূপে। এটি তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'আইডিয়াল রিপাবলিক' গ্রন্থে। রেনেসাঁসের যুগে মতবাদের পরিবর্তন ঘটতে থাকে, কল্পনার স্থান প্রধান রূপে বিবেচিত হয়। কিন্তু কল্পনার আর্শীতেই শিল্পপ্রতিভা জাগ্রত হল, প্রস্ফুটিত হল যথার্থ প্রতিবিম্ব।

তখন চিত্র ভাস্কর্যের ক্ষেত্রটি ঈশ্বরের দয়ায় প্রাপ্ত প্রতিভারূপে স্বীকৃতি পেল বা বলা যায় 'ভেরিসিমিলিটিউড',রূপে। চিত্র ও ভাস্কর্যে সার্থক অনুকরণ সীমিত রূপে স্বীকৃতি পেলেও কাব্যে অথবা স্থাপত্য বিদ্যায় কোনও প্রকার অনুকরণ হয়ে উঠল অচল বিষয়বস্তু।

ডেকার্টস খৃষ্টান দার্শনিক ছিলেন। তিনি এ্যারিস্টটল্ এর মতো আনন্দের উপলব্ধি যে বোধশক্তির সঙ্গে আনুপাতিক হারে জড়িত তা স্বীকার করে নিলেন। বর্তমানকালের মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাধারার বিকাশ শিল্পসৃষ্টির মূল্য বিশ্লেষণে সহায়ক হল। ডেকার্টস্ আত্মার প্রবৃত্তিসমূহ (প্যাশন্স্) ভালমন্দরূপে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, ভরত নাট্যশাস্ত্রে বহু পূর্বেই অনুরূপ চিন্তার বিকাশ ঘটিয়েছেন। বীভৎস, ব্যভিচার ইত্যাদি রসের মাধ্যমে ভাবের বিভিন্ন বিকাশ, আত্মার ভাব অনুভাব সমূহের ক্রিয়া সমস্তই স্থান পেয়েছে তাঁর নাট্যশাস্ত্রে।

প্রাচ্যের শিল্পচিন্তায় ধ্বনিবিচারে অথবা বাস্তুকর্মে ভাবসমূহের প্রভাব ভিন্নভাবে দেখান হয়। এখানে সৌন্দর্য বিকাশের আকাঙ্ক্ষা এবং হার্দ ভাব ভাস্কর্যের ভিত্তি স্থাপনা করে। সূক্ষ্ম প্রচেষ্টাটিকে যত্ন সহকারে প্রয়োগ করার পদ্ধতির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় ফলে প্রাচীনকাল থেকেই শিল্পে প্রতীক, রূপক, অলংকার, ব্যঞ্জনা, পরিবেশ, স্থানকাল সবই সুচিন্তিত রূপে প্রক্ষেপের ব্যবস্থা রয়েছে এবং এর জন্যেই মানসিক চিন্তাধারার বিকাশ, শিক্ষা নৈপুণ্যের প্রতি ধ্যান, সাধনার দ্বারা ইন্দ্রিয়াতীত এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে চিত্তপটে আহরণ করার জন্য বিভিন্ন দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক ঘটনা সমূহের প্রভাবও লক্ষিত হয়। সেইজন্যই প্রাচ্যের স্থাপত্য কর্ম সমূহে আমরা লক্ষ্য করি প্রতীক ধর্মিতা, যেমন আছে অশোকস্তম্ভে, সাঁচীস্তূপে, মন্দিরে ও গৃহনির্মাণ পদ্ধতিতে। ভাস্কর্য তুলে ধরে সেই মূর্তি ও মহিমা যা শুক্রনীতিসারানুসারে মনুষ্য বা জীবাকার হয়েও হবে অতিমানবিক, অতি প্রাকৃতিক এবং মহাকাল ও বিশ্বের সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী।

উপরোক্ত ভাবে বিশ্লেষণ করলে কিন্তু কাব্যই সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ শিল্প, কারণ স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য ক্ষেত্র দ্বারা সীমাবদ্ধ। সংগীত সময় দ্বারা সীমাবদ্ধ কারণ

নির্দিষ্ট সময় পরেই তা অন্তর্হিত হয়, তার কোনও ভিত্তি থাকে না যার উপরে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

কিন্তু কাব্য ক্ষেত্র দ্বারাও সীমাবদ্ধ নয় এবং নির্দিষ্ট সময়ের পরেও তার কোনও অবলুপ্তি ঘটার সম্ভাবনা নেই।[২০]এসব সত্ত্বেও আবার অনেকে বলেন নাটকের স্থান এই সমস্ত কলাসমূহের সর্বশীর্ষে।

ইংরাজীতে প্রবাদ আছে ঢং বা রীতিই হচ্ছে মানুষ। (স্টাইল ইজ্ দি ম্যান)। শিল্পের ইতিহাসে রীতি হচ্ছে মূলভিত্তি। শিল্পীর সমগ্র স্বাধীনতার প্রকাশ ঘটে তাঁর শিল্পশৈলীর মধ্য দিয়ে।

কুমারস্বামীর মত অনুযায়ী শিল্পীদের রেনেসাঁস যুগের আত্মগর্বিতভাব এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর মানবিকতা প্রকাশের ঝোঁক এর সঙ্গে মধ্যযুগের শিল্পরীতির কোনও সংস্পর্শ নেই।

অষ্টম হতে দশম শতাব্দীতে শিল্পীরা ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত হতেন না। তখনকার দিনে ছিল সৃজনধর্মী শিল্প। খুব কম শিল্পীরই নাম প্রচারিত হত সে যুগে।[২১] কুমারস্বামী (সি· আর· ম্যুর) লিখিত 'খ্রীষ্টীয়ান্ আর্ট' উদ্ধৃত করে বলেছেন, সপ্তদশ শতাব্দীর পর হতে যে কেতাবী রীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে তার ফলে সত্য হতে সুন্দর নির্বাসিত হয়ে চলেছে খ্রীষ্টীয় শিল্পচর্চায় যা পূর্বে ছিল না কারণ তখনকার শিক্ষায় মানুষের মনের বাইরে অন্য কোনও অনুপ্রেরণার অস্তিত্ব স্বীকৃত ছিল না। এর প্রধান কারণই হল শিল্পসৃষ্টির মূলে গভীর আধ্যাত্মিক বোধ সুপ্ত থাকত। ফলে সেই শিল্পের অর্থ খুঁজে পাওয়া সহজ ছিল। কারণ দেহ থেকে বিচ্যুত করে প্রাণের যেমন পৃথক অস্তিত্ব নেই তেমনই শিল্পের অর্থও শিল্প থেকে পৃথক করে নেওয়া যায় না। কিন্তু বর্তমান কালের অনেক শিল্পকলা অর্থহীন হয়েও শিল্পরূপে স্বীকৃত।

মূর্তিশিল্পের ক্ষেত্রে দেখা যায় শিল্পী নিজেই এগুলির গঠন বৈচিত্র্য সম্বন্ধে শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ ছিলেন, দর্শকরা এর সৌন্দর্য অনুভব করে পরিতুষ্ট হত। মানুষের ব্যক্তিত্ব এখানে একটি উপায় স্বরূপ, নির্দিষ্ট শিল্প রীতির প্রতিষ্ঠা যার অন্তিমে, ব্যক্তিত্ব প্রকাশই অন্তিম নয়।

কাব্য বা মহাকাব্যের নায়কদের চরিত্রেও এক অসাধারণ অতিমানবিক ভাব ফুটে উঠেছে যা আধুনিক কালে অদ্ভুত বলে মনে হতে পারে, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির বাইরে গণ্য হত পারে, কিন্তু সে চরিত্রগুলি মানুষেরই সৃষ্ট এবং মানুষেরা বংশপরম্পরায় অনুরূপ সৃষ্টি পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত ছিল। নায়ককে স্থান, কালের ঊর্ধ্বে সর্বজনগ্রাহ্য দোষগুণে বিভূষিত করে গড়ে তুলতে হয়েছে নাটকে,

চরিত্রগুলিকে সর্বাংশে অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি কিন্তু আংশিক ভাবে হলেও দোষগুণ সত্যরূপে স্বীকৃতিলাভ করেছে পৃথিবীব্যাপী। একটি ঐশ্বরিক কল্পনা ছাড়া মহাকাব্যের চরিত্রগুলি রূপায়িত করা সম্ভব ছিল না। মধ্যযুগে আদিম শিল্পরীতির যথেষ্ট প্রসার দেখা যায়। এই যুগেই সৌন্দর্য বিকাশের মূলে ভাবের আধিপত্যকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। শিল্পসৃষ্টিকে বোধ, অনুভব, আবেগজনিত প্রতিক্রিয়া রূপে ধরা হয়। মধ্যযুগেই শিল্প শিক্ষার ক্ষেত্রে পূর্বপরিচিতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিষ্য গুরুর নিকট হতে পরিশ্রম সহকারে বিদ্যা শিক্ষা করতেন, সেই বিদ্যা বা সাধনপ্রণালী গুহ্যতত্ত্ব হয়ে সাধারণ্যে অপ্রকাশ্য রূপে বংশ পরম্পরায় এই ধারণা বহন করত যে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে রূপায়িত করাই একমাত্র সুন্দরের আকর্ষণ।

মধ্যযুগীয় রীতিতে শিল্পকলায় জ্ঞান অর্জনের অপরিহার্যতা স্বীকৃত ছিল, শিল্পী স্বীয় কর্মের আকার বা নক্সা প্রস্তুত করতেন, প্রস্তুত কলাকর্ম শিল্প (আর্ট) নামে বিবেচিত হত না, বলা হত শিল্পজাত (আর্টি ফ্যাক্ট); শিল্প, শিল্পীর গুণসমৃদ্ধ হয়ে থাকত। শিল্পের শ্রেণীবিভাগে ললিতকলাকে ব্যবহারিক ক্ষেত্র অথবা বিশুদ্ধ অলংকরণ ক্ষেত্র ইত্যাদি রূপে পৃথক করে দেখান হত না। অলংকরণ যে অর্থে এখন অতিরঞ্জন মধ্য যুগে তা ছিল প্রয়োজনীয়। মূর্তির হাতে ফুল, অস্ত্রধারণ করান অলংকরণের অন্তর্গত ছিল। কোনও কৃত শিল্পকর্মের উপর কেউ অন্য কিছু পরিবর্তন বা সংযোজন আনতে পারতেন না। কর্মপূর্ণতাই বিবেচিত হত শিল্পধর্মরূপে, সুন্দর রূপে নয়। পূর্ণতার প্রকাশের ভূমিকায় সৌন্দর্য বা মনস্তত্ত্বের কথা মনে জাগত না, অলংকার বিদ্যায় সৌন্দর্যের বিচার হত।

কৃতশিল্পের পূর্ণতার আকর্ষণেই সুন্দর ভাব ফুটে উঠত। এরপর সৌন্দর্যকে মনস্তত্ত্বগত কাজে লাগান হয়েছে কর্মবিচারে। পণ্ডিত, ধনী, অভিজাতদের সিংহাসন থেকে ক্রমান্বয়ে সাধারণ মানুষ এই সৌন্দর্য ধর্ম আহরণ করে জগতে ছড়িয়ে দিয়েছে। এই সাধারণ মানুষদেরই অনেককে দেখা গিয়েছে সমাজ সংস্কারক রূপে, সাধু, ফকির, বাউলের বেশে। এঁদের অনেকেই ছিলেন বিভিন্ন কারিগর, পণ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ী। কিন্তু সকলেই এক পথের পথিক। তাঁরা প্রত্যেকেই শৈল্পিক ধর্মের, শৈল্পিক গুণের অনুরাগী। সমাজে স্বীকৃত হয়েছে বহু দ্রব্য যা জীবনে অপ্রয়োজনীয় হলেও মূল্যহীন নয়। বাস্তব অভিজ্ঞতা মানুষকে শিখিয়েছে যা কিছু দূষণীয় তা পরিত্যাগ করতে হবে, যা গুণান্বিত তাই গ্রহণীয়।

মধ্যযুগের খৃষ্টান দার্শনিকেরা উপলব্ধি করেছিলেন যে কিছু সৃষ্টিকর্ম দৈনন্দিন ব্যবহার্য। কিছু সৃষ্টিকর্ম আনন্দ উপভোগের বিষয়।

প্লেটো এঁদের মধ্যেই এক শ্রেণীর শিল্পীর কাজ দেখেছিলেন যাঁদের মধ্যে প্রতিভার পরিচয় নিহিত ছিল। এই প্রতিভাবানেরাই সমাজে সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছিলেন। অভিনবগুপ্ত প্রতিভাবানদের ভূমিকা শিল্পে প্রধান দেখেছেন। বহু পরে রেনেসাঁস যুগে ইওরোপে এঁদের ভূমিকা স্বীকৃত হল। এর পূর্বে যাঁরা শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা স্বীয় কাজে নিজেদের উন্নত করে তুলতেন তাঁরা বিবেচিত হতেন ভগবৎ প্রতিভাশালী ব্যক্তিরূপে। কিন্তু রেনেসাঁস যুগে ইওরোপের চিন্তায় দেখা গিয়েছিল বুদ্ধি দ্বারা মানুষের কর্ম যাচাই করবার ইচ্ছা। সেই সময় প্রতিভাবানেরা হয় কোন মহাজনের পথ অনুসরণ করেছেন. নতুবা স্বাধীনভাবে নিজেদের বিবেক প্রযুক্ত করেছেন তত্ত্বানুসন্ধানে। ইওরোপে সেণ্ট অগস্টাইন, সেণ্ট টমাস অবাস্তব ও বাস্তবক্ষেত্রের মধ্যে শিল্পকে বিচার করেছেন। ভারতে শ্রীশঙ্কুক জানিয়েছেন শিল্প সত্যও নয় মিথ্যাও নয়, স্বপ্নও নয় কর্ম এবং চিন্তার প্রতিফলনও নয়। ভরতমুনিই প্রথম জানালেন ঐক্যতত্ত্বের কথা, আবেগ এবং অনুভূতি সেই ঐক্যবোধ গড়ে তোলে শিল্পকর্মে।

সেণ্ট টমাস, প্ল'টিনাসের চিন্তার সূত্র ধরে বললেন কোনও আসক্তির ফলে এই শিল্পচেতনা মনে জাগে। আসক্তি জাগায় ইচ্ছা। প্রতিভাবানের ধরবার ক্ষমতা (কগনিটিভ পাওয়ার) থাকায়, যে কর্ম সৃষ্টি হয় তা অন্যের নিকট দর্শন বা শ্রবণের দ্বারা তৃপ্তি লাভ করে। সুন্দর হচ্ছে যুক্তির অভিব্যক্তি এবং ইন্দ্রিয় প্রসূত।

মধ্যযুগে ইওরোপে দার্শনিকগণ যে চিন্তা নিয়ে শিল্পকর্মে ব্যাপৃত হলেন তা হচ্ছে আর্শী সম্পর্কে জ্ঞান।

আর্শীতে ভগবানের লীলাখেলা যা প্রকৃতিতে ঘটে থাকে তা প্রতিফলিত হয়। এই বিম্ব-প্রতিবিম্ব মতবাদ ভারতেও কম আলোচিত হয়নি। মধ্যযুগের পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করতেন, শিল্পকর্ম অনুকরণ আর কল্পনার ক্রিয়া, প্রতিভাবানেরাই এগুলি আবিষ্কার করতে সক্ষম। অবশ্য মধ্য যুগেই খৃষ্টান ধর্মগুরুদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে সেই ধারণা যে "শিল্প হচ্ছে বিশ্বজনীন এবং দ্বন্দ্ব রহিত ভাবে গতানুগতিক।"

দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস যে সত্যানুসন্ধানে লিপ্ত থাকে, তা মানুষকে দৈনন্দিন জীবনের পথ হতে টেনে প্রকৃত সত্যের সান্নিধ্যে আনতে সক্ষম হয়। কাব্য, সংগীত বা শিল্পকলায় সেই সত্যই উপস্থিত থাকে তবে তা সৌন্দর্যমণ্ডিত. হয়ে এবং তা যে একেবারে নির্ভার তাও নয়। কাব্য ভাবনায় সুন্দর এবং কুৎসিত যুগপৎ প্রকাশিত হতে পারে। কুৎসিতের স্বীয় বৈশিষ্ট্য সমূহ পাঠক সমাজে তুলে

ধরা হলে তা অসুন্দর দেখবার কোনও হেতু নেই।

নিখুঁত বর্ণনা এবং কোনও বিশেষ ছবিকে লেখনীতে ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতাই কাব্যের মধ্যে প্রধান। কাব্য একাধারে বাস্তবিকতার কাছাকাছি তেমনই প্রকাশ ধর্মেরও। যুক্তিসম্মত চিন্তাধারা প্রদীপ্ত বুদ্ধি সহযোগে পরিবেশিত হয়।

এই কারণে সাধারণ শ্রোতা বা পাঠক যাঁরা আনন্দলাভই কাব্যপাঠের উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করে থাকেন তাঁদের কাছে কাব্য কোনও বিশেষ রূপের প্রতিনিধি এবং তাতে ভাবের প্রাবল্য আতিশয্য রূপে দেখা দেয়। এবং কবির কোনও একটি বিশেষ ধারণাই (আইডিয়া) বিমূর্ত রূপে অথবা প্রতীকের সাহায্যে নিজস্ব চিন্তাধারাকে কাব্যের মাধ্যমে প্রতিফলিত করে। কাব্য বিচারের ক্ষেত্রে বর্তমানকালে কবির কাব্যের উদ্দেশ্য এবং কবির ব্যক্তিজীবন ও অভিজ্ঞতা উভয়ই সমভাবে আলোচনার প্রবণতা দেখা যায়। কারণ কাব্যের মধ্যে কোনও দ্ব্যর্থবোধক উক্তি থাকলে প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করার সুবিধা হয়।[২২]

কিন্তু কবি ও কবির চিন্তাধারা ভিন্নখাতে প্রবাহিত হতে পারে। 'কাব্য পড়ে যেমন ভাব কবি তেমন নয় গো' রবীন্দ্রনাথের উক্তি। কবির কবিতা হতে সম্পূর্ণ অর্থোপলব্ধি না ঘটলেও কাব্যচর্চায় আগ্রহ বাড়ে ছাড়া কমে না। উপরন্তু যেখানে কাব্য হতে সম্পূর্ণ অর্থ প্রতিভাত হয় পাঠকের নিকট সেখানে পাঠকের আকর্ষণ ক্রমশই কমে আসে।

সমাজের চিরাচরিত রীতি বা প্রথার সঙ্গে যেসব ভাষণাবলীর পরিচয় নেই, কবির সার্থক কবিতায় সেই আড়ম্বর পূর্ণ অসার উক্তি কখনও থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে কবি একটি অর্থ উপলব্ধি করেন, কিন্তু বাক্যগঠনের দ্বারা অন্য অর্থ উপলব্ধি হয়। এই প্রসঙ্গে এ· জে· অ্যালিস বার্ডস্লের অভিমত তুলে বলেছেন, কবিতায় রূপক বা প্রতীক ব্যবহৃত হলে তার অর্থ কীভাবে ধরা যায়। কারণ সাধারণ লোক দৈনন্দিন ব্যবহৃত ভাষায় রূপক বা প্রতীকের ব্যবহার করে না। সুতরাং কবিতা পাঠে বিচার করতে হবে কবির মানসিক ইচ্ছা কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে, অপরদিকে কবিতায় প্রকাশিত অর্থ কি পরিমাণে কবির চিন্তাধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেইজন্য শিল্পসৃষ্টির উপকরণসমূহ যেমন রূপক, অলংকার, প্রস্তর, রং, তুলি ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল না হয়ে শিল্পী কি দৃষ্টিতে শিল্প সৃষ্টি করছেন পাঠক দর্শককে তাই উপলব্ধি করতে হবে।

ইনা লোয়েনবার্গ বলেছেন শিল্পীর শিল্পোদ্যমটিরই প্রশংসা বা নিন্দাপ্রাপ্য। কবি যে কোনও শব্দ, ভাব বা ভাষাই গ্রহণ করতে পারেন কিন্তু তাঁর ব্যবহৃত সমুদয় শব্দ বা প্রথাই কার্যকরী নাও হতে পারে। ষ্টিয়েন ওলসেন এই অবস্থার

পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন শব্দ অর্থ দ্বারা ব্যাখ্যাত হবে এই ধারণা আমাদের সাহিত্য কীর্তিতে বর্জনীয়। একটি কথিত বাক্যের অর্থ যেমন মুহূর্তমধ্যে বোঝা সম্ভব হয়, সাহিত্যকর্মের অর্থোপলব্ধি অত দ্রুত সম্ভব নয়।[২৩] কারণ বহু বাক্যের সমষ্টিগত ঐক্যের মাধ্যমেই সাহিত্যকীর্তি। বহু বাক্যের অথবা একটি মাত্র বাক্যের দ্বারা কোন রস ও ভাবের আলোচনা করা হলে বাক্যগুলির কিংবা একটি বাক্যের ক্ষেত্রে শব্দগুলির ব্যবহারের নিমিত্ত অন্তিমে সৃষ্ট অর্থেরও রূপান্তর ঘটে যায়। 'আঘাত সে যে পরশ তব সেই তো পুরস্কার'[২৪] এখানে আঘাত কীভাবে পুরস্কার প্রদানে সমর্থ হয়? কিন্তু বাক্যটি হতে যে আর একটি অর্থ ও ভাব আমাদের মনে জাগে তা হল ব্যর্থতাই কৃতকার্যের মূলে। আমরা কবিকে বলতে শুনি 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো' এই পংক্তিটির শব্দগত অর্থ আমাদের জানা। কিন্তু সমগ্র পংক্তিটি অন্য অর্থ আমাদের কাছে প্রকাশ করে।

এখানে ওলসেন বলেন সংশ্লিষ্ট শব্দগুলির অর্থ বোঝার কোনও প্রয়োজন নেই এখানে মূলত কবির ইচ্ছাই অনুসরণীয়। কেননা সাহিত্যকীর্তি স্পষ্টতই শব্দ নিয়ে খেলা। কাজেই ওলসেনের মন্তব্য বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি, অর্থ নিয়ে অনর্থক বিব্রত না হলে সাহিত্যে আর যা অনুসরণীয় তা হল রসের খেলা। মিসেস সুসেন ল্যাংগার বলেন শিল্পীর শব্দচয়ন সর্বদাই অর্থপূর্ণ হয়ে থাকে। তাঁর মতে শব্দগুলি অমার্জিত অসংস্কৃত হয়ে থাকে, শিল্পীকে সেই শব্দ ভাণ্ডার থেকে শব্দ সংগ্রহ করে নিয়ে ঘর বাঁধতে হয়। আমরা দেখি পৃথকভাবে আঘাত, স্পর্শ, ব্যর্থতা, আগুন প্রভৃতি শুধু চিহ্ন মাত্র। প্রতীক রূপেও ব্যবহার যোগ্য নয়। লেখকেরও শব্দগুলির অর্থ সম্পর্কে নিজস্ব কোনও ধারণা বা অজ্ঞানতা থাকতে পারে কিন্তু ওই শব্দগুলি লেখকের বিবেকের উপর প্রচণ্ড রূপে ক্রিয়া করে মনকে মৃতপ্রায় করে তোলে, তবুও তাঁকে অগ্রসর হতে হয় কোনও প্রবল আবেগের তাড়নায়।

হাওয়ার্ড ডেভিস একটি প্রবন্ধে মাইকেল ওকশট্-এর অভিমত আলোচনা করেছেন।[২৫]

ওকশট তাঁর গ্রন্থে[২৬] প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে শিল্পী জীবন হতে বিচ্যুত নয়, উপরন্তু জীবনকে মহিমান্বিত করে তুলবার জন্যই শিল্পের প্রয়োজন।

ওকশটের ধারণায় কবিতায় কোনও ছায়া রূপ পরিগ্রহ করে। এই ছায়াটিই অভিপ্রায়, যা গভীর চিন্তাপ্রসূত।

কবিসুলভ মন নিয়েই একমাত্র এর বিচার সম্ভব। চিন্তারাজ্যের বিভিন্ন এলাকা

থেকে গভীর চিন্তার সৃষ্টি হয়। তখন একটি চিন্তা সমগ্র হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে অভিজ্ঞতার রূপ নিয়ে দেখা দেয়। সুতরাং কাব্যক্রিয়া একটি পন্থানুসারী। সেইজন্য শিল্পক্রিয়াও চিন্তালব্ধ জ্ঞান রূপে সমঝদারকে অগ্রণী হয়ে গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু বাস্তব জগতের সঙ্গে এর সম্পর্ক কি ? যেখানে সমস্যার কোনও সমাধান নেই, কোনও চঞ্চলতা প্রকাশের কোনও ক্ষেত্র নেই, কোনও ইচ্ছার নিবৃত্তি ঘটানও সম্ভব নয় ? ওকশট দুই বিপরীত মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। ওকশটের এই দুই বিপরীত মনোভাবের জন্য হাওয়ার্ড ডেভিস মনে করেন যে ওকশট তাঁর পূর্বেকার তত্ত্ব 'থিওরি অব মোডস্' হতে বিচ্যুত হয়েছেন।

প্রশ্ন হল জীবনের সঙ্গে কি সংশ্লিষ্ট করতে হবে, কি পরিহার করতে হবে। ছায়াপথ হতেই নিরূপিত হবে গ্রহণ বর্জনের সীমা।

চিন্তামূলক অভিজ্ঞতা (কনটেম্প্লেটিভ মোড অব্ এক্সপেরিয়েন্স) যে পথটি তুলে ধরবে সেইটিই উদ্দেশ্যরূপে শিল্পরূপে সমঝদারের নিকট গ্রহণীয় হবে।

কবি কাব্যময় দৃষ্টিভঙ্গিতে যখন কোনও বিষয়বস্তু আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেন তখন আর্টের বিভিন্নতা দেখা দেয়। কিন্তু কোনও উদ্দেশ্য যখন বিশেষ কোনও অর্থ বহন করে না তখন জীবনের সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক স্থাপনাই বা কি প্রকারে সম্ভব ? এই অর্থের জন্যই মানুষ লালায়িত এমন কি কবিতা ছেড়ে কবির জীবন নিয়ে আলোচনায় মেতে ওঠে সামগ্রিক ভাবে অর্থ বুঝবার জন্য। তবে কবিতা বুঝবার জন্য সর্বদাই যে কবির জীবনী সংগ্রহ করতে হবে এরকম কোনও কথা নেই। কিন্তু মানুষের মন বড় জটিল, সে একেক সময়ে মনে করে কবির জীবন ব্যতীত কবিতার রস সংগ্রহ বুঝি অসম্পূর্ণ রইল তখন তার কাছে প্রতীক সম্বলিত সুমধুর কবিতাও অর্থহীন মনে হয়।

শিল্প আবেগ প্রকাশ করে অথবা কোনও বাস্তব অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে এমন অবস্থা ওকশট স্বীকার করেননি। তাঁর মতে উপরোক্ত অভিজ্ঞতাগুলির সঙ্গে কাব্যিক অভিজ্ঞতার কোনও যোগ নেই। শিল্পে আবেগ বা ধারণা (আইডিয়া) হচ্ছে শিল্পকর্মের ছায়ারূপ। কিছু পরিমাণে আচরণবাদীদের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ পদ্ধতির সঙ্গে ওকশটের বিশ্লেষণ পদ্ধতির মিল আছে।

শিল্পীর প্রথম অভিজ্ঞতায় জন্মায় আবেগ, আবেগ হতে চিন্তা এবং বোঝাপড়া অবশেষে আসে অভিজ্ঞতা। ওকশট যদি শিল্পকে আবেগের প্রকাশ বলেন তবে বলা যায় ওই আবেগ একটি ছাপ (ইম্প্রেসন্) ছাড়া কিছু নয়। শিল্পীর মনে ছাপটি একটি আকারে (ফর্ম) পরিণত হয়। এই আকারটি জাগায় প্রজ্ঞা বা বোধ। এই মত ক্রোচের অনুসারী। 'ছাপ'-এর বিষয় বিবেচনা করলে দেখা যাবে

ছাপ নিজস্ব কোনও রূপ নিয়ে শিল্পরূপে দাঁড়াতে সক্ষম নয়। ওকশটের ছায়া (ইমেজ) কে কায়া দান করা ত দূরের কথা। সে ক্ষেত্রে ক্রোচে যে ভাবে ছাপের পরিণাম নির্ধারণ করেছেন যে, প্রকাশ হচ্ছে ছাপের প্রকাশ (এক্সপ্রেসন্ অব ইমপ্রেসন্) সেদিক দিয়েও ওকশট ক্রোচেরই অনুসারী।

শিল্পতাত্ত্বিক হাওয়ার্ড ডেভিসও সমালোচনা করেছেন ওকশটের। বলেছেন তিনি কি প্রতিনিধিত্বমূলক কাব্য অথবা বাস্তববাদীদের সৃষ্টপথ এড়িয়ে যাচ্ছেন না? 'সত্য প্রতিষ্ঠিত করবার' যুক্তি দেখিয়ে কাহিনীর সঙ্গে আদর্শ, অন্তর্দৃষ্টি জড়িয়ে আলোচনায় জটিলতার সৃষ্টি করেছেন।

অভিপ্রায় প্রতিষ্ঠাই যদি অন্তিম হয় তবে যে ছায়াকল্প সেই অভিপ্রায়কে তুলে ধরে অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি রূপে তা সমঝদারের অনুসৃত চিন্তার পথে ভেঙে পড়ে না বা কাব্যের অর্থ বহুভাবে উপস্থাপিত করে না। কাব্যময়তা আর কাব্যহীনতা দুটি পৃথক ব্যাপার। মানুষের বাহ্যিক এবং নৈতিক জীবন ভিন্ন হওয়ায়, কাব্য ওই ভিন্নতার মধ্যেই আপনার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে। লেখক হাওয়ার্ড ডেভিস দেখিয়েছেন ওকশট যদি একটি বিশেষ অভিজ্ঞতাকে চিন্তার মধ্যে ধরেন যার অর্থ নির্দিষ্ট না হয়েও লোকেদের নিকট ভিন্নরূপে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। এ ক্ষেত্রে অবশ্য বলা যায় কাব্যময়তা (পোয়েটিক) এবং অর্থ এক না হলেও, কাব্যময়তা বহু অর্থের মধ্যে একটি বিশেষ অর্থই অন্তিমে তুলে ধরতে পারে যা সমঝদার তাঁর অভিজ্ঞতায় ধরতে সমর্থ হন।

সৌন্দর্য বা নন্দনতত্ত্ব বলতে ভারতবর্ষে বুঝায় 'ললিতকলা বিদ্যার বিজ্ঞান' ও দর্শন (সাইন্স এ্যাণ্ড ফিলসফি অব্ ফাইন আর্ট) ললিতকলার বিশুদ্ধ ভাবটি স্ফূরণের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে ইন্দ্রিয়ানুভূতির পোশাকী রঙ। ভরতের মতে কবিতা ললিতকলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং নাটক হচ্ছে কবিতা সমূহের মধ্যে এক ধরনের শ্রেষ্ঠ আকারের কবিতা। নাটকের সাশ্রয়ে এবং আনুকূল্যেই সংগীতের স্থান যেমন আছে তেমনই আছে স্থাপত্য বিদ্যার স্থান।

এ ক্ষেত্রে নাটকও যদি এক ধরনের শ্রেষ্ট কবিতা হয় তবে কাব্যশাস্ত্রই প্রধান ললিতবিদ্যা রূপে মনে করা যেতে পারে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে দেবতারা বেদ সমূহের মধ্যে দিয়ে যা প্রচার করলেন তা সবই রয়ে গেল ব্রাহ্মণদের চর্চার আওতায়, তখন ব্রহ্মার কাছে অনুরোধ এল যে এমন কিছু তৈরি হোক যা জনগণ সকলেই গ্রহণ করতে পারে, এবং জনতার সম্পত্তি রূপে পরিগণিত হতে পারে। ব্রহ্মা তখন রচনা করলেন নাট্যবেদ এবং এর মূলধনও সংগ্রহ করলেন বেদ সমূহ থেকেই। আজও তাই নাটকের প্রারম্ভে সেই প্রাচীন নটসূর্যের পূজাপাঠরীতির

প্রচলন দেখা যায়। নাটকের ক্ষেত্রটি তাই সর্বদিক হতে রসসমৃদ্ধ এবং ভাবমণ্ডিত যা কিনা দর্শকদের চক্ষু কর্ণ এবং ইন্দ্রিয় সমূহকে একটি অলৌকিক আনন্দের ভার তুলে দিতে সক্ষম। কারণ কবিতার গণ্ডী কোনও নির্দিষ্ট রস ও ভাব মণ্ডিত থাকায় লেখক পাঠকের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট রেখা রচনা করে। ক্ষণিকের তৃপ্তিই হল কবিতার মাধুর্য। কিন্তু বিন্দু বিন্দু জল নিয়ে যেমন সাগরের সৃষ্টি, তেমনি বহু রস ও বহু ভাবের সমষ্টিগত ভাব জন্মায় নাটকে।

ভরত কবিতার দশটি গুণ দর্শন করিয়েছেন যা দণ্ডীও স্বীকার করেন ! ভামহ কবিতার প্রধান গুণ দেখেছেন তিনটি আর সবগুলি তাঁর নিকট ঠেকেছে আনুষঙ্গিক। প্রধান তিনটি গুণ হ্ল মাধুর্য, ওজঃ এবং প্রসাদ।

মাধুর্যোজঃ প্রসাদাখ্যাশ্রবন্তে নপুনর্দশ।

এর মধ্যে মাধুর্য, ওজঃ প্রসাদগুণগুলি সংগীতেরও প্রকাশযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় কবিতায় কেবলমাত্র বক্রোক্তিই প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং গুণ রূপে বিবেচিত হয়। যে কবিতায় বক্রোক্তি নেই সেই কবিতাই গীত হওয়ার যোগ্য। অবশ্য ভরতই এই বক্রোক্তির কথা প্রথমে ঘোষণা করেন এবং বক্রোক্তিবিহীন কবিতাই যে গীত হবার যোগ্য তা ঘোষণা করেছিলেন। আনন্দবর্ধন ধ্বনি বিচারে এই সিদ্ধান্তই করেছেন। বাস্তব ক্ষেত্রে অলংকার, গুণ, বৃত্তি এবং লক্ষণের মধ্যে দৃশ্যত তফাৎ না থাকলেও ভরতমুনি এদের প্রথম পৃথক পৃথকভাবে বিচার করেছেন।

অভিনব গুপ্ত লক্ষণসমূহকে কাব্যের ভিত্তিস্বরূপ

"ভিত্তিস্থানীয়ং লক্ষণযোজনম্"

এবং অলংকারসমূহকে বিচার করেছেন সুসজ্জিত করবার উপাদানরূপে, যেমন চিত্রে দেখা যায়

'চিত্রকর্ম প্রতিম মলঙ্কার গুণ নিবেশনম্

লক্ষণ দ্বারা অঙ্গ যেমন মুখ, কটিদেশ ইত্যাদি দেখান সম্ভব সেইরকম অলংকরণের ক্ষেত্রেও চাঁদ, তরুলতা ইত্যাদি আনা হয়।

অলংকরণের উপাদান যেমন অনেক সেইরকম লক্ষণসমূহের চিহ্নও বহুপ্রকার। শুধু কবি বা চিত্রকরদের কল্পনার সাধনা এবং অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন।

ভারতে কবিতার গুণগত বিচারের ক্ষেত্রে দুটি অভিমত দেখা যায় ভরত, বামন এবং অভিনবগুপ্ত এঁরা সকলে কবিতার শব্দ এবং অর্থের প্রতি দৃষ্টিদানে আগ্রহী। কবিতায় শ্লেষার্থক শব্দ যেমন থাকতে পারে তেমনই অর্থেরও পরিপূর্ণতার সম্ভাবনা থাকে তখন সমগ্র সৃষ্টকর্মটি অভিজ্ঞতা স্বরূপ বিবেচিত হয়

যা প্রসাদস্বরূপ মনে করে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। দণ্ডী এই মতের সমর্থনেই প্রসাদ মাধুর্য, ওজঃ প্রভৃতির অভিজ্ঞতা সমূহই প্রধান রূপে গ্রহণে আগ্রহী যা সংগীতে আরো গভীরভাবে স্ফূরিত হওয়া উচিত।

আনন্দবর্ধন তাঁর ধ্বন্যালোকে এই যুক্তিই তুলে ধরেছেন।

ভরত নির্দেশ দিয়েছেন কাব্যে যে কবিতার স্থান হওয়া সম্ভব নয়, সংগীতের ক্ষেত্রেই সে কবিতার উত্তরণ হয়।

ডঃ কান্তি পাণ্ডে জয়দেব প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছেন তাঁর ভারতীয় শিল্পতত্ত্ব গ্রন্থে। জয়দেব ভরতের নিয়ম লঙ্ঘন করে দেখিয়েছেন যে সুন্দর কাব্য বা কবিতা রূপক, অলংকার সমেতই সার্থক রূপে সুরে সংযোজিত করে সংগীতে গ্রহণযোগ্য করে তোলা যায়।[২৭] জয়দেবের গীতগোবিন্দই এর প্রমাণ। কারণ সংগীতের কবিতা সাধারণত চলতি সহজ ভাষায় অনাড়ম্বর করেই রচনা করা হয়ে থাকে।

ভারতের মুনিঋষিরা কাব্য, সংগীত ও স্থাপত্যবিদ্যাকে বিশুদ্ধ পরমার্থিক রূপে পরিগণিত করেছেন। হেগেল স্বাধীন ও পূর্ণ শিল্প রূপে কাব্য, সংগীত ও স্থাপত্যবিদ্যা এই তিনটির অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। নাটক ও ভাস্কর্যকে তিনি তাঁর তালিকায় স্থান দেননি।

স্থাপত্য বর্হিশিল্পের অন্তর্গত। অজৈব জগতের সৃষ্টকর্ম মনকে সংযত ও সংশ্লিষ্ট করে পার্থিব বিষয়সমূহের প্রতি একটি সূক্ষ্ম বোধ জাগিয়ে তোলে যা বস্তুত শিল্পমুখীন।

স্থাপত্য শিল্পের মূলধন হল বিভিন্ন ধরনের অসাড় বস্তুপিণ্ড যা সাজিয়ে খাড়া করে তুলে ধরতে হয়, সামঞ্জস্য বিধানের দ্বারা গড়ে তুলতে হয়।

এটিকে বর্হিশিল্প রূপে ধরা হয় কেননা আত্মিক ধারণা হতে বাইরে এর অবস্থান, বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে এই শিল্পকর্মকে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়। মানুষ নিজের অন্তর্নিহিত চিন্তাশক্তির প্রাবল্যেই শ্রেষ্ঠ মঠমন্দির সৃষ্টি করেছে যাতে আরো নির্দিষ্ট ও শান্ত চিত্তে তারা দেবতার আরাধনা করতে সক্ষম হয়। এর জন্য বেছে বেছে বিভিন্ন বস্তুসমূহ বিভিন্ন ক্ষেত্র হতে সংগ্রহ করতে হয়েছে, উপযুক্ত নির্মাণকারী নিযুক্ত করে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে দ্রব্যসমূহ কাজে লাগিয়ে একটি 'সৃষ্টিকে' গড়ে তুলতে হয়েছে যা স্থান, কাল ও প্রলয়ের সম্মুখীন হয়েও দীর্ঘদিন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে সক্ষম হবে কেননা যুগ যুগান্তর ধরে মানুষের সন্তান সন্ততি বংশপরম্পরায় নির্দিষ্ট পথে ভগবৎ আরাধনায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে পারে। যেহেতু স্থাপত্যক্রিয়া বহির্জগতে দেবত্বমণ্ডিত সেইজন্য

এর প্রাচীর, বহির্গাত্র সর্বত্রই প্রতীক ব্যবহারের রীতি স্বীকৃত।

ভারতে স্থাপত্য বিদ্যার বহু প্রাচীন পুঁথিও বর্তমান। এই আগমশাস্ত্রগুলি থেকে মৃত্তিকার গঠন, বিভিন্ন দ্রব্যের পরিচয়, মাপন প্রণালী এবং প্রায় বিশ প্রকারের গৃহ নির্মাণের বিস্তৃত বিবরণ এবং তাদের প্রণালীর নামকরণ যেমন নাগাড়া, বেসারা ইত্যাদি পদ্ধতির গৃহগুলি পুরুষ, স্ত্রী অথবা ক্লীব কীভাবে বোঝান যাবে, বিভিন্ন গৃহনির্মাণের উপযোগী মালমশলার পরিমাপ ও মিশ্রণ প্রভৃতি সবকিছুই লিপিবদ্ধ রয়েছে।

কর্মানুসারে বিভিন্ন শিল্পীর যেমন নামকরণ করা হয় তেমনই জ্ঞানের ক্ষেত্রেও শিল্পীদের সর্বশাস্ত্রেই অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

বাস্তুকলা স্থাপত্যবিদ্যার অন্তিম উদ্দেশ্য বোঝায়। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে এই কলাবিদ্যার পরিধিতে মন্দির, গৃহনির্মাণ, উদ্যান-পূর্তখনন ক্রিয়া, সেতুনির্মাণ, জলাশয়, জলাধার ইত্যাদি সবকিছুই বুঝাতে চেয়েছেন।

স্থাপত্য বা বাস্তুকলা ভাবতের শিল্পদৃষ্টিতে বিচার্য হলেও এর মূলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করবার মত। ভারতে আচরিত এবং কঠোর চর্চা দ্বারা সাধিত এই ধরনের শিল্পের বিবরণ অনেক শাস্ত্রে আছে যার ব্যাপকতা অন্যান্য শিল্পশাস্ত্র হতে সুদূরপ্রসারী ছিল। কেননা এগুলির মূল ভিত্তি হল জনকল্যাণ বোধ। ভারতে অঙ্ক, জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা, আয়ুর্বেদ মতে চিকিৎসা পদ্ধতি প্রভৃতি এগুলির পর্যায়ে পড়ে। দেখা যায় ধর্ম ও বিশুদ্ধ শিল্পকলার চেয়ে স্থাপত্যবিদ্যা, জ্যোতিষবিদ্যা, আয়ুর্বেদ মতে চিকিৎসা প্রভৃতির প্রভাব ভারত হতে সুদূর বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে, তেমনই এই বিদ্যাসমূহের উপর গ্রীস, আরব প্রভৃতি দেশের আচরিত বিজ্ঞান ও ফলিত শাস্ত্রের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে পণ্ডিতেরা দেখিয়ে থাকেন।

ভারতে স্থাপত্যবিদ্যার ব্যাপক উন্নতি ঋগ্‌বেদের কাল হতেই স্পষ্ট এবং এই শাস্ত্র স্থানকালভেদে এক একটি রীতি অনুসারে পরিবর্তিত হয়েছে। অথর্ববেদ ও সূত্রশাস্ত্রগুলি যে রীতির প্রবর্তন করেছিল পরবর্তীকালে শুক্রনীতিসার গ্রন্থে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আরও ব্যাপকভাবে তা আলোচিত হয়েছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে মঞ্চ নির্মাণের বিবিধ কলাকৌশল দেখান হয়েছে, মৎস্য পুরাণেও স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বিষয়ে যথেষ্ট আলোচিত হয়েছে।

শৈবধর্ম পৃথিবীতে পুরাতন ধর্মমতগুলির অন্যতম, কেননা প্রাক বৈদিক যুগের হরপ্পা,মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া মূর্তি, কারুকলা সমন্বিত ব্যবহৃত দ্রব্য সমূহই এর প্রমাণ দেয়। সেক্ষেত্রে শৈবাগম শাস্ত্রকেই স্থাপত্য ও ভাস্কর্য বিষয়ে প্রাচীনতম

শাস্ত্র রূপে অভিহিত করা হয়। এই শৈবাগমের অনুসারী গ্রন্থ বৈদিক পণ্ডিতেরা মেনে নিয়েছেন, কেননা এইটি শাস্ত্রসম্মত, এর শিল্পসৃষ্টির বিবরণ হতে দেখা যায় এতে শৈবধর্ম ও বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে একটি আপোস সৃষ্টি করা হয়েছে, 'হরি হর' মূর্তি পরিকল্পনাটি তার প্রমাণ।

ব্রাহ্মরীতি—যার মূলে ব্রহ্মার অবদান দেখান হয়, সেখানে সমরাঙ্গন সূত্রধারে আমরা পাই দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার পরিচয়, যিনি এককালে ভারত ও সিংহলের মধ্যে সেতুবন্ধনের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন বলে শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে।

মায়ারীতিও একটি প্রাচীন মত। মায়ামত, মায়ামত শিল্পশাস্ত্র বিধান, মায়াশিল্প, মায়াশিল্পশতিকা, মায়াবাস্তু প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের বহু নিদর্শন স্বদেশ ছাড়িয়ে মধ্য আমেরিকাতেও আবিষ্কৃত হয়েছে। মধ্য আমেরিকায় আবিষ্কৃত হনুমান, গণেশ, ইন্দ্র ও ভারতীয়দের মূর্তি বিস্ময়কর আবিষ্কার। শাস্ত্রে মায়াকে দানব বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

রামায়ণ ও মহাভারতেও স্থাপত্য ও ভাস্কর্য কলার বহু নিদর্শন আমরা পেয়ে থাকি।

ভারতের শিল্পরীতিসমূহ, ধর্ম ও সংস্কৃতি বহির্বিশ্বে প্রচার নিমিত্ত ভারতে নৌবাণিজ্যে কৃতবিদ্যদের প্রাধান্য দেখান হয়েছে। ঋগ্‌বেদের কাল থেকেই এই বণিক সম্প্রদায় সক্রিয়। এইজন্যই এই শিল্পীরা যেমন সুদূর আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন অপরদিকে প্রাচ্যের জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও, মালয় প্রভৃতি রাজ্যেও এঁদের অবাধ বাণিজ্য, পুরুষানুক্রমে বসবাস করবার অভ্যাস প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। ফলে কালে কালে বর্ধিত পুষ্ট ধর্মনীতি ও সহজাত শিল্পবিদ্যা পাত্র হতে পাত্রান্তরে স্থানান্তরিত হয়ে চলেছে।

এছাড়া ভারতের প্রতিবেশী চীন, আরব, পারস্য প্রভৃতি দেশসমূহেও স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়, সেইজন্যই এই সব দেশে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিও একই সঙ্গে বিকাশলাভ করেছে। ভারতের সংগীতসমূহে এই সংস্কৃতির প্রভাব যেমন অক্ষুণ্ণ, তেমনই এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ভারতীয় সংগীতের প্রভাবও লক্ষণীয়।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে মঠ, মন্দির, মসজিদ নির্মাণ, ভাস্কর্য ইত্যাদিতে যেমন প্রস্তরের কার্য সুচারুরূপে সম্পাদিত তেমনই মানুষ নিজগৃহ নির্মাণকালে গুহার কথা, বৃক্ষছায়ার কথা ভোলেনি। কাষ্ঠ সংগ্রহ করে গুহাকৃতি গৃহনির্মাণ করেছে। বৈদিকযুগে এবং তার পরবর্তীকালে আমরা দেখি যে কোনওপ্রকার পরিকল্পনা বহির্ভূত রীতির প্রচলন তখন ছিল না। গৃহের ক্ষেত্রে যা সত্য, দুর্গ নির্মাণের

ক্ষেত্রেও তাই। মন্দির সমূহে প্রতিফলিত হয়েছে মানুষের সেই বোধ, ভাব অনুভাব যার দ্বারা আরাধ্য দেবতাকে নিজের মধ্যে মানিয়ে নেওয়া যায় এগুলির মূলে চিহ্ন (সাইন) ব্যবহারের থেকেও প্রতীক (সিম্বল) গ্রহণের রীতিরই ছিল প্রাধান্য। ভারতীয় স্থপতিকার, ভাস্কর্য শিল্পীরা সম্যকরূপে উপলব্ধি করেছিলেন চিহ্নের স্থান নগণ্য, অর্থ পরিবর্তনশীল, ফলত মহৎকে মহত্তর করতে যে স্থায়ী ভাবধারার প্রবাহের প্রয়োজন তাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চিহ্ন অক্ষম কিন্তু প্রতীক সার্থক অনেকসময়, সেইজন্য শিল্পক্ষেত্রে চিহ্ন অজর, অনড় রূপে প্রতিভাত হয়।

নাগাড়া, বেসারা এবং দ্রাবিড় পদ্ধতিসমূহের মধ্যে আমরা দেখি চতুষ্কোণ, গোলাকৃতি ও বহু পার্শ্ববিশিষ্ট আকার। মন্দিরের স্তম্ভগুলি নির্মাণের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি প্রতিপালিত হয়েছে। মঠ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মূর্তিগুলি দণ্ডায়মান, কি বসা অথবা শায়িত রাখা হবে তার জন্য স্থানক, আসন, শায়ন ইত্যাদি রীতি লিখিত হযেছে এবং সেই অনুসারে গৃহীত হয়েছে। এই তিন প্রকার রীতি অনুসারে হিন্দুদের দেবতা ছিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। মন্দিরের স্তম্ভ দেখেই সেই যুগেব মুনিঋষি প্রমুখ বিশেষজ্ঞেরা মন্দিরটি কোন রীতিতে গঠিত, অভ্যন্তরস্থ বিগ্রহটি কি হতে পারে ইত্যাদি নির্ভুলরূপে ধারণা করতে সক্ষম হতেন।

অনেকটা সেই কারণেই ভারতের মুনিঋষিরা কাব্য, সংগীত ও স্থাপত্যবিদ্যাকে শিল্পমধ্যে প্রধান ও বিশুদ্ধরূপে গ্রহণ করে থাকবেন মনে হয় এবং চিত্র ও ভাস্কর্যকে স্থাপত্যবিদ্যার অঙ্গরূপে গ্রহণ করেছেন। হ্যালিডে স্থাপত্যশিল্পকে দেখেছেন দুটি দৃষ্টি কোণ থেকে। প্রথম হল বাস্তব দিক দ্বিতীয় হল শিল্পের দিক। বাস্তব দিক থেকে বলেছেন স্থাপত্যশিল্প মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগসাধন করে।

দ্বিতীয়ত এটিকে শিল্প বলা যায় কারণ এর মধ্যে দিয়ে নিয়মানুবর্তিতা, সমীকরণের মনোভাব, মর্যাদার আরোপ এবং সমগ্রতার খাতিরে আংশিকতাকে দমন, শিল্পের সমাদর একটি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভরশীল করা ইত্যাদি গুণগুলি প্রকাশ পায় এবং স্পর্শকাতরতা ইত্যাদি দোষগুলি অস্বীকার করে। খেয়ালীপনা হতে এইসব শিল্পী মুক্ত এবং এঁরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রেরণাসমূহ বর্জন করেন। শিল্পের উপভোগ মানসিক সন্তুষ্টির সঙ্গে যুক্ত করেন এঁরা, শিল্পের কারিগরী অংশটুকু অবশ্য শিল্প সংগঠনের উপায়স্বরূপ গ্রহণ করছে, অন্তিম স্বরূপে নিচ্ছে না।[২৮] একবার স্থাপত্য ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পাদিত করতে পারলে চিত্রাঙ্কনে আর বাধা কি সে গুহা গাত্রই হোক আর চৈত্যেই হোক। স্থাপত্যরীতি

অনুসারেই গড়ে উঠবে দেবতার রূপ, আকার, নৃত্যভঙ্গী, গায়কপূজারীদের নৃত্যগীত ক্রিয়াকৌশল, আসন গ্রহণ , মুদ্রারীতি ইত্যাদি । 'মানসার' গ্রন্থে দেখান হয়েছে স্থাপত্যবিদ্যার বিভিন্ন রীতি, পরে বলা হয়েছে কীভাবে ভাস্কর্য ও চিত্রসমূহ এর মাধ্যমে অবলম্বন করা যেতে পারে। সৌন্দর্যের মাপকাঠিতে স্থাপত্যের বিচার করা খুবই সমস্যার । কারণ তাজমহলকে আমরা শুধুমাত্র বাইরে থেকে ভাল বলতে পারি না তাই স্থাপত্য প্রকৃষ্ট শিল্পরূপে গণ্য হতে দেরী হয়। চিত্র এবং ভাস্কর্য কিছু পরিমাণে ব্যক্তকরণে নির্ভরশীল (রিপ্রেজেণ্টেশন্যাল) বিশেষ করে ভাস্কর্য, কিন্তু স্থাপত্যশিল্পকে কখনোই তা বলা যাবে না । কারণ যেকোনও বাড়িই স্থাপত্যশিল্পরূপে গণ্য হতে পারে না। তাই শিল্পের মধ্যে স্থাপত্য প্রচণ্ডভাবে আনুষ্ঠানিক (ফাংশন্যাল) ।

স্থাপত্যশিল্পের আর একটি বৈশিষ্ট্য যে কোনও একজন শিল্পী সম্পূর্ণ একটি সৃষ্টিকে গড়ে তুলতে সক্ষম হন না । আবার স্থাপত্যের শিল্পী কখনও নিছক সখ করে শিল্প সৃষ্টি করছেন এও দেখা যায় না । পক্ষান্তরে ভাস্কর্য অতি উন্নত স্তরের শিল্প । একটি লোকের বাহ্যিক অবয়বই শুধু মূর্তিটির মধ্য দিয়ে ফোটে না তার চরিত্রের সার্বিক রূপটি সম্যকরূপে ফুটিয়ে তোলা যায়।

ভারতে ভাস্কর্য বলতে শুধু প্রস্তরে বা কোনও ধাতুতে খোদিত মূর্তিই বোঝায় না, ভাস্কর্যে তুলির স্থানও নির্দিষ্ট করা আছে।

চিত্র ও কাব্যের মত ভাস্কর্যও প্রকাশ করতে সক্ষম হয় দৈহিক ভাব—অঙ্গভঙ্গিতে, চোখের দৃষ্টিতে ওষ্ঠের কুঞ্চনে যা মানবিক হয়েও মানবিক নয় । যে মূর্তি পরিকল্পনায় রয়েছে কল্পনা এবং বুদ্ধির তীক্ষ্ণ প্রভাব । অধিকাংশ মূর্তিই দেবতার স্থান অধিকার করেছে। সেইজন্য বহু ভাস্কর্য অলংকরণের মাধ্যমেই প্রস্ফুটিত । ভাস্কর্যে অলংকরণের ভূমিকাটি সংক্ষিপ্ত করতেই গ্রহণ করতে হয়েছে চিত্রশিল্প । যার রূপ আমরা দেখি মন্দির বা গুহাগাত্রে । সেক্ষেত্রে চিত্রশিল্প বা ভাস্কর্যকে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়ানুভূতি বা বোধশক্তির মধ্যে সীমায়িত করে প্রত্যক্ষতার মধ্যে তার ক্ষমতা ধার্য করা হয় কারণ উপরোক্ত দুটি ধরনের শিল্পসৃষ্টি কাব্য, সংগীত ও স্থাপত্য শিল্পের মত অপ্রত্যক্ষ কোনও ভিন্নভাব বা রস বিস্তারে সক্ষম নয় । চিত্র ও ভাস্কর্য তাই 'আপনাতে আপনি বিকশি' একথাই তাত্ত্বিকেরা বলে থাকেন।

এরও পূর্বে প্রাক্ আর্যযুগের নিদর্শনে পাওয়া যায় মহেঞ্জোদারোতে তখনও ছিল ধর্ম এবং শিল্পের সমন্বয় সাধন । মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কারগুলির মধ্যে আমরা পাই শিবলিঙ্গ যা অতি উৎকৃষ্ট ভাস্কর্যের নমুনা সর্বোপরি প্রতীকধর্মী ।

কালক্রমে জ্ঞানের প্রসার চিন্তার স্বচ্ছতা ভাস্কর্যে দেখা দিয়েছে। আদিম চিহ্ন সমূহ অনুকৃতি ইত্যাদি বর্জন করে ভাস্কর্যের ক্রিয়া কখনও কখনও প্রতীক গ্রহণ করেছে যারই ফলে প্রতিকৃতি তার নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে এক অননুকরণীয় শিল্পপ্রতিভার স্বাক্ষর বহন করেছে।

শিল্পকর্মে শুধুমাত্র স্বাধীনচিন্তা যুক্ত হলে শিল্পী কোনও ধাঁচই (স্টাইল) হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম. হতেন। ভাস্কর্যের মাধ্যমে কোন অশ্লীল কল্পনা রূপায়িত হত। কিন্তু আমরা দেখি যে শিল্পীর অন্তরের বিকৃত চিন্তা কোনও দিনই বাইরে স্থান পায়নি। এক্ষেত্রে আশা এবং অনুপ্রেরণা উভয়েই এর অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শৈবধর্মমত অনুযায়ী ভাস্কর্যে জ্ঞান, যোগ, চর্চা এবং ক্রিয়ার সমভাব। বিভিন্ন শাস্ত্রে শুধু মূর্তিনির্মাণের ক্রিয়া পদ্ধতিই লিপিবদ্ধ নেই, সেই অনুসারে মন্দিরে মঠে দেবতার আসনও দেবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে গড়ে তোলার আদেশ থাকায় শিল্পীর শিল্পকর্মের স্বাধীনতারূপে কোনও স্বেচ্ছাচারিতা শিল্পকর্মে কোনও দিনই স্বীকৃতি লাভ করেনি।

ভাস্কর্যে শিল্পীর চিন্তা আর একদিকে বিস্তৃতি লাভ করে যেমন প্রস্তরচয়নের নির্দেশ, কোণের সূক্ষ্মতা ইত্যাদি যেগুলি তথ্যরূপে থাকে সেগুলিকে আয়ত্ত করে আরাধ্য মূর্তির নিখুঁত রূপ নিজের মনে জাগ্রত করা। এই শিল্পকে খ্রীষ্টীয় শিল্পের ভাষায় বলা যায় কল্পনায় ঐশ্বরিক শিল্পসৃষ্টি। তবে শাস্ত্রবাক্য হল যে, ভাস্কর্যের মধ্য দিয়ে আত্মার স্ফুরণ হয় কিন্তু শিল্পীর ব্যক্তিত্ব বা স্বাধীনতা সেই অনুপাতে অনুমোদিত নয়।

ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যে শ্রবণ ও দর্শনই নান্দনিক। শ্রবণ ও দর্শনেন্দ্রিয়ই শিল্পকর্মের বিষয় ও উদ্দেশ্য উভয়কেই সর্বজনীন করায়। স্থাপত্য, চিত্র ও ভাস্কর্যের মাধ্যমে শিল্পকর্ম মানুষের বোধশক্তিকে বিশেষ থেকে সবিশেষের দিকে ধাবিত করায়।

এই বিচারে কাব্য ও সংগীতের প্রভাব নন্দনকলার ক্ষেত্রে দ্বিতীয়। উভয়ক্রিয়ারই সমাপ্তি আনন্দদানে। এবং আনন্দদান ব্যতীত দ্বিতীয় কোনও উদ্দেশ্য সবিশেষ আকারে তুলে ধরা যায়নি। কিন্তু নাটকের ক্ষেত্র?

নাটকও হল কাব্যময়, সংগীতময়, বিভিন্ন চরিত্রের কাঠামো নিয়ে এক মহাযজ্ঞশালার মঞ্চরূপায়ণ। যার মধ্যে স্থাপত্যক্রিয়ার সার্থক প্রভাব কখনো বা গুহা ও চৈত্যের ভাস্কর্যে নটরাজের সফল উপস্থাপনা। জীবনের ধর্ম ও তুচ্ছ

ঘটনা প্রকাশের অপেক্ষায় অস্থির চঞ্চল তাই সর্বদেশে ও সর্বকালেই নাটকের স্থান চিরনূতন।

তবে প্রতিটি শিল্পকলারই আলোচনার ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। কেননা নন্দনতত্ত্বের শাস্ত্রকারেরা শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়ায় দ্বৈত, অদ্বৈতবাদের প্রচলন হওয়ায়, বিদেশী রাষ্ট্রের প্রভাব ক্রমান্বয়ে বিস্তার লাভ করায় প্রতিটি শিল্পই তার নিজস্ব ক্ষেত্র অধিকার করে আছে।

এসব ক্ষেত্রে পণ্ডিতেরা ভর্তৃহরিকে একটু বিশেষ দৃষ্টিতে দেখেছেন তাঁর শব্দ ব্রহ্ম তত্ত্ব প্রচারের জন্য। কেননা উচ্চারিত শব্দের অন্তিম উদ্দেশ্য, তার অর্থ ইত্যাদি মিলিয়েই কাব্যে ও সংগীতের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনা সম্ভব। এছাড়াও ভর্তৃহরি প্রশ্ন তুলেছেন যদিও 'একমেব ব্রহ্ম সর্বশক্তি' তবুও ব্রহ্ম বিভিন্ন বস্তুতে বিভিন্ন শক্তি নিয়োজিত করেছেন তাহলে কি বহুব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকৃত ? ডঃ পাণ্ডের মতে ভর্তৃহরির ব্যাকরণ, কাশ্মীরের শৈবদর্শন থেকেই ভারতের নন্দনতত্ত্বের ভিত গড়ে তুলতে হবে। কেননা শিব, শক্তি, সদাশিব, ঈশ্বর এবং বিদ্যাই পঞ্চশক্তিরূপে চিৎ, আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান এবং ক্রিয়ায় বিদ্যমান এবং এই প্রভাবগুলি পরম শিব হতেই প্রাপ্ত।[২৯]

বলেছেন কলা হচ্ছে সেই মানবিক ক্রিয়া সমূহ যার বৈশিষ্ট্য আছে অবলোকন, মাপগণনা, চিন্তা এবং স্বচ্ছ প্রকাশ ভঙ্গি। সুতরাং সেই শিল্পকলাই সবার মূলে যে শিল্পগুলির মাধ্যমে ঐবৈশিষ্ট্যগুলি সম্পূর্ণ রূপে ভাস্বর হয়ে ওঠে।

শাস্ত্রে নাটক, সংগীত, কাব্য ইত্যাদির গুণ বিচারে শৈবতন্ত্রে এবংবাৎস্যায়নের কামসূত্রে চৌষট্টি প্রকার শিল্পের নাম উল্লিখিত আছে। তবে বিভিন্ন শাস্ত্রকার মূল শিল্পকলার মধ্যেও বিভিন্নাকারে আরও ক্রিয়ার সংযোজনা দেখিয়েছেন। যেগুলির মধ্যে অনেকগুলি আজ বৃত্তিমূলক যেমন রথকার, মণিকার, ধনুকার ইত্যাদি, তেমন অশ্বচালক, হস্তীচালক, বীণা বা শঙ্খবাদকদেরও দেখান হয়েছে!

বৈদিক যুগের পরবর্তীকালে শাস্ত্রাদির নামানুসারে মানবজীবনের স্থিতি, উদ্দেশ্য, ধর্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষলাভের কথা চরম রূপে বর্ণনা করা হয়েছে এবং মনু, বৃহস্পতি, নন্দী প্রভৃতি ঋষিরা কতকগুলি শাস্ত্র রচনা করেছেন যেগুলি সমাজজীবনের পথ প্রদর্শনকারী রূপে বিবেচিত হত।

ভারতে সৌন্দর্য বা নন্দনতত্ত্বের আলোচনায় বস্তু (প্রস্তর, রঙ, স্বর, দেহ, কাব্য), সৃষ্টি বিদ্যা (সৃষ্টবস্তু যার অন্তিম উদ্দেশ্য গ্রহণীয়), মনস্তত্ত্ব (সৌন্দর্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে মানসিক স্তর সমূহের ক্রিয়া), জ্ঞানতত্ত্বের (শিল্পী এবং গ্রাহক

উভয়ের কলাসম্পর্কিত অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান) যুক্তি এবং সমালোচনা সমভাবে বিবেচিত হয়।

যুক্তিতর্কের মাধ্যমে সত্য মিথ্যার যাচাই হয় এবং সমালোচনায় মূর্ত হয়ে ওঠে যে, প্রদর্শিত কলাবিদ্যার মূল উদ্দেশ্য যথার্থরূপে রীতিসম্মত উপায়ে উপস্থিত কি না ? তবে কি সমস্ত ক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য তাকে কলান্তরে আনয়ন ? সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য সম্পাদিত ক্রিয়া অর্থাৎ এমন কোনও সৃষ্টবিদ্যা (ওভার্ট এ্যাক্ট) যা স্থান কাল পাত্রের গুণ বিচারে চিরন্তন শাশ্বত রূপের দাবীদার হতে সক্ষম।

জার্মান দার্শনিক বোম্‌গার্টেন, লিবনিজ্, হেগেল ভাবসম্প্রসারক ক্রিয়াসমূহকেই সৌন্দর্যানুভূতির কোঠায় ধরেছেন। বোমগার্টেনের সৌন্দর্যতত্ত্ব হচ্ছে ইন্দ্রিয়ানুভূতির এবং ভাবের বিজ্ঞান (দি সাইন্স অব্ সেন্সেস্ এ্যাণ্ড ইমোশন্)।

লিব্‌নিজ্ বলেন সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতা নীচুস্তর হতে ক্রমান্বয়ে উঁচুস্তরে ওঠে সে ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়, ভাব, বুদ্ধি এবং আত্মিক অভিজ্ঞতা পর্যায়ক্রমে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে, কবিতা এই কারণেই তাঁর মতে গতিশীল।

হেগেল আরো বলেন কলাক্রিয়া বিপরীত ভাবসমূহকে জয় করে মূল উদ্দেশ্যকে তুলে ধরে। নাটকে বিষাদ ভাব ভয়কে জয় করবে, দুঃখ-সুখকে করুণার মাধ্যমে জয় করবে তবে এর জন্য চাই নৈতিক শক্তি (এথিক্যাল পাওয়ার) অর্জন। এক্ষেত্রে আর একটি জিনিষ স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে আনন্দের না হলেই যে দুঃখের হবে এমন কোনও কথা নেই, অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে শিল্পক্রিয়ার উদ্দেশ্য থাকে, ভয় হতে অভয়ে পৌঁছান, মায়ামোহকে করুণায় বিগলিত করা, ভারতের শিল্পে তাই রসেরই প্রাধান্য।

অভিনব গুপ্তের মতে নাটকে আনন্দ এবং নিরানন্দের ভাব হয়ত নায়কের চোখে ফুটে ওঠে, দর্শক পরিতৃপ্ত হয় কিন্তু ভয়ানক রস, যেমন যে ক্ষেত্রে ভয় জাগানো প্রয়োজন সেখানে ভীত এবং ভয় সৃষ্টিকারী ব্যক্তি বা বস্তু উভয়ের উপস্থিতিই প্রয়োজন।

'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটকে ভীত সচকিত হরিণ যখন প্রাণ ভয়ে পলায়নোদ্যত তখন তার পলায়নপর ভঙ্গিতে আক্রমণকারী রাজার চোখে যে অনুসন্ধিৎসা জিঘাংসা ফুটে উঠবে সেই ভয়ানক রস রাজাকেই নিজের চোখে ফুটিয়ে তুলতে হবে। দর্শক হরিণের জন্য নয়, রাজ দুষ্যন্তের ক্রিয়ায় প্রকৃত রসাস্বাদনে সমর্থ হয়ে থাকে। ডঃ পাণ্ডে বলেছেন, 'ভয় নিরানন্দের নয়—কেননা

ভয়ভাব সর্বজনীনরূপে স্বীকৃত ও প্রকাশিত হচ্ছে মূল বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে এক নৈর্ব্যক্তিক রূপে।[৩০]

সব ক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য শিল্পোন্নয়ন হতে পারে না। শ্রীআনন্দ কুমারস্বামী তাঁর এক বক্তৃতায় বলেছেন ক্রিয়া বলতে নির্মাণ করা (মেকিং) আর কাজ করা (ডুয়িং) এক নয়। নির্মাণের বিচক্ষণতা যুক্তি তর্ক সম্মত ও বোধগম্যতা শক্তির প্রয়োজন। কিন্তু বাঁচবার জন্য যে ক্রিয়া পদ্ধতি দৈনন্দিন জীবনে লোককে পালন করতে হয় তার ভাল মন্দ, পাপ-পুণ্য বিচার্য হলেও কারিগর শ্রেণীর লোকেদের কোনও বিশেষ ক্রিয়ার প্রতি আসক্তি থাকে যা তার জীবনে উপজীবিকার কারণ হয়।

শ্রীআনন্দস্বামী কোনও মানুষকেই সামাজিক মর্যাদা দিতে অস্বীকৃত যদি না তিনি কোনও না কোনও ভাবে শিল্পী হন।[৩১]

কথাটি মনুষ্য সমাজের সবার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, রূঢ় হলেও সংস্কৃত সাহিত্যে শিল্পজ্ঞান রহিত ব্যক্তিকে সেই কারণেই অরসিক বলা হয়েছে, যে অরসিকের নিকটে রসের নিবেদন নিষ্ফল। প্রধান কথা কাজ যত উন্নত ধরনের হবে সেই মানুষের সামাজিক উন্নতির পথও তত সুদৃঢ় হবে। এক্ষেত্রে নিছক আজগুবি কল্পনার যেমন সমাজে স্থান নেই, তেমনি অলসতার স্থানও নেই,এ হল নীতি শাস্ত্রের অনুশাসন।

বস্তুত সৌন্দর্যানুভবের ক্রিয়াটি স্পর্শকাতর মনোভাব থেকে জন্মগ্রহণ করে। সাধারণত মানুষ তার কি ভাল লাগে বা লাগে না তা অতি সহজেই ব্যক্ত করতে পারে, কিন্তু কার্য কারণ সম্পর্ক, দোষ গুণ দেখিয়ে স্বীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার নিদর্শন তুলে ধরতে পারে কজন!

মানুষের গতিশীল মনের চিন্তামূলক দিকটি মনুষ্যত্ব এবং স্বীয় কর্মক্ষমতা প্রদর্শনের মধ্যেই সম্পূর্ণতা লাভ করে। সুন্দরের প্রকাশ বিভিন্ন কর্মচাঞ্চল্যের মধ্য দিয়ে, কিন্তু এই সুন্দর সৃষ্টিগুলি পৃথক ভাবে সাজিয়ে ধারাবাহিকতা রক্ষা করাও সম্ভব নয়। তথাপি পৃথিবীতে অবিরাম বহু কাব্যকাহিনী, ভাস্কর্য, চিত্রকলা সুন্দরের স্থান পূরণ করে চলেছে।

শিল্পের রসানুভূতি যেমন মানুষের পছন্দ অপছন্দের উপর নির্ভর করান চলে না এর জন্য শিল্পীরও অহেতুক কৌতূহল বর্জন করে স্বীয় বিষয়ের প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শন প্রয়োজন,তার জন্য চাই সম্যক জ্ঞান এবং জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রের সঙ্গে শিল্পকর্মের সামঞ্জস্য সাধন। আদিম শিল্পকলা নিরলঙ্কার এবং বাহুল্যবর্জিত অথচ আজও তা সমাদৃত। আদিম লোকেদের জগৎ ও পরিবেশের

সঙ্গে বোঝাপড়া করে চলতে হত তাই তাদের শিল্পরীতি অনাড়ম্বর ছিল। পরে ক্রমান্বয়ে দর্শন, মনস্তত্ত্ববিদ্যা এবং অপরাপর প্রকরণ পরীক্ষিত হওয়ায় শিল্পজগতে জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

শিল্পক্রিয়াকে সৌন্দর্যবিকৃতি হতে রক্ষা করে, বিশ্বজনীন করার আগ্রহ দেখা দিয়েছে।

সংগীত সাধারণ ভাবে তিনটি স্তরে সমাদর প্রাপ্তি পর্যায়ে পৌঁছায়। প্রথমত স্বরের দ্বারা ইন্দ্রিয় সচেতনকারী ধ্বনি সৌন্দর্য জাগায়, এই ধ্বনি আবেগপূর্ণ হতে থাকে ক্রমান্বয়ে প্রকাশের অপেক্ষায়, এই আবেগের পরিসমাপ্তি ঘটে যতই একে শ্রোতা আত্মসাৎ করতে থাকেন। গায়ক, শ্রোতা উভয়েই এক্ষেত্রে সচেতন থাকেন, কেননা শ্রোতারা বুদ্ধিসহযোগে চিন্তার রাজ্যে প্রবেশ করেছেন ফলে পরিবেশিত আবেদন ক্রমেই সময়ের মাধ্যমে স্পষ্ট হতে থাকে পরিবেশনমণ্ডলে। যে শিল্প পাত্রজয়ী ও জগৎজয়ী তারই মধ্যে কালজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেইজন্য কোনও শিল্পেই সময় সংক্ষেপের কোনও প্রশ্ন নেই, এতেই সৌন্দর্য বিকৃতি ঘটে। যখনই শিল্পে সৌন্দর্য বিকৃতি ঘটে তখনই শ্রোতা বা দর্শক যে যে ভাবে পারেন নানা ব্যাখ্যায় মেতে ওঠেন। অনেকের নিকট এইটিই শিল্পে সার্থকতার মাপকাঠি। এই অবস্থাকে শিল্পের সার্থকতারূপে চিহ্নিত করতে হলে দেখা প্রয়োজন শ্রোতা বা দর্শক চিন্তা দ্বারা আপ্লুত কিনা, কারণ চিন্তায় যতক্ষণ বুদ্ধির প্রক্ষেপ না ঘটছে ততক্ষণ সেই ব্যক্তির সমাদর বা অনাদরের কোনও মূল্য নেই।

এডওয়ার্ড, জে. দেণ্ট তাই আধুনিক সংগীত সম্পর্কে বলেছেন সংগীতের আসল আনন্দ জ্ঞানের প্রচারের জন্য নষ্ট হয়।[৩২] দেণ্টের মতে জ্ঞান চাই চিত্র নির্মাণে। কাব্য বা সংগীত ব্যতীত সব শিল্পেই জ্ঞান অভিজ্ঞতার পূর্ণ প্রয়োগের পথ আছে। আধুনিক সংগীত ছকে আঁকা বুদ্ধির খেলা কি না তাই চিন্তনীয়। দেণ্ট বলেছেন আধুনিক সংগীত শুনে কেউ ছবি আঁকতে প্রলুব্ধ হতে পারেন যেহেতু এই সংগীত জ্ঞানদায়ী। সংগীতের ধর্মে নাটকীয়তা, উদাহরণ বর্ণনা থাকতে পারে কিন্তু মূল উদ্দেশ্য বস্তুর রস নিবেদন ও আবেগ সঞ্চারণ জ্ঞান বিচার দিয়ে বক্তব্য গ্রহণ নয়। দেণ্টের বক্তব্য অর্থাৎ আধুনিক সংগীতের এই জ্ঞান বিতরণের কথা যা ইউরোপে বিশেষ করে রাশিয়ান মিউজিক সম্পর্কে প্রযোজ্য তা ভারতে সম্পূর্ণরূপে সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। কেননা ভারতীয় সংগীতসমূহ স্বর ও রাগাশ্রয়ী। স্বর ও রাগের মূল উদ্দেশ্য শ্রোতাকে রস নিবেদন করা। সে ক্ষেত্রে ভারতের আধুনিক সংগীতে যদি কোনও সৌন্দর্য বিকৃতি ঘটে

থাকে তার মূলে আছে সুরের বিশৃঙ্খল প্রয়োগ। কথায় হয়তো অনেক সময়ে যথার্থ সুরারোপ হয় না। আবার কথা ও সুর হয়তো বা একাত্ম হতে সমর্থ হলেও অনেক সময়ে বাদ্যযন্ত্র সুরে বিশৃংখলা ঘটিয়ে থাকে। ফলে যন্ত্রের বক্তব্য ও সুরের বক্তব্যের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। শ্রোতা হয়তো কখনো গান শোনেন কখনও শোনেন বাদ্যযন্ত্রের ব্যঞ্জনা, কখনও বা শোনেন কথা।

ভারতের সংগীত কলাকার যদি প্রয়োজনের তাগিদে এই অত্যাধুনিক রচনা ছেড়ে নিজেদের বৈশিষ্ট্যমূলক পল্লীগীতি, লোকগীতি, শ্রমিক কৃষকদের দৈনন্দিন জীবনের কথা, লোকধর্মী গীতিসমূহ প্রয়োগ করতে বা রচনা করতে এগিয়ে দাঁড়ান, তাহলে ব্যর্থতা এই ভাবে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। এসব ক্ষেত্রে সংগীত কলাকার সংগীতের প্রয়োজনে যেকোন দেশী বা বিদেশী যন্ত্রই ব্যবহার করতে পারেন সার্থকরূপে, সুরের বৈচিত্র্যও ঘটাতে পারেন।

এ ক্ষেত্রে ভাগনার-এর একটি মন্তব্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন সংগীতকে যতই দূরে টেনে নিয়ে যাওয়া হোক না কেন, সংগীত আবেগরূপেই আবেদন জানাবে। সুতরাং কোন একটি ভাব রসের মাধ্যমে তুলে ধরতে হয়। এক্ষেত্রে সংগীতের মধ্যে যদি দুটি ভাব মিশে যায় তা হলে সে সংগীত ব্যর্থ হতে বাধ্য। কেননা শিল্পী একই সময়ে দুটি আবেদন সৃষ্টি করতে পারেন না, নিজের খুশীমত তাতে সংগীতের নৈতিক দিকটি বোঝার দৈন্যতাই প্রকাশ পাবে শিল্পীর মধ্যে।[৩৩]

মনে করি আমাদের কোনও আধুনিক সংগীতের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে ব্যথার ভাব, কিন্তু গানের কথা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ব্যথার কারণটিই কৃত্রিম। এক্ষেত্রে শিল্পীকে ফুটাতে হচ্ছে দুটি ভাব সম্প্রসারী আবেদন তার সঙ্গে আছে যন্ত্রসংগীতের আয়োজন, ফলে সৌন্দর্য বিকৃতি শিল্পীর অজান্তেই ঘটে যাচ্ছে।

ডঃ ভাগনারের মতে চিত্রে 'ইচ্ছা'কে রূপায়িত করে সংগীত জাগায় গভীর প্রশান্তি। আধুনিক সংগীতজ্ঞেরা সংগীতে চিত্র তুলে ধরলেও সে প্রচেষ্টায় সার্থক হতে পারছেন কজন ?

সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে মানুষের বোধশক্তি বেড়েছে। বাক্যকে নানা ভাবে প্রকাশের ব্যস্ততা দেখা যায় আবার অনেক সময়ে যুক্তিকে এড়িয়ে বাক্য এগিয়ে যায়। বুদ্ধি তখন অনুভূতিকে সেই অর্থানুসন্ধানে নিযুক্ত করে। সংগীত যে অনুভূতিকে তুলে ধরে তা অতি সূক্ষ্ম। সস্তা সংগীতে আমোদপ্রমোদে যে স্থূল উপাদানসমূহ একে একে প্রয়োগ করা হয় তাতে মানুষের সূক্ষ্মবোধগুলি তলিয়ে

যায়। তবে বলা যায় সংগীতকে লঘু আকারে তুলে ধরার মধ্যে একটি সার্থকতা আছে, তাহলে সংগীতকে প্রাথমিক ভাবে আকৃষ্ট করান যায়।

ভারতীয় সংগীতে পাশ্চাত্যরীতির সংমিশ্রণ ঘটাতে হলে শাস্ত্রীয় সংগীতে অভ্যস্ত মানুষের মন তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়'। পক্ষান্তরে বিভিন্ন রীতির সমবায়ে যে নূতন সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত হয়, তাতে মানুষের ধর্মান্ধতা কমে, ঐক্যশক্তি বিস্তৃতি লাভ করে এবং শিল্পের ক্ষেত্রে তা গ্রহণযোগ্যও হয়। শিল্পসৃষ্টির জন্যই শিল্প একথা আমাদের প্রত্যেককে মনে রাখতে হবে অন্যথায় শিল্প একটি কুসংস্কার রূপে পরিগণিত হবে, ফলে মানুষকে পুনরায় সেই কুসংস্কার দূর করার কাজে লাগতে হবে।

যদি বলা হয় কুসংস্কারের মূলে রয়েছে রহস্য কুহেলিকা তবে সে ক্ষেত্রে শিল্প কিছু পরিমাণে কুসংস্কারও বটে। এই কুসংস্কার দূর করার জন্য শিল্পীকে এগিয়ে রহস্যের মূল উদঘাটন করতে হয়, কুহেলিকা দূর করতে হয়।

এখানে হ্যালিডের অভিমত আলোচনার যোগ্য। চিত্রকর যদি রহস্যময়তার আশ্রয় নেন, কবি যদি কুহেলিকাচ্ছন্ন কবিতা রচনা করেন, তবে কবিতাকে চিত্রের থেকে নীচু স্তরের শিল্প বলে গণ্য করা হবে। কিন্তু এই কবিতার উপর ভিত্তি করে সংগীত রচিত হলে বলা হবে সংগীত চিত্রের থেকেও মহত্তর শিল্প। কেননা সংগীত রহস্য উদ্‌ঘাটন করে, কুহেলিকা মোচন করে, তারপর বাক্যার্থকে ভাবের মাধ্যমে তুলে ধরে, অবশেষে স্বীকৃতি লাভ করে।[৩৪]

কুমারস্বামী বলেন, শিল্পবিহীন প্রচেষ্টা বর্বরোচিত কাজ। শিল্প হচ্ছে মানবিক। আদিম অধিবাসীরা কোনও কালেই শিল্পকর্মচ্যুত হয়ে সমাজে বাস করতে অভ্যস্ত ছিল না। তাঁর মতে মানুষের শিল্পকলা সমূহ প্রকৃতির মধ্যে লুক্কায়িত হয়ে চলে এসেছে। পরে মানুষ সেগুলি আবিষ্কার করে তুলে নিয়েছে।[৩৫]

শিল্পীকে সর্বদা কোনও অভিসন্ধি ব্যতীত খোলামনে কাজ করতে হবে। কারণ কিছু গড়তে হলে তার প্রকৃতি নিজের মানসপটে প্রথমে ফুটিয়ে তোলা প্রয়োজন। তাই মনকে সর্বদা বিশৃংখল চিন্তা থেকে মুক্ত রাখা প্রয়োজন।

নাটক, স্থাপত্য, চিত্র, কাব্য, সাহিত্য ও সংগীত এক একটি উত্তম ললিতকলার বিশেষ নিদর্শনরূপে পরিগণিত হলেও আনুষঙ্গিকভাবে অপরাপর সৃষ্টিও মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যা মুখ্যত লোকরঞ্জন করলেও, বর্তমান যুগে শিল্পীরা এসব ক্ষেত্রেও সৃজনীশক্তির পরিচয় দিয়ে চলেছেন।

নাটকের পাশাপাশি চলে পালা গান, কবি গান, তরজা গান পুতুলনাচ, ছায়াছবি প্রভৃতি। এর মধ্যে ছায়াছবিতে বর্তমান কালে নাটকেরই ভিন্নরূপ পর্দায়

দেখান হয়ে থাকে। তবে ছায়াছবি নিজস্ব একটি স্থান নাট্যজগতে গ্রহণ করায় এর নন্দনতাত্ত্বিক আবেদনও ভিন্ন।

পুতুলনাচ হল নাটক, ভাস্কর্য, চিত্র, স্থাপত্য, সংগীত ও নৃত্যকলা ইত্যাদি সবেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ। শুধুমাত্র পুতুলের সাহায্যে মঞ্চে কোনও কাহিনীর পূর্ণাঙ্গ চিত্ররূপ প্রদর্শিত হয়। পুতুলের মুখে কথা নেই, তারা মূক অভিনয় করে, নেপথ্যের কোনও শিল্পী এদের মূক অভিনয়ের পরিচালক। লোকরঞ্জনকারী শাখাগুলির মধ্যে পুতুলনাচের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পুতুলনাচের ঘটনাগুলি অধিকাংশই মহাকাব্য থেকে সংগৃহীত। অপরাপর পালা গান, কবি গান, তরজা গান, মুসলীম ধর্মী মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী সম্বলিত গাজীর গানে মূল গায়ক তাঁর পার্শ্বগায়কদের সহায়তায় বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করে স্বীয় ধর্মীয় অথবা সামাজিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠায় তৎপর হন। এগুলির বৈশিষ্ট্যে গ্রাম্যশিল্পীর জ্ঞান ও বুদ্ধি যুগপৎ ফুটে ওঠে, দর্শকের দ্বারা সমাদৃতও হয় কেননা অন্তিমে রয়েছে কোনও রসের তৃপ্তি সাধন, যুক্তির প্রতিষ্ঠা।

এর মধ্যে নাটকে পরিবেশ, ঘটনা সবই জটিলাকারে তুলে ধরা হয়ে থাকে। প্রাচীন কাল থেকেই নাটকের ধারা অনুসরণ করেই গড়ে উঠেছে ভবিষ্যৎ কাব্য, গীত ও চিত্রের কাঠামো।

শ্রীশংকুক জানিয়েছেন নাটকে শুধু বিশেষ বিশেষ ঘটনারই সমাবেশ হত। ইতিহাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি বাদ দেওয়া হত। বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নাটক সৃষ্টি হয়েছে।

সংস্কৃত নাটকে প্রমোদের স্থান ছিল গৌণ, সমাজের নৈতিক উন্নতি বিধানই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। মানুষের কাম্যের মধ্যে ছিল ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ। নাটক কাম্যবস্তুকে কেন্দ্র করে মানুষের মানসিক অবস্থাগুলি গড়ে তুলত, যেখানে প্রাপ্য লাভের ক্ষেত্রে দেখা যেত বাধা, বিপত্তি, অধর্ম, দুঃখ বা সুখলাভ। নির্দিষ্ট সময়ে, দৃশ্য অঙ্কে বিভক্ত করে ঘটনাগুলি এক এক করে তুলে ধরা হত এবং এক্ষেত্রেও মূল বক্তব্য হতে অনাবশ্যক অংশ বাদ দিয়ে যুক্তি করা হত প্রখর, অনুভূতি এবং আবেগসমূহ হয়ে উঠত প্রাণবন্ত। ধর্ম, জাতি, নির্বিশেষে শুনত নাটক, অনেকে তাদের জীবনের অনেক প্রশ্নের সমাধান খুঁজে পেত নাটকের মধ্য দিয়ে। আবার প্রয়োজনবোধে নাটক নির্মাণের ধারাও পরিবর্তিত হত।

নাটক সংস্কৃত সাহিত্যে রূপক নামেও চলত। বৃত্তি অনুসারে নাটকগুলি বিভক্ত করা হত, যেমনই সংগীতে প্রয়োজনে স্বরগ্রাম ভিন্ন হয়ে থাকে। নাটক ছিল প্রাথমিক ভাবে দুইভাগে বিভক্ত ১) পূর্ণবৃত্তি বৃত্তাংগ ২) বৃত্তিন্যূন। নাটক ও

প্রকরণ প্রথম ভাগে, অবশিষ্ট আটটি বৃত্তি তুলে ধরা হত বৃত্তিন্যূন রূপে।

রূপকগুলির মধ্যে নাটকই ছিল প্রধান। নাটকের সুপ্ত উদ্দেশ্য ছিল দুঃখ দুর্দশা মোচন, সুতরাং কোনও দেবতাকে নাম ভূমিকায় দেখানো হত না। দেবতাদের দুঃখ সুখ অনুপস্থিত। নায়ক করা হত কোনও রাজবংশের নৃপতিকেই। যিনি করুণা, বিপ্রলম্ভ, অদ্ভুত, ভয়ানক প্রভৃতি আবেগসমূহ তুলে ধরতেন।

প্রকরণও ছিল এক ধরনের পাঁচ অঙ্কের পূর্ণাঙ্গ নাটক। তবে এর বিষয়বস্তু আহরণ করা হত কল্পনার সাহায্যে, অতএব ইতিহাস পুরাণের কাহিনী অনুসরণ করে সৃষ্টি হত গল্প। ফলে যাঁরা ঐতিহাসিক ঘটনা পছন্দ করতেন, কিংবা যাঁরা গল্প ভালবাসেন সবাই সমভাবে তৃপ্ত হতে পারতেন। মানুষের নৈতিক জীবনের, মান উন্নত করে তুলবার জন্য যে সমস্ত বিষয়বস্তু কল্পিত হত, বা এক ঘটনা অন্য ঘটনার সঙ্গে এমনভাবে লিপ্ত করে তোলা হত যে তাতে অভীষ্ট রসই শুধু ঘন হত না, মানুষ নিকৃষ্ট উপায় ও পথসমূহ হতে নিজেকে সংবৃত করে শিক্ষা লাভ করত। যেহেতু প্রকরণে কল্পনার পথ প্রশস্ত ছিল, নাট্যকারেরা শুধু প্রত্যক্ষ হতে পরোক্ষে নয় পরোক্ষকেও প্রত্যক্ষ দর্শনে পৌঁছবার পথও খুলে ধরতেন। সেইজন্য নাটকের তুচ্ছ ঘটনা যা পূর্বে পরিত্যক্তরূপে পরিগণিত সেই তুচ্ছকেও প্রকরণে তুলে ধরার পথ সহজ রূপে দেখা দিল।

নাটক ছিল রাজকীয়, প্রকরণে নায়ক হতেন মানদণ্ডধারী বৈশ্য, মন্ত্রী হতেন ব্রাহ্মণ, এছাড়া শূদ্রদের স্থান হত সহকারীরূপে। নাটকের দূত হতেন হারেমের দাসী, প্রকরণের দূত হল চাকর বা চেত। নায়িকা নির্বাচিত হতেন সাধারণত নীচুঘরের স্ত্রীলোক, অবশ্য এর মধ্যে মধ্যবিত্তদেরও ধরা হত।

নাটিকা রূপে যা প্রচলিত ছিল, তার মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছিল অধিক। শৃংগার রসের পরিবেশনা ছিল নাটিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। 'সমবকার' ছিল তিন অঙ্কের নাটক। দেবতা এখানে নায়ক হয়ে লীলা দেখাতেন ভক্তদের। তিন প্রকারের দেবতা নায়ক দেখান হত উচ্চমনের উদ্দাত্ত (শিব), শান্ত (ব্রহ্মা) এবং উদ্ধত (নৃসিংহ) : প্রথমে দেখান হত প্রবঞ্চনা, বিপদ উপস্থিত হলে দেবতা অন্তর্হিত হতেন, বিপদভঞ্জনরূপে এসে দাঁড়াতেন তৃতীয় অঙ্কে। সমবকার নাটক দেখান হত, যেদিন দেবতাকে নিয়ে শোভাযাত্রা হত।

'ইহামৃগ'-এর নায়ক হতেন দেবতা, তিনি কোনও দেবীর কারণে যুদ্ধে অবতীর্ণ। একে উচ্চস্তরের নাটক বলে গণ্য করা হত। নাটকে থাকত সংঘর্ষ, বাদানুবাদ, মান, অভি মান অবশেষে নায়িকাকে অন্যায়কারীর কাছ থেকে উদ্ধার

করা। এটি ব্যাযোগ নাটকের মত একাংক । এতে বীর ও রৌদ্ররসের অবতারণা হত। ব্যাযোগে নায়ক হতেন একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি।

'উৎসৃষ্টিকাংক' নাটককে 'ক্যাথারসিস্' ক্রিয়ার সমধর্মীরূপে উল্লেখ করা যায়।

'প্রহসনে কপট আচরণ দেখিয়ে নায়ক হাসির খোরাক যোগাতেন। ভাষা, অভিনয় সবই কপটতাপূর্ণ হত। অনেক ক্ষেত্রে ভক্ত সাধুকে দেখা যেত কোনও অসৎ স্ত্রীলোকের সঙ্গে। এই প্রহসন মিশ্র প্রকৃতির ছিল।

ভাণ শুধু এক অঙ্কের নাটক হত না, অভিনয়কারীও হতেন একজন। এখানে নায়কের উক্তির মধ্যে স্থান, কাল সূচিত হয় না, কথাবার্তার ভঙ্গিতে অন্যান্য পাত্রপাত্রীর কথাও ফুটে ওঠে নায়কের আলোচনায়। অসৎ চরিত্র রূপায়নে এই ভাণ প্রয়োজন হত বীভৎস রস সৃষ্টির জন্য।

বিথি নাট্যধারা ছিল সংক্ষিপ্ত। দুতিন জনের নাটক। সাধারণ লোকের প্রাত্যহিক আলাপের সংক্ষিপ্তসার ধরা পড়ত সৃষ্ট চরিত্রে। কাব্যের অলংকারের মত নাটকের সৌন্দর্য বিস্তারেও বিথির ব্যবহার ছিল।

মার্গসংগীতে দেশীয় রীতির প্রভাব, কিংবা মার্গ ও দেশীয় উভয় রীতির পৃথক পরিমণ্ডল যেমন সংগীত শিল্পীদের বিভিন্ন দিক হতে উদ্বুদ্ধ করেছে সুর সহযোগে বিভিন্ন রস পরিবেশনের কাজে তেমনই নাটকের কাহিনী পৌরাণিক যুগ থেকে ধর্মের কাহিনী রূপে নানা ভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরে আজও ছড়িয়ে। দেবতাদের কৃপালাভের দ্বারা অর্থলাভ ইত্যাদি কাহিনী সম্বলিত গীতধারা আজও নানাভাবে চলে আসছে। যে ক্ষেত্রে নাটকের কাহিনী সমাজের লোকেদের অভাব অভিযোগকে কেন্দ্র করে অথবা শ্রেয় বা প্রেয়কে পাবার আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করে সেসব ক্ষেত্রেও বিয়োগগাথা, বীরগাথা, প্রেমগাথা রূপে লোকগীতিসমূহ উৎকৃষ্ট রসভাণ্ডারই বয়ে নিয়ে চলে। ভারতে নাটক না থাকলে আমাদের সমাজে পৌরাণিক কাহিনী হয়তো দেখা যেত না। ধর্মসংগীত আদিকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত অবাধে সাধু, সন্ত ভক্তদের মুখে মুখে প্রচারিত হত না।

নাটকের আরো একটি প্রভাব হিন্দুজীবনে লক্ষ্য করতে হবে তা হল প্রধান দেবতাদের প্রতীক স্বরূপ লৌকিক দেবতাদের সমাজে বরণ করে নেওয়ার প্রচেষ্টা।

সাধারণ লোকের মধ্যে জীবনের মূল্যবোধ গড়ে তুলতে হলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঋণ স্বীকার করে নেওয়াই ভাল। কারণ অতি আধুনিকেরা যদি সংগীতের মধ্যে হাস্য কৌতুক, বিদ্রূপের কষাঘাত, দৈন্যের ব্যথা, উচ্ছৃংখল

জীবনের কোনও চিত্ররূপ প্রদর্শন করতে চান তবে সে ক্ষেত্রেও পূর্বসূরীদের প্রদর্শিত পথ হতে রসানুসন্ধান অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা করা উচিত বলে মনে করি না।

শরীরের স্থূল, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধিকে আশ্রয় করে চৌষট্টি কলার সৃষ্টি হয়েছে। একটি অন্যটির পরে নির্ভর করে নিজেকে প্রকাশ করতে সক্ষম। প্রত্যেকে ইন্দ্রিয় দিয়ে চিত্ত রসকেই উপলব্ধি করছে এবং প্রত্যেক শিল্প সেই 'রস'কেই সাকার ও নিরাকার ভাবে সৃষ্টি করছে। রস উপলব্ধির দিক দিয়ে সংগীত, কাব্য, চিত্র ভাস্কর্য কোনও শিল্প থেকে কোনও শিল্পের ভেদ নেই। সমুদয় শিল্পকলা রূপের দিক দিয়ে সুনির্দিষ্ট এবং ব্যঞ্জনার দিক দিয়ে অনির্বচনীয়।

নন্দলাল বসু আনন্দলোককেই সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। তাঁর মতে কুণাল জাতকে আছে কামলোকের কথা, তার উপরে রূপলোক, তারও উপরে অরূপলোক। তাঁর মতে তারও উপরে আনন্দলোক। কামলোকে আসক্তি, তাই অন্ধতা। রূপলোকে উঠে রূপ গোচরীভূত হয়েছে। অরূপলোকে পৌঁছে প্রাণে নিখিলপ্রাণের ছন্দস্পন্দন অনুভব করা গেছে।[৩৬] তারপর ? আনন্দলোকে পৌঁছে সেই ছন্দস্পন্দন অনুরণিত হয়েছে প্রাণ হতে প্রাণে, সংযোজিত হতে চেয়েছে মহাকালের সঙ্গে।

সাধারণত আমরা দেখি শিল্পীর রসবোধ না থাকলে শিল্পসৃষ্টি সম্পূর্ণ হয় না বা তাকে শিল্প আখ্যা দেওয়া যায় না। কাজেই রসের মাধ্যমেই যখন আনন্দপ্রাপ্তি এবং এর আর দ্বিমত নেই যখন তখন চতুঃষষ্ঠী শিল্পকলার যে কোনও একটা নিয়েই আমরা চর্চা করি না কেন রসের উৎকর্ষ সাধন করতেই হবে।

শিল্পতাত্ত্বিক দেণ্ট প্রশ্ন করেছেন শিল্প সংরক্ষণের আদৌ কোনও সার্থকতা আছে কিনা ? একমাত্র ঐতিহাসিক নজীর রক্ষা ব্যতীত।[৩৭] যে পটভূমিকায় তাজমহল, অজন্তা গুহার সৃষ্টি হয়েছিল আজ সেই অতীতকাল কেউ প্রত্যাশা করবে না। কিন্তু শিল্পের ধাবা সম্প্রসারণে রক্ষিত শিল্পকলাসমূহ অমূল্য রত্নরাজি রূপেই স্বীকৃত। সমসাময়িক শিল্পী একে অন্যকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হলেও কোন বিগত শিল্পীর সৃষ্ট কর্ম হতে নতুন শিল্পী কি শুধু শিল্পের ধরনটি বোঝবার জন্যই ব্যস্ত থাকবেন ? তা নয়। অনেক সময় এক শিল্পও অন্য শিল্পের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। ফলে সৃষ্টি হয় নূতন শিল্পকলা। শিল্পীর সঙ্গে যেমন শিল্পের যোগ, শিল্পের সঙ্গেও তেমন শিল্পের যোগ বর্তমান।

পল গগ্যাঁ শিল্প উপভোগ সম্বন্ধে একটি উক্তি করেছিলেন, গান শোনার সময়

স্বপ্ন দেখা যায় চিত্রাঙ্কনের সময়ও তাই, কিন্তু সাহিত্য পাঠের সময় পাঠক লেখকের ভৃত্য হয়। কিন্তু কথাটি ঠিক নয়। সংগীত শ্রবণে ধ্যান হয় স্বপ্ন নয়। চিত্র দর্শনে আনন্দ হয়, চিন্তার উদ্রেকও করে। তেমনই সাহিত্য পাঠের সময়ে লেখকের অস্তিত্ব হারিয়ে যায়। তাছাড়া প্রত্যেক শিল্পের ক্ষেত্রেই শুধু শিল্পই বিচার্য বিষয় হওয়া উচিত, শিল্পী নয়।

বৈপরীত্যের মাধ্যমে একতা, নৈকট্য এবং পৃথকীকরণ, উপস্থিতির স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত উপভোগের ক্ষমতা শিল্পের ক্ষেত্রে এগুলি প্রত্যেকটি পৃথকভাবে এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে গুরুত্বপূর্ণ।[৩৮]

শিল্প শিক্ষা দেওয়ার জন্য নয়, আনন্দবর্ধনেই শিল্পের সার্থকতা, বিমল আনন্দের মাধ্যমে উচ্চতর উপলব্ধির প্রয়াস।

মানসিকভাবে অশান্ত ক্রিয়া সমূহ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। সমস্ত শিল্পকলার গোপন রহস্য এই। শিল্পগুলির মধ্যে আবার বিশেষভাবে সংগীতের নাম করা যায়। এ বিষয়ে দেন্ট বলেন,

যেহেতু সংগীত সভ্য ও সুসংস্কৃত জীবনের স্বাভাবিক আনন্দ তাই সংগীত রহস্যময়তার থেকে মুক্ত এবং একাধারে সর্বাপেক্ষা সচেতন ও সদাজাগ্রত শিল্প হল সংগীত।[৩৯]

তাছাড়া কোনও শিল্পসৃষ্টিই কোনও কালে নির্দিষ্ট সময়ের অভ্যন্তরে পূর্ণ সমাদর অর্জন করতে সক্ষম হয় না, শিল্পকর্মের ধরন বা ঢং শিল্পীকে নিত্যনূতন অভিজ্ঞতার রাজ্যে তুলে ধরে। শিল্পের ধরন উপাদান স্বরূপ কোনও নির্দিষ্ট অন্তিমে পৌঁছাতে উপায় রূপে ব্যবহৃত হয়। ভারতীয় সৌন্দর্যতত্ত্বে এই রীতি চিরাচরিত রূপে স্বীকৃত। এইই তো সুন্দরের জয়যাত্রা।

পঞ্চম অধ্যায়

সংগীত ও ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনা : সংগীত ও আনন্দ, সংগীতে মুক্তি

ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্যেব মর্মমূলে আছে যোগ সাধনা। তাই পাশ্চাত্যের শিল্পীদের পক্ষে যোগসাধনার ধারণা ব্যতীত ভারতীয় শিল্পতত্ত্বের মূলোদ্‌ঘাটন সম্ভব নয়।

শেলী 'ওড্ টু দি ওয়েস্ট উইণ্ড' এ যোগসাধনাব মুখ্য উদ্দেশ্যই তুলে ধরেছেন বলা চলে।

সুইট থ্রো ইন্ স্যাডনেস্, বি দাউ স্পিরিট ফিয়ার্স,
মাই স্পিরিট ! বি দাউ উই ইমপেটাস্, ওয়ান !
ড্রাইভ মাই ডেড থট্‌স্ ওভার দি ইউনিভার্স
লাইক উইদার্ড লিভ্‌স টু কীইকেন এ নিউ বার্থ ;
এ্যাণ্ড বাই দি ইনক্যান্‌টেশন অব্ দিস ভার্স,
স্ক্যাটার এ্যাজ ফ্রম অ্যান আনএক্সটিংগুইস্‌ড্ হার্থ,
অ্যাশেস এ্যাণ্ড স্পার্কস্ মাই ওয়ার্ডস এ্যামং ম্যানকাইণ্ড !

এই যোগসাধনার শক্তিতেই গন্ধর্বরা, অপ্সরানাম্নী অপরূপারা অলৌকিক দেহসৌন্দর্য লাভ করে দৈবপ্রতিভায় বলীয়ান হয়ে শিল্পসাধনায় সম্যক উৎকর্ষ সাধন করতে পেরেছিলেন। বুদ্ধদেবের পদ্মাসনে উপবিষ্ট মূর্তিটিও সেই ধ্যানধারণাই বহন করে। শুক্রাচার্য প্রণীত শুক্রনীতিসার গ্রন্থে ভারতীয় শিল্পতত্ত্বের মূল কথায় বলা হয়ে থাকে শিল্পকর্মে যোগধ্যানে নন্দনশিল্পের মূর্ত প্রতীক মস্তিষ্কে জাগরিত হয়ে থাকে, পরবর্তী ক্রিয়ায় শিল্পীকে যথার্থরূপে সেই ধ্যানমূর্তিটি ফুটিয়ে তুলতে দেখা যায়। প্রত্যেক মানুষের ভিতরে যে মহাকুণ্ডলী রয়েছে, যোগসাধনার দ্বারা তাকে জাগ্রত করা যায়, সেই সর্পাকৃতি কুণ্ডলীই বিভিন্ন শক্তির কেন্দ্র। মেরুদণ্ডের উপরে মস্তিষ্কের 'কৈলাস' কেন্দ্রটি শীর্ষস্থানীয় সর্বদিক থেকেই কি মানসিক কি শারীরিক। বিবেক শিবশক্তির সঙ্গে এই ভাবেই

নন্দিত হয়ে ওঠে এবং মহাজাগতিক ক্রিয়াসমূহের বিশেষ বিশেষ স্বরূপ উপলব্ধি করবার পটভূমি হয়ে দাঁড়ায়। 'সাধনা'র ধারণা সম্বন্ধে পৌরাণিক ক্রিয়াকলাপ ভারতীয় নন্দনতত্ত্বে কখনও বড় হয়ে দেখা দেয়নি। তাই শিল্পকর্মের মূর্ত প্রয়াসে যেটি প্রথম প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেটি প্রেম ও ভক্তিবাদ।

ক্ষিতিমোহন সেন প্রেম ভক্তি সাধনার যে ধারাবাহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তাকে মূলত তিনটি স্তরে ভাগ করা চলে। এবং সব সাধনার মূল প্রয়াস সেই কুলকুণ্ডলিনী শক্তিতে। হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণার ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে গুণীরা মানব জীবনের জয়গান গেয়ে চলেছেন, ঈশ্বরের লীলা প্রমত্ত হয়ে। প্রথম স্তরে লেখক জানিয়েছেন ভারতীয় আদিম জাতি দ্রাবিড় ও প্রাক্‌দ্রাবিড়েরা ভারতে আগত আর্যদের রীতিনীতি, আচর আচরণ, নিজেদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন। একটি প্রধান সমন্বয়ের নীতি এই ভাবেই জন্ম নিল। বেদের ভাবধারা উপনিষদের বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের ভিত্তিভূমি রচিত করে। মহাবীর, গৌতমবুদ্ধ প্রমুখ মহাপুরুষেরা এই ভাবধারারই বাহক। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থসমূহের চিন্তাধারা আর্য, অনার্যদের যৌথকীর্তির সম্মিলিত ভাবধারা।এই প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর আর্য অনার্যদের মিলিত সাধনার সঙ্গে লিথিয়ান হুন এবং অন্যান্য ভারতে আগত উপজাতিদের মিলিত সাধনার প্রভাব। তৃতীয় স্তরটি মুসলমানদের ভারতে আগমনের পরবর্তীকাল সূচিত করে। মুসলমানদের একেশ্বরবাদ ও রাজশক্তি ভারতের জনজীবনে প্রভাব বিস্তারে একটি আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে এগিয়ে দাঁড়াল। ভারতীয় দর্শনের অনেক মূলতত্ত্বই যেমন সংগীত, জ্যোতিষ, ভাস্কর্য, চিত্রকলা ইত্যাদির সঙ্গে মুসলমানদের যোগাযোগ সুপ্রাচীন কাল হতে প্রবাহিত। সেইজন্য হিন্দুদের নিকট মুসলমানদের ধর্ম, রীতিনীতি সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল না। তথাপি মুসলমান ধর্মের প্রভাব ভারতের হিন্দু প্রতিষ্ঠিত ধর্ম, আচার আচরণের উপর একটি প্রচণ্ড আঘাত রূপে দেখা দিল।[১]

এই অসহনীয় যুগসন্ধিক্ষণে সর্বধর্মের মূলতত্ত্ব মথিত করে জনসাধারণের নিকট গ্রহণীয় হয়ে দাঁড়াল যে ভাবধারাটি সেটিই হল মূলত প্রেম ও ভক্তির। এই মিলনের সূত্রে সাড়া দিলেন বৌদ্ধ, মুসলমান ইত্যাদি সকল সম্প্রদায়। ভারতে সাধক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটল। হিন্দু দেবদেবী, মন্দির, প্রাচীন পুঁথি, চিত্র, ভাস্কর্য, সংগীত শাস্ত্র সমূহ ধ্বংসের পথ হতে রক্ষার দায়িত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করতে যুগান্তকারী ভক্তিবাদ ক্রমাগত জয়ী হওয়ার ক্ষেত্র সুবিস্তৃত করল। মুসলমানদের মধ্যে সুফী মতবাদের প্রবক্তাদেরও কালে দেখা গেল এই

প্রেমভক্তির মতবাদ প্রচারে এগিয়ে যাওয়ার পথে। অবশ্য তখন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের একটি অংশ হুসেনী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়রূপে এগিয়ে দাঁড়িয়েছেন। এই যুক্ত প্রেমভক্তি সাধনায় হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থগুলির পাশে স্থান গ্রহণ করল ইসলাম ধর্ম গ্রন্থগুলি। ঈশ্বরের দাক্ষিণ্য দেখা দিল সংযুক্তিকরণের ক্ষেত্রগুলিতে। সংগীতে, চিত্রে, ভাস্কর্যে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়। একাধারে প্রেম, ভক্তি, আবেগমথিত হয়ে হিন্দু সংগীত নিত্য নূতন বৈচিত্র্যে মণ্ডিত করল তার ক্ষেত্র। সেই অপ্রতিহত সাধনার প্রভাব অদ্যাবধি বিদ্যমান।

ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের ইতিহাসে বিভিন্ন ধর্মের প্রভাব তাই ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। ভারতাত্মার সেই অতীতকাল থেকে দেহ হতে দেহান্তর ঘটছে, বার বার সে নতুন আকৃতি নিচ্ছে সাধনার পথে।[২]

ভারতের শিল্প, সভ্যতা এবং সংস্কৃতি সমস্তই প্রতিষ্ঠিত তিনটি পথের উপর। জ্ঞানমার্গ, কর্মমার্গ এবং ভক্তিমার্গ। এই তিনটি পথের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের নিকট পৌঁছান যায়। তিনটি মার্গের বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি জ্ঞানমার্গ সকলের জন্য নয়। উচ্চশিক্ষিত এবং অধিকাংশ ব্রাহ্মণ, সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয় জাতি বিশ্বাস করে থাকেন জ্ঞানের মধ্য দিয়েই ঈশ্বর প্রাপ্তি। ক্ষত্রিয এবং পরিশ্রমী, কর্মঠ কিছু জাতি নিজেদের কর্মের মধ্যে নিয়োজিত রাখেন। তাঁদের ধ্যান এবং জ্ঞান হল কর্ম। তাই তাঁরা কর্ম মার্গে বিশ্বাসী। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর মতাবলম্বীর সংখ্যা কম। তুলনামূলকভাবে ভক্তিমার্গের পথিক অনেক বেশি। শুধুমাত্র ভক্তি এবং শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের দ্বারা ভারতবর্ষের জনসাধারণ উপলব্ধি করে যে তারা একদিন ঈশ্বরের চরণে ঠাঁই পাবে। এই চিন্তাধারার প্রভাব দেখা দিয়েছে শিল্পে। তাই নানা প্রকার আলেখ্য এবং পৌরাণিক ঘটনার প্রতিফলন দেখা যায় চিত্র, ভাস্কর্য এবং বিভিন্ন স্থাপত্য শিল্পের মধ্য দিয়ে। তাই দক্ষিণ ভারতের অনেক মন্দিরে দেখা যায় দেবতা নেই শূন্য মন্দির। সেই শূন্যময়তাই পূর্ণতার লক্ষণ। এখানে এলে মানুষকে নিজের মুখোমুখী দাঁড়াতে হয়। তখনই মনে যে বোধ জাগ্রত হয়, তাই হল ঈশ্বরোপলব্ধি।

বলা হয় ব্রহ্মকে যিনি আস্বাদন করেছেন অর্থাৎ ব্রহ্মকে যিনি লাভ করেছেন তিনিই প্রকৃত ধার্মিক। ধর্মকে তার স্বরূপে উপলব্ধি করা বড় কঠিন বিষয়। যিনি ধর্ম মানেন তিনিই ধার্মিক এ কথাটিও ঠিক নয়। হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম, ইসলামধর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্ম বলতে আমরা সাধারণভাবে বুঝে থাকি হিন্দুরা যে ধর্ম পালন করেন, তাই হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধরা যে ধর্ম পালন করে থাকেন তাই বৌদ্ধধর্ম ইত্যাদি। কিন্তু অনেক অহিন্দু আছেন যাঁরা হিন্দু ধর্মকে ভালবাসেন

এবং এই ধর্মকে যথার্থ গ্রহণ করতে পেরেছেন। কাজেই আপাতদৃষ্টিতে মনে হলেও ধর্ম কোনও ব্যক্তি জাতি বা সম্প্রদায়ের নিজস্ব নয়। সবচেয়ে বড় কথা, প্রত্যেক ধর্মের মূল যদি অনুসন্ধান করা যায় তাহলে দেখা যাবে প্রত্যেকের বক্তব্য বিষয়ের মধ্যেই মিল আছে। শুধু পার্থক্য হল সেই ধর্ম পালন এবং বিধি নিষেধের মধ্যে।

সকল ধর্মেরই প্রারম্ভ কোনও বিশেষ ব্যক্তিকে নিয়ে এবং তাঁর মুখনিঃসৃত বাণীই সেই ধর্মের মূল কথা। প্রত্যেক ধর্মেরই নিজস্ব গ্রন্থ আছে এবং জাতিবিশেষ সেই গ্রন্থটিকেই নিজেদের ধর্মগ্রন্থ বলে মান্য করে থাকেন। বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক। খ্রীষ্টধর্মের অন্যতম গ্রন্থ বাইবেল। ইসলাম ধর্মের অবলম্বন কোরাণ গ্রন্থ। পারসিকদের ধর্মগ্রন্থের নাম 'জেন্দ্ আবেস্তা'। প্রত্যেক ধর্মের আদিতে একজন মহাপুরুষের ইতিহাস আমরা দেখতে পাই যিনি অনেক দুঃখ কষ্টেব মধ্য দিয়ে নিজের মত এবং পথকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। এই মহাপুরুষদের মধ্যে যাঁবা অন্যতম যাঁদের আবির্ভাব এবং তিরোধানের ইতিহাস সম্পর্কে লোক নিঃসংশয় তাঁরা হলেন যীশুখৃষ্ট এবং হজরত মহম্মদ। এছাড়াও আছেন বৃদ্ধদেব, শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি।

এর মধ্যে আবার নিজ মতে স্থির এবং বিশ্বাসী হল খ্রীষ্ট ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম এবং ইসলাম ধর্ম। এই ধর্মগুলির বৈশিষ্ট্যই হল এই ধর্মগুলি প্রচারশীল। এর মধ্যে নিজ মতে এবং পথে আনয়ন করার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল ইসলাম ধর্মের মধ্যে যখন ভারতবর্ষে শত শত বৎসব ধরে মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। বৌদ্ধধর্মও প্রচারশীল তবে এই ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর অহিংসাব্রত। হিংসার দ্বারা কাউকে জয় করা যায় না, এই ধর্মাবলম্বীরা তা সম্যকরূপে উপলব্ধি করে ছিলেন। শুধুমাত্র বৃদ্ধদেবের বাণী এবং এই পথ নির্দিষ্ট কর্ম প্রচেষ্টার নমুনাব দ্বারাই এক সময় হাজার হাজার লোক এই ধর্মে দীক্ষিত হয়। এই ধর্মমতগুলির মধ্যে তুলনামূলক ভাবে হিন্দু ধর্ম নীরব নিরপেক্ষ এবং সহনশীল। প্রত্যেক জাতি এবং ধর্মের মধ্যেই আরো মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের বাণীও আবার এই ধর্মমতগুলিকে কখনও বা ভারাক্রান্ত কখনও মহিমামণ্ডিত করে তুলেছে।

আদিগ্রন্থ বলতে ধরা হয় বেদকে। পৃথিবীরও আদিগ্রন্থ বলে বেদকে ধরা যায়। বেদের চারিটি ভাগ ঋক, যজুঃ সাম, অথর্ব। বেদ কিন্তু কোন বিশেষ ভাষা দ্বারা রচিত লিখিত ধর্মগ্রন্থ নয়। বেদ হচ্ছে কতকগুলি শব্দ সংযোগ। শব্দই ব্রহ্ম। সেই সময় লোকের ধারণা ছিল শব্দের দ্বারা মনের চিন্তা ব্যক্ত করা যায়। শব্দগুলির যথার্থ উচ্চারণে পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যার সমাধান করা যায়। তাই

বেদের মন্ত্র বা স্তব হল কতকগুলি শব্দ সমষ্টি। এর কয়েক হাজার বৎসর পরে সৃষ্টি হয়েছে রামায়ণ। রামায়ণ রচিত হয়েছে সংস্কৃত ভাষায়। বহু বৎসর পূর্বে রচিত এই গ্রন্থ এখনও ধর্মগ্রন্থ হিসাবে সর্বাধিক জনপ্রিয় গ্রন্থ। এর পরে রচিত হয়েছে মহাভারত। এটিও ধর্মগ্রন্থ রূপে পরিচিত। মহাভারতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বর্ণনা আছে। সেখানে অর্জুন প্রথমে যুদ্ধক্ষেত্রে বিপুল ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ অনুভব করে বিমর্ষ হয়ে পড়েন, এবং যুদ্ধ করতে অস্বীকৃত হন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বিশ্বরূপ দর্শন করান এবং সেই সময়ে তিনি জাগতিক নিয়মের যে বর্ণনা দেন তাই গীতা গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এর কয়েক হাজার বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেন বুদ্ধদেব।

বুদ্ধদেবের মতানুযায়ী ঈশ্বরকে আকাঙ্ক্ষা করতে গেলে মানুষকে হতে হবে পবিত্র এবং প্রত্যেক মানুষের মঙ্গল কামনায় নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে। তাঁর মতে কর্মের মধ্য দিয়েই আসবে আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি। বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্য হল অহিংসা। হিংসার দ্বারা কখনও জয় করা যায় না বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা একথা বিশ্বাস করতেন। তাই একসময়ে দেখা গেল এই ধর্মই পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ মানুষের মন জয় করেছে। বুদ্ধদেব কোনও নূতন ধর্ম প্রবর্তিত করেননি, তিনি শুধু যে ধর্ম সেই সময়ে প্রচলিত ছিল তারই সংস্কার সাধন করেছেন। তথাপি ধর্ম প্রচারক বলতে প্রথম বুদ্ধদেবকেই বোঝায়।

বুদ্ধদেবের সময়ে ছিল পুরোহিতদের দোর্দণ্ড প্রতাপ। তাঁরা নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে ছিলেন সচেতন। অধিকাংশ সময়ে তাঁদের বিচারই ছিল চূড়ান্ত বিচার। ঈশ্বরকে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এক ভয়ের জগতে। সেই সময়ে বুদ্ধদেব প্রথম অনুভব করলেন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ দূর করতে না পারলে সেখানে প্রকৃত ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। 'প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করা বৌদ্ধধর্মের অন্যতম শিক্ষা'[৩], বিশ্বপ্রেমও বুদ্ধদেবের প্রতিষ্ঠিত নীতি। এর ছয়শত বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করলেন যীশুখ্রীষ্ট। এর পর প্রবর্তিত হল খ্রীষ্টধর্ম। তবে বিবেকানন্দের মতে বৌদ্ধধর্মই খ্রীষ্টধর্মের ভিত্তি। ক্যাথলিক সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্ম থেকেই উদ্ভূত। এরও পরে এসেছেন হজরত মহম্মদ। সৃষ্টি হয়েছে ইসলাম ধর্ম ইত্যাদি। প্রত্যেক ধর্মেরই নিজস্ব গ্রন্থ আছে। গ্রন্থের প্রয়োজন এই জন্যই যে মানুষ সেই পুস্তককে কেন্দ্র করেই নিজের মনকে সংহত করতে পারে। গ্রন্থটি তার অবলম্বনস্বরূপ। দেখা গেছে যে গ্রন্থ না থাকলে সেই ধর্মের ভিত সুদৃঢ় হচ্ছে না। পার্শীদের ধর্মনীতির সঙ্গেও বৌদ্ধদের ধর্মের মিল আছে। এই ধর্মেরও মূলভাব সুচিন্তা, সৎবাক্য এবং সুকর্ম। এদের মধ্যে হিন্দুধর্মই প্রবলভাবে ঈশ্বরে

বিশ্বাসী। প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেই আছে সম্প্রদায়। তাহলেও প্রত্যেক ধর্মই শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে এক অনন্ত সত্তাকে। যার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে অসীম ব্রহ্মাণ্ডলোক। এক নিত্য প্রবহমান শক্তি। তারই অনন্ত প্রকাশ উপলব্ধি করতে হয় প্রতিদিনের জীবনে।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বক্তৃতার মধ্য দিয়ে যুগ পরম্পরায় ঈশ্বর আরাধনার একটি চিত্র তুলে ধরেছেন।

"অসভ্য মানুষ পিতৃপুরুষের পূজা হইতে হাতীদের পূজায় পৌঁছায় এবং পরে বজ্র এবং ঝড়ের দেবতা প্রভৃতি নানা দেবতার উপাসনায়। এই অবস্থায় মানুষের ধর্ম ছিল বহু দেববাদ।

সূর্যোদয়ের সৌন্দর্য, সূর্যাস্তের চমৎকারিতা, নক্ষত্রখচিত আকাশের রহস্যময় দৃশ্য এবং বজ্র ও বিদ্যুতের অদ্ভুত অলৌকিকতা মানুষের মনে এমন একটি গভীর আবেশ সৃষ্টি করিয়াছিল, যাহা সে ব্যাখ্যা করিতে পারে নাই। ফলে চোখের সম্মুখে উপস্থিত প্রকৃতির এই সব বিশাল ঘটনার নিয়ামক একজন উচ্চতর এবং মহাশক্তিমান কেহ আছেন এই ধারণাই তাহার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়ছিল। ইহার পর আসিল আর একটি পর্যায়, একেশ্বরবাদের কাল। বিভিন্ন দেবতারা অদৃশ্য হইয়া একটি মাত্র সত্তায় মিশিয়া গেলেন—দেবতার দেবতা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরে।"[৪]

এর পরের যুগ এল, তাঁরা বললেন, 'আমরা ঈশ্বরের সভায় বাঁচিয়া আছি, তাঁহারই মধ্যে চলিতেছি, ফিরিতেছি। তিনিই গতি স্বরূপ।'[৫]

এর পর এল দর্শনশাস্ত্রের যুগ। "যাহাকে সর্বেশ্বরবাদের কাল বলা হয়। আর্য জাতির বহু দেবতা বাদ, একেশ্বরবাদ এবং বিশ্বজগতই ঈশ্বর,—সর্বেশ্বরবাদের এই মতও প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, 'আমার অন্তরাত্মাই একমাত্র সত্য। আমার প্রকৃতি হইল সত্তাস্বরূপ, যত কিছু বিস্তৃতি তাহা আমাতেই।"[৬] প্রত্যেক মানুষই যেমন কোন না কোনও ধর্মকে অবলম্বন করে সেইরকম একথাও সত্যি ধর্মের এই ক্ষমতা আছে যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এবং আধ্যাত্মিক জীবনে মঙ্গল সাধনে সক্ষম। তবে মানুষ যেদিন নিজেকে নিজেই সম্পূর্ণরূপে দেখতে শিখবে, উপলব্ধি করতে পারবে, সেদিনই ধর্মের চূড়ান্ত সার্থকতা। হিন্দুধর্ম একান্তভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাসী, এখানেই হিন্দুধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের পার্থক্য।

হিন্দুদের মনে প্রথমে থাকে পাপবোধ ফলে ঈশ্বরকে ভয় করার মধ্য দিয়ে তাঁদের ধর্মজীবন শুরু হয়। এরপরে ধীরে ধীরে তাঁরা ঈশ্বরের স্বরূপকে বুঝতে

চেষ্টা করেন। ফলে তাঁদের মনের পাপবোধ ক্রমশ অপসারিত হয় এবং ঈশ্বরকে ভালবাসার একটা বোধ জাগ্রত হয়।

প্রত্যেক ধর্মকেই মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। দার্শনিক, পৌরাণিক, আনুষ্ঠানিক। দার্শনিক ভাগ বলতে বিবেকানন্দ বুঝিয়েছেন যাতে সেই ধর্মের সমগ্র বিষয়বস্তু অর্থাৎ এর মূলতত্ত্ব, উদ্দেশ্য ও তা লাভের উপায় নিহিত। পৌরাণিক ভাগে দর্শনেরই স্থূল রূপ প্রদান। এতে অপ্রাকৃত পুরুষদের জীবনের উপাখ্যান ইত্যাদি লিপিবদ্ধ হয়েছে।

তৃতীয় বিভাগে পূজাপদ্ধতি আচারানুষ্ঠান, বিবিধ অঙ্গন্যাস, পুষ্প, ধূপধূনা প্রভৃতি নানা প্রকার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর প্রয়োগ আছে। আনুষ্ঠানিক ধর্ম বলতে এগুলিকেই বুঝায়। গ্রীসের সভ্যতাও ভারতবর্ষের মত পুরাতন। কিন্তু সেখানেও বহু পূর্বে এই আনুষ্ঠানিক পূজা পদ্ধতিরই প্রচলন ছিল। কারণ গ্রীস দেশের অধিবাসীদের মন ছিল অতি বাস্তববাদী। ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল তাদের প্রয়োজনের সম্বন্ধ। অগ্নি তাদের বহু কাজ করে নানা প্রয়োজন সাধিত করে ফলে তারা অগ্নিকে দেবতারূপে অর্চনা করল। এই ভাবে তারা বায়ুকেও দেবতারূপে অর্চনা করল। ভারতবর্ষেও অগ্নি, বরুণ, পবন ইত্যাদি দেবতারূপে অধিষ্ঠিত। ফলে আবহমান কাল ধরে এক মতদ্বৈধতা দেখা দিয়েছে ধর্মের শুরু কোথায় ? কেউ বলেন বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে ঋষিরা যে দেবতাকে পূজা করে এসেছেন, বংশানুক্রমে এবং যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষও সেই পথেই উপাসনা করে এসেছে। আবার অনেকে বলে থাকেন প্রকৃতির বিভিন্ন চমক সৃষ্টিকারী ক্ষমতার দ্বারা বশীভূত হয়ে তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য এবং তাকে বিভিন্ন কাজে লাগানোর জন্য আদিম মানুষ নিজ বুদ্ধিতে তাদের পূজা শুরু করে, এই ভাবে পূজাপদ্ধতি প্রচলিত হয়। এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব আজও চলে আসছে। তবে মনে হয় দুটি ধারাই যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। বিভিন্ন দেবদেবী পূজার অন্যতম কারণই হল প্রত্যেক মানুষই সাধু নয়। মানুষের মন সতত চঞ্চল। কাজেই অদৃশ্য অথচ কোনও স্থির লক্ষ্যে মন সংযোগ করা তার পক্ষে কঠিন, সেইজন্যই সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি। দান প্রতিদানের খেলার সমাপ্তি ঘটিয়ে যখন দেখা দেয় প্রেম, সেই নিষ্কাম ভালবাসার পরিপূর্ণতাই মানুষের মনে জাগায় তৃপ্তি। এই তৃপ্তিবোধের থেকেই মানুষ আনন্দকে উপলব্ধি করে। সেই আনন্দই ব্রহ্ম। মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক সৃষ্টির আদিকাল থেকে। এক সর্বশক্তিমানের অস্তিত্ব যে পরোক্ষে থেকে তাদের সমস্ত জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে এই ভাবনাকে মানুষ কোনদিনই অস্বীকার করতে পারেনি। তাই যুগ যুগ ধরে

সেই ঈশ্বরের সাধনায়ই মানুষ নিজেকে নিয়োজিত করেছে এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ঈশ্বরকে পাওয়ার আরাধনা করেছে। ভগবানকে পাওয়ার জন্য মানুষ যে আরাধনা করেছে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তার প্রথম সোপান সংগীত। ভগবানকে আরাধনা করার মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হয়েছে ভজন সংগীত। মানুষ ঈশ্বরকে তার প্রথম পূজা জানিয়েছে সুরের মাধ্যমে। এর প্রমাণ আমরা পাই প্রথম বৈদিক যুগ থেকেই। ভাষা সৃষ্টির পূর্বেই হয়েছে সুর সৃষ্টি। তখন সংগীতের ব্যাকরণ বলে কিছুই ছিল না শুধু অন্তরের আনন্দ প্রকাশই ছিল সংগীতের প্রেরণা। মানুষ জীবনের যে কোনও মুহূর্তে যখনই আনন্দকে উপলব্ধি করল তখনই সে ব্রহ্মকে আস্বাদন করল। আনন্দই ব্রহ্ম। সংগীতই মানুষকে আনন্দের পথ চিনিয়ে দিতে সক্ষম। বৈদিক যুগেই মানুষ ঈশ্বরের আরাধনা করেছে সুরের মাধ্যমে। কতকগুলি শুধু শব্দ যার দ্বারা মানুষ তার চিন্তাকে ব্যক্ত করত, সেই শব্দে সুর সংযোজনা করা হল। অধ্যাত্ম সাধনার সঙ্গে সংগীত সাধনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণই হল সংগীত মানুষের মনকে সংবদ্ধ করতে সাহায্য করে।

মানুষের জীবনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখ যায়, তা ক্রমাগত উন্নতির পথেই চলেছে, সংগীতও তাই।

ভারতের সংগীতের ইতিহাসকে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ এবং বর্তমান যুগ।

প্রাচীন যুগ বলতে বুঝিয়েছেন আদিম যুগ থেকে ১২০০ শতক পর্যন্ত। মধ্য যুগ বলতে এর পর থেকে ১৮০০ শতক পর্যন্ত। বর্তমান যুগ বলতে ১৮০০ শতক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত।[৮] আদিম যুগে আমরা দেখি, রোগে, শোকে, আনন্দে, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ সবকিছুতেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ এক অতিপ্রাকৃতের অস্তিত্ব অনুভব করত। তারা তখনও ভালভাবে বুঝতে শেখেনি তিনিই এক এবং অদ্বিতীয়। তারা ভেবেছিল ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার জন্য ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্ব। তারা ভয় করা শিখল এবং ভক্তি করা শিখল, পরিতুষ্ট করতে শিখল সেই অস্তিত্বকে। পরিতুষ্ট করার প্রধান পথই হল সংগীত। গীতবাদ্য, নৃত্যের সংযোগে তারা পূজার্চনায় মন দিল। সেই সময়ে সংগীতের উদ্দেশ্যই ছিল দেবতাকে পরিতুষ্ট করা। সিন্ধু সভ্যতার যুগ, যার সঙ্গে আমাদের পরিচয় শুধুমাত্র খননকার্যের দ্বারা প্রাপ্ত জিনিসগুলির মাধ্যমে, সেখানেও পাওয়া গেছে বাঁশি, বীণা ইত্যাদি। সামবেদ, ঋগ্বেদে নৃত্য গীত ও বাদ্যের প্রচলন ছিল তা পাওয়া যায়। তবে গান বা পাঠ সমার্থক ছিল। সমস্ত বৈদিক সাহিত্যেই সংগীত

বলতে উদ্‌গান, উদ্‌গীতি স্তোত্র প্রভৃতি বুঝায়। এবং এগুলি সবই ঈশ্বরের আরাধনার ক্ষেত্রে ছিল অপরিহার্য।

বেদ ও সংহিতার পরই ব্রাহ্মণ সাহিত্য তারপরই আরণ্যক ও উপনিষদ এবং তারপর সূত্র সাহিত্যের স্থান। এছাড়া আছে শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্য গ্রন্থ। প্রত্যেক শাখাকে অবলম্বন করেই সামগান রচিত হয়েছে দেখা যায়।

ঋগ্বেদেই আছে যে বিভিন্ন ছন্দগুলিকে সুরারোপ করে দেবতাদের নিবেদন করা হবে। 'সাম' শব্দটির দ্বারাই বোঝান হয়েছে গানকে। যজ্ঞস্থলে ঈশ্বরকে আহ্বান করা হত বেদগান বা সামগানের মধ্য দিয়ে।

সামবেদে সমস্ত প্রকার গীতি প্রণালীর উল্লেখ আছে। অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন অস্তিত্বের উদ্দেশ্যে সেই গান নিবেদিত হত।

বৈদিক সাহিত্যে বলা হয়েছে, যিনি সংগীতের পরম অনুরাগী, তিনিই ঈশ্বরের সংস্পর্শে আসবেন। আমরা দেখি যে ঋগ্বেদের ছন্দগুলিতে সুর সংযোগ করে তা দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হত। বৈদিক স্বর সংযোগের ফলে সাম শব্দটি দ্বারাই গান বুঝায়। বৈদিক সমাজে বিভিন্ন ঋগক্ষর বিশিষ্ট স্তোত্রগুলি স্বরযোগে গান করা হত।

তিন শ্রেণীর স্তোত্র যথা বর্ণস্তোত্র, পদস্তোত্র, বাক্যস্তোত্র। গান হিসেবে এই স্তোত্রগুলির প্রচলন ছিল। যজ্ঞকালে সর্বদাই বেদগান তথা সামগান গাওয়ার রীতি ছিল। আমরা দেখছি ঈশ্বরের সঙ্গে অর্থাৎ দেবতাদের সঙ্গে গানের এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে চিরদিনই। বৈদিকযুগে তখনকার প্রচলিত সামগান ছাড়া যাগযজ্ঞ সম্পূর্ণ হত না। এই গান গাওয়া হত বিশেষভাবে এবং এর পিছনে থাকত বিশেষ উদ্দেশ্য।

সামগানে সাতটি স্বরেরই ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যেমন উচ্চ ক্রুষ্টস্বরে ইন্দ্রাদি দেবতারা পরিতৃপ্ত হন। প্রথম স্বরে মনুষ্য জাতি, দ্বিতীয় স্বরে গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ, তৃতীয় স্বরে পশুরা, চতুর্থস্বরে পিতৃগণ ও বিশ্বের অন্যান্য সকল প্রাণী, পঞ্চমে অসুর ও রাক্ষসেরা এবং ষষ্ঠে বৃক্ষলতা প্রভৃতি প্রীত হয়। এর অর্থ আর কিছুই নয় সুরের সাহায্যে বিশ্বচরাচরের সঙ্গে এক সম্পর্ক স্থাপন করার প্রয়াস দেখা যাচ্ছে। তার কারণই হল জগতের সমস্ত কিছুরই মধ্য দিয়ে সেই অনন্তকে উপলব্ধি করার প্রচেষ্টা।

বহু যুগ পরে বিশ্বকবিও তাই অনুভব করেছেন,

"গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি
ভুবনখানি

তখন তারে চিনি আমি, তখন তারে
জানি ॥
তখন সে যে বাহির ছেড়ে
অন্তরে মোর আসে,
তখন আমার হৃদয় কাঁপে তারি ঘাসে
ঘাসে ।

রামায়ণ এবং মহাভারতে সংগীতেরই মুখ্যস্থান প্রতি পর্বে । ধীরে ধীরে সংগীতের রূপান্তর ঘটেছে । অর্থাৎ বৈদিক যুগে ছিল সামগানের ব্যবহার । এখন হল গাথা গানের প্রচলন । রাজা রাবণও শিবকে ভজনা করেছেন সংগীতের মাধ্যমে । কথিত আছে বুদ্ধদেবের মহানির্বাণের পর গীতবাদ্যে আবহাওয়া মুখরিত করে বুদ্ধের দেহে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল । আমাদের দেশের আদিযুগের সংগীত স্রষ্টারা ছিলেন একাধারে গায়ক এবং সাধক । ভরতমুনি রচনা করেছেন নাট্যশাস্ত্র । এছাড়া আছেন দত্তিল, মতঙ্গ, শার্ঙ্গদেব, শার্দুল,বিশ্বাবসু ইত্যাদি । এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সংসারে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি, ফলত তাঁরা ছিলেন সংযমী এবং নির্মল স্বভাব বিশিষ্ট, যার দ্বারা ঈশ্বরকে আরও কাছে নেওয়া যায় ।

সংগীতের মাহাত্ম্য সম্পর্কে নারদ সংহিতায় আছে

সামগানাদ্রুতং বিষ্ণুঃ প্রসীদত্যমরাধিপঃ ।
ন তথা যজ্ঞদানাদ্যৈঃ সত্যমেতন্মহামুনে ॥

দেবতাদেরও প্রভু স্বয়ং বিষ্ণুকে সামগানের দ্বারা যত শীঘ্র প্রসন্ন করা যায় যজ্ঞ বা জ্ঞানের দ্বারাও তা করা সম্ভব নয় ।

যমাঃ ভৃঙ্গা পতংগাশ্চ কুরঙ্গাধোপিজন্তবঃ
সর্ব এব প্রগায়ন্তে গীতব্যাপিদিগন্তরে ।

নারদ সংহিতার এই শ্লোকের দ্বারা আমরা বুঝি যে পাখী, ভ্রমর, পতঙ্গ হরিণ ইত্যাদি প্রত্যেক জীবই গান করে । অর্থাৎ সংগীত সর্বলোকে ব্যাপ্ত এবং সিদ্ধ ।

বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞঃ শ্রুতিজাতিবিশারদঃ
তালজ্ঞস্য প্রয়াসেন মোক্ষমার্গস গচ্ছতি

অর্থাৎ বীণা বাজানোর তত্ত্ব যে অবগত, শ্রুতি এবং স্বরের জাতির নিশ্চয়তায় বিশারদ তাল এবং মাত্রা সম্বন্ধে অবগত পুরুষ কোনও যোগসাধনা ব্যতীতই মোক্ষকে লাভ করে ।

দেবস্য মানবো গানং বাদ্যং নৃত্যমতন্দ্রিতঃ
কুর্তাদ্বিষ্ণোঃ প্রসাদার্থমিতি শাস্ত্রে প্রকীর্তিতম্ ॥

শাস্ত্রে লিখিত আছে,

মানুষের দ্বারা গীত বাদ্য নৃত্য যদি তন্নিষ্ঠভাবে করা যায়, তবে তা ভগবান বিষ্ণুকে প্রসন্ন করে। কারণ,

নঅহ, বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং
মদভক্তাঃ যত্র গায়তি তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ

বিষ্ণু নারদকে বলেছেন, আমি বৈকুণ্ঠেও থাকি না, যোগীর হৃদয়েও থাকি না, ভক্ত যেখানে গান করে সেখানেই আমার নিবাস।

ভারতীয় শিল্পকলার সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। তাই হ্যাভেলও বলেছেন, হিন্দুদের শিল্প সর্বদাই মানুষের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক রচনা করে থাকে এমনকি বুদ্ধের সময়ও যখন বুদ্ধের পথ অনুসরণকারীরা সর্বত্যাগী, মঠাশ্রয়ী এবং সর্বোপরি জগতের প্রতি উদাসীন এবং যখন সামগানের দ্বারা দেবতাদের তুষ্ট করার প্রথা বিলুপ্তির পথে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রত্যেকটিতেই সংগীতের বর্ণনা কিছু কিছু করে পাওয়া যায়।

সমুদ্র গুপ্তের পরে মহারাজা চন্দ্রগুপ্ত (২) বিক্রমাদিত্য, এঁদের সময়েও অর্থাৎ চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের নৃত্য ও সংগীতের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। কনৌজের রাজা হর্ষবর্ধন সংগীত নৃত্য এবং নাটকের অনুরাগী ছিলেন। এঁদের পরবর্তী যুগে পাল এবং সেন বংশের রাজাদের সময় পর্যন্ত সংগীত, নৃত্য ইত্যাদির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল তার প্রমাণ আমরা পাই বিবিধ খনন কার্যের ফসলের মাধ্যমে।

সপ্তম থেকে চারশত শতাব্দী পর্যন্ত সংগীত, শিল্পকলা, নৃত্য প্রভৃতি উন্নতির শিখরে উঠেছিল। কিন্তু এর পরেই বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেনের আমলে মহম্মদ খিলজী ভারত আক্রমণ করেন। লক্ষ্মণ সেন যথার্থ সংগীতের অনুরাগী ছিলেন। তাঁর সময়ে মন্দিরে আরাধনার সময়ে নৃত্যগীত প্রচলিত ছিল। শুধু তাই নয় ভরতের নাট্যশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী সেই নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হত। তখনকার জনসাধারণ সেই সমস্ত নৃত্যগীতের মাধ্যমে একদিকে যেমন আনন্দ অনুভব করত এবং সেই আনন্দের মধ্য দিয়েই তারা ঈশ্বরের সান্নিধ্য উপলব্ধি করত, অপরদিকে এই সমস্ত নৃত্যগীতকে কেন্দ্র করেই সেই সময়ের শিল্পকলা, দর্শন, সৌন্দর্য, কাব্যপ্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল। অনুমানে ধরা হয়,

লক্ষ্মণ সেনেরই সভাকবি ছিলেন জয়দেব। জয়দেবের গীতগোবিন্দ এক অতুলনীয় কাব্যসম্পদ। একে ঘিরে অনেক অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। এখনও দক্ষিণ ভারতের মন্দিরে মন্দিরে এই গীতগোবিন্দের আবৃত্তি নৃত্যগীতের সমন্বয়ে হয়ে থাকে। জয়দেব সৃষ্টি করেছেন এই সম্পদ, কিন্তু নিছক সৌন্দর্য প্রেরণায় নয়। অন্য এক ভাব, অন্য এক প্রেরণা, যার দ্বারা ঈশ্বরকে আরও ভালভাবে উপলব্ধি করা যায় তারই জন্য তাঁর এই স্মরণীয় সৃষ্টি। উদ্দেশ্য, সেই কেন্দ্রে পৌঁছান বলা হয় যোগসাধনা, বাংলার আধ্যাত্মিক ধারণার সঙ্গে সঙ্গীত চিরদিনই যুক্ত আছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই সংগীতকে আধ্যাত্মিক সাধনার প্রথম সোপান বলে মহাপুরুষেরা অনুভব করেছেন। তাই ব্রাহ্মধর্মের স্রষ্টা রামমোহনকে দেখি সংগীত সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে। চৈতন্যদেবকে দেখি দরজা বন্ধ করে কীর্তনে মনোনিবেশ করেছেন। রামপ্রসাদ গানে গানে কালীকে দিয়েছেন শ্রেষ্ঠ অর্ঘ।

ভারতের চৌষট্টি শিল্পকলার অন্যতম হল সংগীত। তাই সংগীতের সঙ্গে অন্যান্য শিল্পকলার পার্থক্য হল অন্য সব শিল্পকলাই ভবভূতির কথা অনুযায়ী মর্যাদা পেয়ে থাকে অর্থাৎ শত বৎসর পরেও অনেক ক্ষেত্রে তার মূল্য নির্ধারিত হয়। কিন্তু সংগীত ত তা নয়, সংগীত সৃষ্টি হয় সুরের দ্বারা যে সুরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় মানুষের কণ্ঠে। কিন্তু মানুষের কণ্ঠকে, তার সুর মাধুর্যকেও ধরে রাখা সম্ভব হয় না। তথাপি কি এক অজ্ঞাত কারণে যে সুর, যে কথা, যে ছন্দ মানুষের হৃদয়ে স্থান পায় সেই সংগীত তা গীতই হোক কি বাদ্যই হোক বা নৃত্যই হোক যুগের পর যুগ অতিক্রম করার পরও বেঁচে থাকে। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল শ্যামা সংগীত, বাউল গান, কীর্তন ইত্যাদি এবং আরও কিছু গান যা মানুষকে আনন্দদানে সমর্থ। সেই সংগীত সর্বার্থ সাধকের কাজ করে এবং ঈশ্বরের উপলব্ধিতে অংশগ্রহণ করে। মহাকালের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনে সহায়তা করে। তাই সংগীতের মূল্য নির্ধারিত হয় এই পথেই। গীত, বাদ্য নৃত্য মানুষকে করে তুলেছে মহীয়ান। দীনতা, নীচতা, হীনতার ঊর্ধ্বে উঠে মানুষ সংগ্রাম করতে চেয়েছে দেবতার সঙ্গে। এইভাবে দেবতাই শুধু প্রিয় হননি, প্রিয়ও দেবতার পর্যায়ে উঠেছেন। এই চেতনার মূল বোধটি সৃষ্টির সৌন্দর্য বোধটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। সত্য ও শিবকে মানুষ পেতে চেয়েছে গড়ে তুলেছে সুন্দর রূপে। তাই সংগীত প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দুদের সুন্দরের জয়গানের সাধনা।

আদি যুগ থেকেই মানুষ দেবতার মূর্তি কল্পনা করে তাঁর আরাধনা করেছে।

এর মধ্যে শিবকে আরাধনা করা বা শক্তিকে আরাধনা করার প্রথা বহুদিন থেকেই প্রচলিত আছে।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে শিবের পূজা প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় রাজা সমাচারদেবের সময়ের মুদ্রাতে নন্দী আর শিবের বাহন বৃষের মূর্তি অঙ্কিত ছিল। কিন্তু সেই সময়ে দেবতাদের উপলক্ষ্য করে সংগীত রচিত হয়েছে এমন শোনা যায়নি। তবে শিবের নামে গান বিশেষ প্রচলিত না হওয়ার কারণ ছিল। কারণটি হল শিব একলা দেবতা বলে কোনও দিনই সর্বসাধারণের স্বীকৃতি পাননি। শক্তি ছাড়া শিবকে বলা হয়েছে শব। কারণ শাস্ত্রমতে কালীকে বলা হয় জাগ্রত। কৃষ্ণ ও রাধার সমন্বয়েই রাধাকৃষ্ণ। সেইজন্য বলা হয়ে থাকে শিবের কোনও ক্ষমতাই থাকে না। যখন তিনি শক্তি ছাড়া হন।

এ. এ. বেক বলেছেন,

"প্রথমে শিবই আবির্ভূত হয়েছেন প্রতিষ্ঠিত দেবতারূপে এবং একাকী শাসন করতেন। কিন্তু আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেল কেমন অন্যায় ভাবে দেবী আবির্ভূতা হয়ে শিবের ক্ষমতা এবং বিশেষ অধিকারগুলি হস্তগত করলেন। শক্তি ছাড়া শিবকে তাই বলা হয়েছে জড় পদার্থ। শিবের পক্ষে তখনই প্রভুত্ব করা সম্ভব যখন তিনি শক্তির সঙ্গে যুক্ত হন।"[৯]

কিন্তু সংগীতের অস্তিত্বের সঙ্গেই শিব জড়িত। অনেকে নাদব্রহ্ম বলতে শিবকেই বুঝিয়ে থাকেন। কাজেই সংগীতের জগতে কালী বা কৃষ্ণ সকলেরই আবির্ভাব শিবের পরে। বর্তমানে আঞ্চলিক সংগীত রূপে এবং ত্যাগরাজার সৃষ্ট সংগীতের মধ্য দিয়ে শিবের মহিমা প্রচারিত হয়। কারণ ত্যাগরাজা বিরচিত দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত কীর্তনম্ অতি সুমধুর ও সুললিত। সেইজন্য এইগুলির সহসা লুপ্ত হয়ে যাওয়ার কোনও কারণ নেই। শক্তি পূজা ঐতিহাসিকদের মতে অষ্টম শতাব্দীতে ছিল তবে প্রচলিত হয় বিশেষ ভাবে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে। তখন শাক্তধর্মই প্রধান ধর্ম। কিন্তু এরই মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত। অষ্টম শতাব্দীতে পালবংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়ে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মই প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধদের দ্বারা প্রদর্শিত ধর্মের সহজ পথটি সাধারণ মানুষকে প্রচণ্ড রূপে আকৃষ্ট করে। এরপর দশম শতাব্দীতে সৃষ্টি হয় চর্যাপদ, সংগীতের প্রাচীনতম রূপ। কারণ জনসাধারণকে প্রভাবিত করার জন্য বাক্‌পটু, ক্ষমতাশালী, প্রভাবশালী ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। সাধারণ মানুষও যাকে অবলম্বন করে এবং নিজেকে তারই আশ্রয়ভুক্ত মনে করে নিরাপদ মনে করে তাকে বলা হয় গুরু।

চর্যাপদের গুরু সম্প্রদায় ছিলেন খুব সম্ভবত হঠযোগী। সূর্য এবং চন্দ্রের যোগকেই হঠযোগ বলা হয়। প্রাণায়ামের দ্বারা বায়ুরোধ করার নাম হঠযোগ, গুরু বিনা এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় না।

গুরুরা আশঙ্কা করলেন তাঁদের মৃত্যুর সঙ্গে এই সহজ সাধনা লুপ্ত হয়ে যাবে। গুরুরা একথাও অনুধাবন করেছিলেন মানুষকে প্রভাবিত করার একমাত্র পথ হল সংগীত এবং তা সহজে মনে রাখবার পথও বটে। তখন সৃষ্টি হল চর্যাগীত। যার রাগ নির্ণয় করা আছে, তালও উল্লিখিত আছে। রচয়িতার নামও আছে। যার ভাষা বোঝা যায় কি যায় না। কিন্তু সাধনার পথে তা ব্যাঘাত ঘটায় না কারণ এ যে সংগীত। পৃথিবীর একমাত্র সহজতম উপায় যা সংসারের লাভ, ক্ষতি, ভয়, ভাবনা মুছে দিতে পারে। তাই চর্যাগীতির ভাষাকে ঐতিহাসিক নাম দিলেন সন্ধ্যা ভাষা অর্থাৎ রহস্যময়। কতকগুলি এই শ্রেণীর গীতি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক পথের। কি করে পার্থিব নানা আসক্তির জাল থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিরাসক্তির পথ অবলম্বন করা যায় তার উপায় নির্দেশিত হয়েছে। বিশেষ কোনও উপায় অবলম্বন না করেও দৈনন্দিন সহজ অবস্থার মধ্যেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। তার জন্য চাই দিব্যদৃষ্টি অর্থাৎ সত্যানুসন্ধানীর দৃষ্টি চাই। এর জন্যই গুরুর প্রয়োজন। একটা চর্যাগীতি অনুধাবন করা যাক। এই গানটি মালসী রাগের উপর লিখিত।

সুইণেঁ হ অবিদারঅ রে নিঅমন তোহোরেঁ দোসে
গুরুবঅণ বিহারেঁ রে থাকিব তুই যুম্ভ কইসে
অকট হুঁ-ভব গঅণা
বঙ্গে জায়া নিলেসি পরে ভাঙ্গেল তোহার বিণাণা।

এর বঙ্গানুবাদ,

স্বপ্নেও অবিদ্যারত ওরে মন, তোর নিজের দোষে।
গুরু বচন বিহারে বিবাগী তুই থাকিবি কি করিয়া।
আশ্চর্য হুঙ্কারোদ্ভূত গগন।
বঙ্গে জায়া লইলি পরে তোর বিজ্ঞান ভাঙ্গিল।
অদ্ভুত ভব-মোহ, ওরে, আপন-পর বোধহয়।
এ জগৎ জলবিম্বাকার, সহজে (থাকিলে) আত্মাহেয় শূন্য।
অমৃত থাকিতে বিষ গিলিস রে পর-বশ-আত্মাচিত্ত।
ঘরে পরে কি তোর বুঝিলে রে আমি খাইব দুষ্ট স্বজনকে।

সরহভনে-বরং শূন্য গোয়াল কি (হইবে) দুষ্ট বলদে।
একলা জগৎ নাশ করিয়া স্বচ্ছন্দে (আমি) বিহার করি ॥[১০]

এই গানে মিল নেই ছন্দেরও স্থান নেই। রসেরও অভাব মনে হয় শুধু কাজের কথাই বলা হয়েছে, গুরু উপদেশ দিয়েছেন। এবং একেই বলা হয় সন্ধ্যাভাষা।

আর একটি গানের বঙ্গানুবাদ দেখলে বোঝা যায়। তিনি নিজেই বলেছেন তাঁর গান বোঝা মুস্কিল। কিন্তু এর মধ্যেই রয়েছে উপদেশ।

টোলায় মোর ঘর, নাই পড়শী,
হাঁড়িতে ভাত নাই, নিত্য প্রেমিক (ভিড় করে)।
বেগে সংসার বহিয়া যায়,
দোয়া দুধ কি বাঁটে ফিরে।
বলদ প্রসব করিল, গাই (রহিল) বন্ধ্যা,
পাত্র (ভরিয়া তাহাকে) দোয়া হয় এ তিন সন্ধ্যা।
যে সেই বুদ্ধি সে ধন্য বুদ্ধি,
যে সেই চোর সেই কোটাল।
নিত্য নিত্য শিয়াল সিংহের মনে মুঝে
চেন্ঢণ পাদের গীত কমলোকে বুঝে।

কিন্তু এর মানে দিয়েছেন মুনি দত্ত। প্রথম দুই লাইনই প্রধান। হাঁড়ির ভাত যদি মানুষের জাগতিক প্রবৃত্তি ক্রিয়াকলাপ হয় তবে তা এখন অনুপস্থিত। তাঁর বাস এমন উচ্চস্থানে যেখানে তিনি একা। সংসার তার আপন মায়াজালে আবদ্ধ। বলদ অর্থে মানুষের অন্তর। সে সর্ব দোষ মুক্ত থাকতে পারে না কাজেই সে জগতের নিয়মে আবদ্ধ এবং নিয়ত কল্পনাধীন। কিন্তু গাভী যার প্রসব করার কথা সে মুক্ত। অর্থাৎ মন এখন নিরাসক্ত। তাই প্রথম লাইনেই বলা হয়েছে সেই সাধকের এখন উচ্চ স্থানে বাস।

অনেক গুরু পথ দেখিয়েছেন,

উজুরে উজু ছোড়ি না জাহুরে বঙ্ক।
নিয়ড়ি হবাহি না জাহুরে লঙ্ক ॥

অর্থাৎ,

ঋজু পথ ছেড়ে বাঁকা পথে যেও না। বোধিও নিকটেই, তুমি দূর স্থান অর্থাৎ লঙ্কায় যেও না।

সরহ তাঁর গানের মধ্য দিয়ে বলেছেন, "শঙ্কাপান সব ছিঁড়িয়া ফেল গুরুর

বচনে ; এই শঙ্কা দূরীভূত হইয়া গেলে আভাস পাওয়া যাইবে সহজের, যাহাকে শ্রবণ কখনও শোনে না, চোখের দ্বারা যাহাকে যায় না দেখা। পবন বহিলে তাহা শব্দায়মান হয় না—তাহা ক্ষয় প্রাপ্তও হয় না। তাহা (একস্থানে) থাকে না, বিস্তৃতও হয় না—কোথাও যায়ও না—সম-রসই হইল সহজানন্দ- আরেকটি গানেও দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[১১]

রাগ শবরী,
তুলা ধুনি ধুনি আঁসুরে আঁসু
আঁসু ধুনি ধুনি নিরবর সেসু
তউ সে হেরুঅ ন পারি অই
শানতি ভণই বিণ স ভাবিঅই
ইত্যাদি
তুলা ধুনিয়া ধুনিয়া আঁশ (থাকে) রে আঁশ,
আঁশ ধুনিয়া ধুনিয়া নিরবয়ব শেষ (থাকে)।
তবু সে হেতুরূপ পাওয়া যায় না,
শান্তি ভনে (যতই) কেন তাহাকে ভাবা
হয়।[১২]

এর ব্যাখ্যা করেছেন শশীভূষণ দাশগুপ্ত। 'তুলা হইল চিত্ত তুলা—তাহাকে বিশ্লেষণ করিয়া করিয়া শেষ করিয়া দেখিলেও তাহার ভিতরে বস্তু নির্মাণের জগৎ প্রতিভাসের হেতুরূপ যাহা তাহা আর বোঝা গেল না। আসলে এই হেতুরূপটি চিত্তের স্বধর্ম নয়, ইহা অবিদ্যাশ্রিত আগন্তুক ধর্ম।...তাই চিত্তকে ধুনিয়া ধুনিয়া তাহাকে দিতে হয় শূন্যে বিলীন করিয়া, চিত্ত শূন্যে বিলীন হইলেই সকল অহং প্রত্যয়ও নিঃশেষে বিলীন হইয়া যায়—শুধু একটা সুসংবেদ্য মহাসুখ—স্বয়ং পতা ব্যতীত তখন আর অন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।"[১৩]আধ্যাত্মিক জগতকে কেন্দ্র করেই যে সংগীত জগৎ বিকশিত হয়েছে তার প্রথম প্রমাণ চর্যাগীতি। এর পরের স্থানই হল বাউলের। বাউল নামে যারা পরিচিত তাদের আবির্ভাবও কিন্তু বৌদ্ধধর্ম থেকে।

আমরা জানি অষ্টম শতাব্দী থেকে অর্থাৎ যখন রাজা গোপালদেব কর্তৃক পালবংশের প্রতিষ্ঠা হয়, সেই সময় বৌদ্ধধর্ম প্রসারলাভ করে এবং হিন্দুধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সমন্বয় ঘটে। তখন অনেকেই বিশেষ করে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা বৌদ্ধ মতাবলম্বী অর্থাৎ সহজিয়া মতের উপাসক ছিল। কিন্তু মুসলমান রাজার

অত্যাচারের ভয়ে সেই সময়ে অনেকে মুসলীম ধর্ম গ্রহণ করে আবার নিজের ধর্মের আচরণবিধি ত্যাগ করতে পারে না, তখন তাদের বলা হয়েছে ফকীর। আবার অন্ত্যজ জাতি যারা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেনি, অথচ বিত্তবান হিন্দুদের দ্বারা অবহেলিত তারাও পরে উদার বৈষ্ণব ধর্মের আওতায় আশ্রয় লাভ করে। তারাও অনেকে বাউল নামে পরিচিত। নামপন্থী যোগী যারা মুসলমান হয়ে গেল তাদের বলা হয়েছে জোলা। কবীর এই শ্রেণীর মুসলমান পরিবারে পালিত হয়েছেন। তুলসীদাস ইত্যাদি অনেকেই নিম্ন শ্রেণীর মানুষ কিন্তু তাঁরাও বাউল ছিলেন। বাউল নামের এই বিশেষত্ব এবং বৈষ্ণব ধর্মেরও এই বিশেষত্ব। ফলে বাউলদের কোনও প্রত্যক্ষ মূর্তি পূজা আমরা দেখি না। কোনও বিশেষ দেবতাকেও তাদের পূজা করতে দেখি না। তারা উদাসীন বৈরাগী। আপনার মধ্যে নিমগ্ন। অন্তরের ধন খুঁজে পাওযার জন্য ব্যগ্র। মানুষের মধ্যে তারা দেবতার সন্ধান করে। গানের মধ্য দিয়েই তারা ঈশ্বরকে পূজা নিবেদন করে। তাদের মন্ত্র হল সংগীত। ফলে সংগীতই তাদের আশ্রয়। তাই বাউল গানের একটি নিজস্ব ভাব এবং ভাষা আছে। চর্যাগীতির মত বাউল গানের মধ্য দিয়েও আধ্যাত্মিক পথের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বাউলদের প্রথমে মন্ত্র সাধনা, অতঃপর প্রকৃতি সাধনা। এব পর তাদের সাধনা নিরাকার, আনন্দময় জগতের। এরা মূলত রসের পূজারী। নিরাকার নয়, সাকার প্রেমের মধ্য দিয়েই এদের সাধনা পূর্ণতা লাভ করে। "বাউলদের কাছে নারী আত্মার হ্লাদিনী শক্তি, মহাশক্তিরূপিণী রসময়ী, প্রেমময়ী।"[১৪]

প্রকৃত পক্ষে হিন্দু মুসলমান দুই জাতিই বৈষ্ণবধর্মের সহজ সরল রূপটির প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই ধর্মের গভীরে প্রবেশ করবার জন্য ব্যগ্র হয়। এই বিষয়ে নিম্নলিখিত বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। "পূর্বের মুসলমান ফকিররা, যাহারা সুফীধর্মের দ্বারা বাহ্যত প্রভাবান্বিত হইয়াছিল, তাহারা সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের দ্বারা প্রকৃতভাবে প্রভাবান্বিত হইল। সুফী ধর্মের সঙ্গে তাহাদের সাধনার মিল ছিল না, কিন্তু সহজিয়া বৈষ্ণবদের সাধনা ও তাহাদের সাধনা এক। তারপর সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের প্রেমধর্ম এবং চৈতন্য চরিতামৃতের প্রভাব তাহাদের উপর খুব বেশি পড়িয়াছিল। তাহাদের রচিত গানগুলির মধ্যে তাহার প্রমাণ বর্তমান। ক্রমে একই মতবাদের এবং একই সাধনপদ্ধতির হিন্দু ও মুসলমানজাতির সাধকেরা তাহাদের সাধনায় কতকগুলি বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করিল। তাহাদের বৈশিষ্ট্য সমন্বিত উভয় জাতির মিলিত সাধনাই বাউল সাধনা।" বাউলরা বেদ পুরাণের ধারার অনুবর্তী নয়। দ্বাদশ শতাব্দীর সিদ্ধ পুরুষরা তাঁদের সাধনাকে চর্যাগীতির মাধ্যমে

প্রকাশ করেছেন। বাউলদের সাধনার মর্মকথাও তাদের গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

"রাগের ভজন যাজন কঠিন
আচার বিষম হয়।
বেদবিধি ছাড়ে কুল পরিহরে
তবে হয় প্রেমোদয়।"

অর্থাৎ পৌরাণিক প্রথা অনুযায়ী প্রেমের উদয় হবে না। কাজেই সাধনার ফল লাভ হবে না। তাই প্রেম প্রীতির মার্গ ধরে অগ্রসর হতে হবে। সংগীত তার প্রধান উপায়। বাউলদের সাধনার প্রধান অঙ্গ হল দেহ। যোগ সাধনা তাদের সাধনার অঙ্গীভূত। বাউল সাধকেরা বিশ্বাস করে সপ্তস্বর্গ, সপ্তপাতাল, সপ্তদীপ, সপ্তসাগর দেহের মধ্যে বিরাজ করে। তার মধ্যে বাস করেন পরম আনন্দময় পুরুষ। তাঁকে খুঁজে পেতে হবে। কাজেই মানুষ এবং দেহতত্ত্বই বাউলদের সংগীতে স্থান পেয়েছে।

তাই লালন ফকীর যিনি বাউলদের মধ্যে অন্যতম তিনি বলেন,

"ক্ষ্যাপা তুই না জেনে তোর আপন খবর
যাবি কোথায়।
আপন ঘর না বুঝে বাইরে খুঁজে
পড়বি ধাঁধায়॥"[১৫]

মনের মানুষকে কেন্দ্র করেও সূক্ষ্ম দেহতত্ত্বের গান রচিত হয়েছে।

"মনের মানুষ অটলের ঘরে খুজে নাও তারে।
নিগমেতে আছে মানুষ, যোগেতে বারাম ফেরে॥"

কবীরও বাউল। কিন্তু তাঁর সাধনা বাউলদের প্রচলিত সাধনা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কবীর যোগ সাধনার দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি করেছিলেন। কিন্তু কবীরের পথ একান্তই ভক্তির পথ। ঈশ্বরে মন প্রাণ সমর্পণ করেছিলেন। কবীরের প্রত্যেকটি গানের মধ্য দিয়ে তার পরিচয় পাওয়া যায়। কবীর নিম্নশ্রেণীর মুসলমান ছিলেন। তিনি ছিলেন নিরাকার ঈশ্বরের পূজারী। তাঁর মতে অন্তরের মধ্যেই ঈশ্বরের সন্ধান পাওয়া যায়।

" মোকোঁ কহাঁ ঢুঢ়ে বন্দে,
হঁম তো তেরে পাসমেঁ,

নামেঁ দেবশ নামেঁ মসজিদ, না কাবে কৈলাসমেঁ ।
না তো কৌন ক্রিয়া কর্ম মেঁ, নঁভী যোগ বৈরাগমেঁ,
খোজী হায় তো তুরতৈ মিলিহৌ পলভরকী
তালাস মেঁ ।
কহেঁ কবীর সুনো ভাই সাধো, সব আখোঁকী শ্বাস
মেঁ ॥[১৬]

সংগীতের মধ্য দিয়ে বাউলদের যে সাধনা, তা মোটামুটি সপ্তদশ শতাব্দীতেই শুরু হয় এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে লালন ফকীর একে জনপ্রিয় করে পরিপূর্ণ রূপদান করেন বিশেষ করে সংগীতের মাধ্যমে। লালনফকীর ছাড়াও আরও অনেক বাউলের গানেই বাংলার সংগীত ভাণ্ডার ধনশালী একথা বললে অত্যুক্তি করা হয় না।

কবীর তাঁর গানে কখনও সন্ধ্যাভাষা কখনো বা রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন কখনো অতি সহজ ভাষায় তাঁর ভক্তদের জন্য সংগীতের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য বলেছেন। কবীরের আধ্যাত্মিক সাধনারও পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর গানের মধ্য দিয়ে। সন্ধ্যা ভাষাও ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর গানে।

"ইস ঘট অন্তর বাগ বাগীচে,
ইসী মেঁ সিরজন হীরা।
ইস ঘট অন্তর সাত সমুন্দর,
ইসী মেঁ নৌ লখতারা।"[১৭]

বাউল রচনা ও চর্যাপদ রচনার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও ভাবগত মিল লক্ষিত হয়। বলা যায় চর্যাপদই ধীরে ধীরে ভাষাকে প্রাঞ্জল করে বাউল গানে প্রবর্তিত করেছে।

শ্রীমনিলাল সেন বলেছেন, "এগার বার শতকে বহু বাঙালী শৈব ধর্মগুরু হয়ে দাক্ষিণাত্যে গিয়েছিলেন। একমাত্র গম্ভীরা গান এবং হরগৌরীর নৃত্য এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজনের নৃত্য, এছাড়া শৈবধর্মের আর কোনও সংগীতের উদাহরণ পাওয়া যায় না।

পাল রাজত্বের প্রথমদিকে চর্যাপদের আদর ছিল অসাধারণ। কিন্তু উদ্দেশ্যমূলক হওয়াতে এই সংগীত যুগের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়ে গেল। কিন্তু অন্যান্য সংগীতের ক্ষেত্র এই সময় বিশেষ উন্নতি লাভ করতে পারেনি বলে একটা সময় এল যখন সংগীতের ক্ষেত্র বলতে বিশেষ কিছুই ছিল না। কিন্তু এর

অব্যবহিত পরে সেন রাজত্বে সংগীতের যথেষ্ট উন্নতি দেখা যায়।

লক্ষ্মণসেনের আমলের অনেক গায়ক গায়িকার আমরা নাম পাই তার মধ্যে প্রধান হলেন জয়দেব এবং তাঁর রচিত গীতগোবিন্দ। যে গীতগোবিন্দের ভাষা, সুর সবই অতুলনীয় সেই গীতগোবিন্দের গানও আজ বহুল প্রচলিত নয়। এর প্রধান কারণই হল গীতগোবিন্দের গান তাৎক্ষণিক মোহের সৃষ্টি করে মনে কিন্তু বৈচিত্র্য নেই বলে আনন্দদানে সক্ষম হয় না। শুধু ধ্বনিসাম্য ও ছন্দের উপর রচিত গীতগোবিন্দের সুর মানুষকে ক্লান্ত করে। তাই এই গান বর্তমানে শুধুমাত্র দক্ষিণ ভারতে একান্তভাবে দেবতার উদ্দেশ্যেই নিবেদিত।"[১৮]

ভারতের অগণিত সংগীতের আকর হল শাক্তধর্ম এবং বৈষ্ণবধর্ম। প্রাচুর্য, বৈচিত্র্য এবং অসামান্য সুর সম্পদের অধিকারী বৈষ্ণব ধর্মের সংগীত, যদিও শাক্তধর্ম বৈষ্ণব ধর্মের চেয়ে অনেক পুরাতন। অনেক সাধকই আবার কালী এবং কৃষ্ণকে একই আসনে বসিয়েছেন এবং উপলব্ধি করেছেন। মূলত শাক্তধর্মের সংগীতগুলি মা কালীকে উদ্দেশ্য করে রচিত। কিন্তু মাতৃপূজার আবির্ভাব বহু যুগ আগে অর্থাৎ আদিম যুগে, নানা রূপে নানা নামে তিনি পূজিতা। বৈদিক যুগে দুর্গা, কালী, সরস্বতী, সবই এক ছিলেন। এরপর বহু দেবী নানা নামে পূজিতা হন।

গৌরী, উমা, সতী, দুর্গা, মঙ্গলা, শিবা, নারায়ণী, কাত্যায়নী, পার্বতী প্রভৃতি নানা নামে নানা সময়ে নানা প্রয়োজনে পূজিতা হন। এই উপলক্ষ্যে নানা সময়ে নানা সংগীত প্রচলিত হয়। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্থান পেয়েছেন কালী মাতৃরূপে। আর একজন গিরিরাজের কন্যা রূপে উমা। সেই সঙ্গে সমগ্র চরাচরের মানুষের কন্যা রূপে তাঁকে আবাহন জানানো হয়েছে।

চীন, জাপান, যবদ্বীপ, ভারতবর্ষে এশিয়ার বহু স্থানে দুর্গা নানা রূপে পূজিতা হয়েছেন।

শ্রী শশীভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় দেখিয়েছেন চর্যাগীতিতে যে দেবীকে নানা নামে তাঁরা বর্ণনা করেছেন, সেই চণ্ডস্বভাব যুক্ত দেবী এক জায়গায় চণ্ডালী নামে বর্ণিতা। তিনিই বর্তমানের চণ্ডী। এছাড়া দেবী পূজিতা হয়েছেন সেই সময়ে মাতঙ্গী, চণ্ডালী, শবরী নামে।[১৯]

বাংলাদেশে দুর্গার বিভিন্ন রূপ বর্ণনার গান প্রচলিত আছে। গিরিরাজের ঘরে উমার আগমন, উমার প্রত্যাবর্তন। উমার বিরহ বেদনা, আনন্দ আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন গানের মধ্য দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। এ গানের শ্রোতা সকলেই, এর জন্য বিশেষ ভক্তের কোনও প্রয়োজন নেই। শরতের নীল

আকাশ এবং ঝকঝকে রৌদ্রের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই আগমনী গানগুলি শ্রোতার মনে অজানা আনন্দের ঢেউ তোলে। তখন শ্রীদুর্গা হয় বাঙালী ঘরের পরমাত্মীয়া।

যেমন,

রাণী দেও গো জয়ধ্বনি।
তোমার উমা লইয়া আসিল নন্দিনী ॥

উমা কোলেতে আনি, বসাইলে রাণী,
আস আমার চাঁদবদনী জুড়াও গো প্রাণী ॥

এরপর শিবের বর্ণনা,

জামাই কি আপন নিশির স্বপন,
উমা ধনকে না দেখিলে ত্যাজিবে জীবন।
এক পাগলের সুর শুনিতে অদ্ভুত,
শ্মশানে মশানে ফিরে খায় ভাঙের গুড়া ॥

একেবারে উমা যখন শিশু তখনই তাকে নিয়ে গান বাঁধা হয়েছে মেনকা আদরে অনুযোগে বলেছেন,

গিরিবর, আর আমি পারি নেহে,
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে
স্তন্য পান
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে ॥
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী
বলে উমা ধরে দে উহারে।

আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কিরে
ধরা যায়,
ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে ॥

এই গানের মধ্য দিয়ে বাংলা গানের অনির্বচনীয় সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। পরবর্তী কালে উমা যে শিবকে কামনা করে তপস্যা করেছিলেন এই গানে তারই পূর্ব

লক্ষণ দেখা যায়। উমা সবসময় আয়াস সাধ্য জিনিস চাইছেন। আশ্চর্যের কথা শাক্তধর্মের দেবীর আবির্ভাব সর্বাপেক্ষা পুরাতন, বৈষ্ণব ধর্ম তার অনেক পরের কথা। তথাপি শাক্ত পদাবলীর উপর অনেকে বলেন বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব পড়েছে কারণ সংগীতের দিক থেকে বৈষ্ণবধর্ম অধিকতর সম্পদশালী।

শাক্তধর্মের পূজারী রামপ্রসাদ বলেছেন,

কালী হলি মা রাসবিহারী,
নটবর বেশে বৃন্দাবনে
ছিল বিবসন কটি, এ যে পীত ধটি,
এলোচুল চূড়া বংশীধারী ॥

আগে শোণিত সাগরে নেচেছিলে শ্যামা
এসে প্রিয় তব যমুনা বারি।
প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে, বুঝেছি
জননী মনে বিচারি।
মহাকাল কানু, শ্যামা শ্যাম তনু, একই সকল,
বুঝিতে নারি ॥

রঘুনাথ দেওয়ান লিখেছেন,

'তুমি রাধা, তুমি কৃষ্ণ,মহামায়া, মহাবিষ্ণু
তুমি গো মা রাম রূপিণী তুমি আসিতে ॥'

অনেক কবি রাধাকে এবং দুর্গাকে একরূপে দেখেছেন,

যেমন গোবিন্দ চৌধুরী বলেছেন,

'আজি যেমন গোবিন্দের কাছে
দুর্গারূপে এসেছে,
কাল দেখবে রাধা রূপে
শ্যামের বামে বসেছে।'

শুধু রামপ্রসাদ নয়, সাধক কমলাকান্ত, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং মহাপ্রভু চৈতন্যদেব কালীর মধ্য দিয়ে কৃষ্ণকে এবং কৃষ্ণের মধ্য দিয়ে কালীকে প্রত্যক্ষ

করেছেন। আয়ান ঘোষ কালীর উপাসক ছিলেন বলেই রাধার অন্বেষণে গিয়ে কৃষ্ণকে কালীরূপে দেখেছেন। তাই রামপ্রসাদ বলেছেন,

"কাল বরণ ব্রজের জীবন, ব্রজাঙ্গনার মন
উদাসী।
হলেন বনমালী কৃষ্ণ-কালী, বাঁশি
ত্যজে করে অসি ॥"

গোবিন্দ অধিকারীর রচনায় আছে,

"শুক বলে, আমার কৃষ্ণ মদনমোহন।
সারী বলে, আমার রাধা বামে যতক্ষণ,
নৈলে শুধুই মদন।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল।
সারী বলে, আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল,
নৈলে পারবে কেন ?"

আরও বিভিন্ন গানের মধ্য দিয়েই তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই গানগুলি অধ্যাত্ম ভাব প্রেরণায় লিখিত এবং আধ্যাত্মিক পরিবেশ রচনার সহায়ক। এই গানগুলি বিশেষ ভাবের মধ্য দিয়ে পরিবেশিত হয় এবং যথার্থরূপে গায়নের দ্বারাই মানুষেব মনে ভক্তিভাব জাগবণে সমর্থ হয়। বাংলার সংগীত বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত বাৎসল্য রসের উপর। বাঙালীর কন্যা হলেন উমা এবং বাঙালী চিত্তের আদরের দুলাল হলেন কৃষ্ণ। বাৎসল্য রসের উপর যে সংগীতগুলি, সেগুলি কিন্তু সর্বদাই আধ্যাত্মিক ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এগুলি বিশুদ্ধ নন্দনতাত্ত্বিক রসের উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত। এই গানগুলির মধ্য দিয়েই বাঙালীর মন, বাঙালীর সংসারের বিশেষ পরিবেশ সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে উমার রূপটি ফুটে উঠেছে। আধ্যাত্মিক চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু নিছক ধর্ম ভাবনাকে অতিক্রম করে এই গানগুলির বসসৃষ্টির ক্ষমতা অন্য জায়গায়। এই গানগুলির আবেদন মানুষের স্বাভাবিক সৌন্দর্য পিয়াসী রসপিপাসু মনের নিকট। তাই দেখি আধ্যাত্মিক চেতনার'পরে প্রতিষ্ঠিত বাঙালীর সংগীত কিন্তু শুধু মাত্র সেই চিন্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, আরও কিছু যার আর এক নাম আনন্দ।

শাক্তসংগীতকে শশীভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় দুই ভাগে ভাগ করেছেন। লীলা সংগীত এবং সাধন সংগীত। লীলা সংগীতের পর্যায়ে পড়ে উমার বাল্যলীলা,

উমার সঙ্গে শিবের কথোপকথন ইত্যাদি। যে গানগুলি বাঙালীর ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু মাধুর্যময়।

লীলা সংগীতগুলির মধ্যে বহু কাহিনী ছড়িয়ে আছে। এগুলির মধ্যে অনেকগুলি অলৌকিক কাহিনীর উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু গাওয়ার গুনে এবং রচনার গুনে এই গানগুলি সত্য হয়ে দাঁড়ায়। অধিকাংশ আগমনী এবং বিজয়া সংগীতগুলি গড়ে উঠেছে উমার মা মেনকা রাণীর উক্তির মধ্য দিয়ে। কখনো আনন্দের উক্তি, কখনো খেদোক্তি কখনও জামাইয়ের উপর বীতস্পৃহ কিন্তু প্রত্যেকটি গানের মধ্য দিয়েই তৎকালীন সমাজের রূপ ফুটে উঠেছে। ফুটে উঠেছে বাঙালী মেয়ের শ্বশুর গৃহের ভিন্ন মানসিকতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রবণতা, যা একান্তভাবে বাঙালী মেয়ের নিজস্ব।

একটি গানের মধ্য দিয়ে মেনকা বলছেন,

'গিরি গৌরী আমার এল কৈ ?
ঐ যে সবাই এসে, দাঁড়িয়েছে হেসে
(শুধু) সুধামুখী আমার প্রাণের উমা নেই।
সুনীল আকাশে ঐ শশী দেখি,
কৈ গিরি কৈ আমার শশি মুখী ?
শেফালিকা এল উমার বর্ণ মাখি,
বল বল, আমার কোথা বর্ণময়ী ?
ঐ এল হেসে শান্ত শতদল,
শতদলবাসিনী কোথায় আমার বল ?

উমার সঙ্গে শরতের শিউলির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। তাই নীল আকাশও আমবা দেখি, শিউলিও এসেছে, পদ্ম ফুটে আছে শুধু উমার এখনও আসার সময় হয়নি। তাই মেনকার ব্যস্ততাকে কেন্দ্র করে এই আগমনী গান। এর মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা কোথায় ? এই গান বাঙালীর প্রাণের গান। একান্ত নিজস্ব সম্পদ।

আগমনীর আনন্দের সঙ্গেই আছে বিজয়ার বিচ্ছেদ বেদনা। সেও মেনকারই বক্তব্য,

"যেও না, যেও না, নবমী রজনী,
সন্তাপ হারিণী ল'য়ে তারা দলে।
গেলে তুমি দয়াময়ী, উমা আমার যাবে চলে।

তুমি হলে অবসান, যাবে মেনকার প্রাণ,
প্রভাত শিশিরে আমায় ভাসাবে নয়ন জলে।

এইগুলি সবই লীলা সংগীতের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু এইগুলিই জনপ্রিয় বেশি কারণ এইগুলি শ্রোতার হৃদয় অধিকার করে তাড়াতাড়ি, বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাপার কিছু নয়।

রামপ্রসাদ তাঁর সাধন সংগীতে কালীকে তাঁর স্বরূপে দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

"হৃৎ-কমল মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা।
মন পবনে দুলাইছে দিবস রজনী ওমা ॥
ইড়া পিঙ্গলা নামা সুষুম্না মনোরমা,
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্ম সনাতনী ওমা ॥"

কবীরও তাঁর দেবতাকে একই রূপে দেখেছেন,

"ইংগলা পিংগলা তানা ভরণী
সুষুম্না তারসে **বিণি চদরিয়া** ॥
আঠ কঁবল দল চরখা ডোলৈ
পাঁচ তত্ত্ব গুণ তিনি চদরিয়া ॥"

রামপ্রসাদ তাঁর সাধন সংগীতের মধ্য দিয়ে শ্যামা যে পরমব্রহ্মেরই অংশ তা ব্যক্ত করেছেন।

"প্রসাদ বলে, ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি।
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে,
ধর্ম কর্ম সব ছেড়েছি ॥"

আর একটি গানে,

"ব্রহ্ম হতে পরমাণু, সকলি তোমার তণু,
মাগো অন্য বস্তু ত্রিভুবনে তুমি বিনে আছ কৈ ॥

ফিকির চাঁদ উপলব্ধি করেছেন কালীর অন্য রূপ,

"বিশ্ব তবোদরে, তুমি বিশ্বোদরী.
পালন করি বিশ্ব, নাম বিশ্বম্ভরী,
অসীম অম্বরে সম্বরিতে নারে,
তাইতে নাম ধরেছ ব্রহ্মময়ী দিগম্বরী ॥"

দিলীপ রায় সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন,

"মন তুমি কৃষি কাজ জানো না
এমন মানব জমি রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা ।"

তখন মানব জীবনের কত রঙীন কামনার অপূর্ণতা, গোপন আশাভঙ্গের বেদনা বা নিহিত আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতাই না আমাদের হৃদয়কে বিষদাশ্রুতে প্লাবিত করে দিয়ে যায় ।"

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, 'একটি অখণ্ড সোমধারা শুধু ব্যক্তিজীবন নহে, সমগ্র বিশ্ব জীবনের মধ্যে চিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে, এই সোমধাবা বা অমৃতধারা হইল দিব্যজ্যোতি ও দিব্য আনন্দের ধারা ।'[২০] এই আনন্দকে যে ক্ষণিকের জন্যও উপলব্ধি করতে পারবে বিশ্বজগতের সঙ্গে তখনই সে একাত্মতা অনুভব করবে । শিল্প হল আনন্দের সাধনা । সংগীত শ্রবণে পশুও বশ হয় । এই আনন্দদানের ক্ষমতা সর্বাপেক্ষা বেশি হল সংগীতের । তাই সংগীত সাধনা ঈশ্বর সাধনার সমতুল । সাধনায় সিদ্ধিলাভ তখনই হয় সমস্ত চিন্তাকে অতিক্রম করে সেই সাধনা যখন মনের সঙ্গে প্রাণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কেবলমাত্র একটি পথের দিকেই আত্মাকে এগিয়ে নিয়ে যায়,আনন্দের উপলব্ধিও তখনই ।

আমাদের দেশে ধর্মচেতনা এত প্রবল যে মানুষের জাতীয় চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য যে সংগীত রচিত হয়েছে তাও ধর্ম চেতনার উপর ভিত্তি করে ।

যেমন চারণ কবি মুকুন্দদাস লিখেছেন,

"জাগো গো, জাগো জননি ।
তুই না জাগিলে শ্যামা
কেহ জাগিবে না মা,
তুই না নাচালে কারো
নাচিবে না ধমনী ।
ডেকে ডেকে হলেম সারা
কেউ তো সাড়া দিল না মা,
খুঁজে দেখলেম কত প্রাণ
কারো প্রাণ কাঁদে না মা ।"

কিন্তু এই সংগীত সৃষ্টির পিছনে উদ্দেশ্য ছিল তাই নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় এই গানগুলি সফলতার চরমে তেমন ভাবে উত্তীর্ণ

হয়নি। একটি বিশেষ সময়ের জন্য এই গানগুলি রচিত হয়েছে। শুধুমাত্র সেই সময়েই এই সংগীতের আবেদন মানুষের মনে ক্রিয়া করে।

ভারতবর্ষের মেরুদণ্ডই হল শক্তি সাধনা। সমগ্র হিমাচল প্রদেশ, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, বঙ্গদেশ, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ সর্বত্র মহাকালী বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন নামে পূজিতা। সেই পরিচয় পাওয়া যায় আঞ্চলিক সংগীতে এবং সাহিত্যে।

শাক্তধর্ম প্রচারে উল্লেখযোগ্য স্থান হল প্রথমে রামপ্রসাদের এবং দ্বিতীয়ে কমলাকান্তের। যদি কোনও ধর্মপ্রচারকের উদ্দেশ্য হয় সেই ধর্মকে জনপ্রিয় করে তোলা এবং মানুষের হৃদয়ে তার স্থান করে দেওয়া তবে তাঁর সেই উদ্দেশ্য কখনোই সফল হবে না যদি না তিনি সংগীতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। অপর পক্ষে দেখা গেছে, যে ভক্ত সংগীতের মাধ্যমে তাঁর উপাস্যকে মনের ভক্তি বা আকুতি জানিয়েছেন তাঁর ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে না হলেও সেই ধর্ম মানুষের হৃদয়ে তার অজান্তেই স্থান করে নিয়েছে। এরই প্রকৃত উদাহরণ হলেন রামপ্রসাদ এবং কমলাকান্ত। এঁরা দেখিয়েছেন কালীর নানা রূপ। কখনও তিনি দেবী, কখনও কন্যা, কখনও বা সাক্ষাৎ রক্ষাকর্ত্রী। এঁরা যখন যে রূপে কালীকে দর্শন করেছেন এবং তাঁকে উপলব্ধি করেছেন তা প্রত্যেক মানুষই উপলব্ধি করতে পারবেন তাঁদের সংগীতের মাধ্যমে।

কালীর রূপে তাঁরা দেখেছেন জগৎ আলো। এ কি করে যে সম্ভব তার ব্যাখ্যা করেছেন যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

" ইহা যে কেমন করিয়া হয়, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। ইহা মাত্র অনুভূতি গম্য। সে এক হইয়াছিল-ব্রজের গোপীগণের। তাঁহারা 'কালোরূপে জগৎ আলো' দেখিয়াছিলেন। সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটে **না**। **তেমন** হইতে পারিলে, ভক্তি মার্গের ততটা উচ্চে উঠিতে পারিলে, প্রেমসিন্ধুর **ততখানি অতলে** ডুবিতে পারিলে তবে হয়। প্রাণ যাহাকে চায়; তাহাকে লইয়া প্রাণের **সবটুকু** তাহাকেই বিলাইয়া দিতে পারিলে, তাহাতেই তন্ময় হইতে পারিলে, তাহারই সৌন্দর্যে নিজের প্রাণ মন জীবন যৌবন সর্বস্ব ঢালিয়া দিতে পারিলে, তখন সেই সৌন্দর্যে সব সুন্দর হইয়া যায়—সেইরূপে সবই আলোময় হয়।"[২১]

এখানেও দেখি সাধনার মূল কথাই হল প্রেম। প্রেমমার্গকে অনুসরণ করেই কমলাকান্ত এবং রামপ্রসাদ কালো রূপে জগৎ আলো দেখেছিলেন। কমলাকান্ত কালীর উপাসক হলেও শিবকে, কৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করেও মা দুর্গার আগমনী ও বিজয়া উপলক্ষ্যে গান রচনা করেছিলেন।

কাজেই যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের মতে রামপ্রসাদ এবং কমলাকান্তের পদাবলী শিবসংগীত, সমর সংগীত, শ্যামা সংগীত, কৃষ্ণ সংগীত, আগমনী ও বিজয়া এই ছয়টি বিভাগে বিভক্ত।

কালী মূর্তিকেই ধরা হয় নিত্য রূপে। যখন সৃষ্টির চিহ্নও ছিল না, তখনই কালী আবির্ভূত হয়েছেন মহাকাল রূপে। তাই রামপ্রসাদের জিজ্ঞাসা হল,

'সংসার ছিল না যখন মুণ্ডমালা
কোথায় পেলি ?'

তাঁর এ জিজ্ঞাসাও গানেরই মাধ্যমে।

কমলাকান্ত, কালীকে সর্বলোকে উপলব্ধি করেছেন। যেমন,

স্থলে অনলে শূন্যে আছে,
মা মোর সলিলে সমীরে।
ব্রহ্মাণ্ড রূপিণী শ্যামা, মারে জান নারে।
ঘটে আছে পটে আছে,
মা মোর সকল শরীরে।
কামিনীর কটাক্ষে আছে,
তেঁই জগতের মন হরে।

বিভিন্ন পর্যায়ে কমলাকান্তের গান রচিত হলেও বিশেষভাবে শ্যামাসংগীত গুলিই তাঁর এখনও প্রচলিত আছে। তবে মুখে মুখে প্রচলিত হতে থাকায় সুরের কিছু পরিবর্তন এক্ষেত্রে হয়ে যায়। তবে কি কমলাকান্ত কি রামপ্রসাদ দুই রচয়িতার ক্ষেত্রেই দেখি তাঁদের শ্যামা মাকে উপলক্ষ্য করে যে গানগুলি তাঁরা রচনা করেছেন সেইসব গানগুলির মধ্য দিয়েই তাঁদের প্রাণের সুরটি ধ্বনিত হয়েছে বেশি। তাই সংগীতের ক্ষেত্রেও যা বাঙালীর মেরুদণ্ড, শাক্ত এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একই কথা।

তাই,

'মানুষে মানুষে ভালবাসা, ছোটবড় ভেদে, আভিজাত্য ভেদে, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ভেদে সকল মানুষকে এক সূত্রে বাঁধিয়া দিয়াছিল। একটা সরল, মুক্ত উদারতা, সুন্দর পবিত্র জীবনের সৃষ্টি করিয়াছিল, ধনীর বিশাল ভবন হইতে দীনদরিদ্রের ক্ষুদ্র কুটিরে পর্যন্ত। শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধনার যুগ হইতে বাঙালী বর্তমানেও তাহার মধ্য হইতে পাইয়াছে মহামিলনের বাণী।'[২২]

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কমলাকান্তের অনুসরণে রচনা করেছিলেন,

'উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে ।
আমরা নৃত্য করি সঙ্গে ।
দশদিক আঁধার করে মাতিল
দিক্ বসনা,
জ্বলে বহ্নিশিখা রাঙা বসনা,
দেখে মরিবারে যাইছে পতঙ্গে ।" ইত্যাদি ।

কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর এই গানটি মোটেই প্রচলিত নয়, অর্থাৎ এই গানটি শ্রোতার হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করেনি । প্রাণের থেকে সৃষ্টি হয়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে আপন অধিকারে যে গান শ্রোতার হৃদয়ে স্থান লাভ করে না সেই গান চিরস্থায়ী হয় না কখনও । গানের সংখ্যা কমলাকান্তের অপেক্ষা রামপ্রসাদেরই বেশি । সুর লালিত্যেও রামপ্রসাদ প্রথম এবং কমলাকান্ত দ্বিতীয় । কমলাকান্ত রামপ্রসাদের পরবর্তী বলেই হয়ত কমলাকান্তের গানে রামপ্রসাদের প্রভাব পড়েছে । তথাপি কমলাকান্তের গানের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তাতে ক্ষুণ্ণ হয়নি । তুলনামূলক ভাবে শৈবধর্মের চেয়ে শাক্তধর্ম এবং বৈষ্ণবধর্ম যে এত প্রচলিত এর মূলেই আছে সংগীত । রামপ্রসাদ এবং কমলাকান্ত শিবকে উদ্দেশ্য করে সংগীত রচনা করেছেন কিন্তু সেই গান জনসমাজে বিশেষ প্রচলিত নয় । এর কারণই হল, রামপ্রসাদ এবং কমলাকান্ত উভয়ের রচনার ক্ষেত্রেই ভাব এবং স্বচ্ছ চেতনার বলিষ্ঠতা এবং শ্যামার সঙ্গে একাত্মতা বোধ যা শিবের সঙ্গে হয়ে ওঠেনি । শিবকে প্রয়োজন হয়েছে তাঁদের শ্যামার জন্যই ।

যেমন,

অপার সংসার নাহি পারাপার ।
ভরসা শ্রীপদ, সঙ্গের সম্পদ, বিপদে তারিণী,
কর গো নিস্তার ॥

এই গানের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে রামপ্রসাদের সত্যোপলব্ধি । আবার আরেক ক্ষেত্রে নিতান্তই মনের কথা ব্যক্ত হয়েছে ।

'আমায় দেও মা তবিলদারী ।
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী ।'

ভাব ও ভক্তি থাকলে তবে রামপ্রসাদকে গ্রহণ করা যাবে তা নয়, রামপ্রসাদের গান পাঠ করলে এবং যথার্থরূপে গীত হলে তা শ্রবণ করলে মনে ভাব ও ভক্তি আপনিই আসে । এইখানেই তাঁর সংগীতের সার্থকতা। তাই যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বলেন, "রামপ্রসাদের গীতাবলী বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর অন্তরের জিনিস। মাতৃমন্ত্রের উপাসক শক্তি সাধক রামপ্রসাদ তাঁহার সংগীতের দ্বারা একদিকে যেমন মধুর মাতৃভাব সাধনা প্রচার করিয়াছেন, ধর্ম সমন্বয়ের এক মহান আভাষ দিয়াছেন।"

আবার,

"রামপ্রসাদ তাঁহার সংগীতের দ্বারা বাংলাদেশকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সংগীতে তাঁহার সাধনার ভাব ছিল অসাম্প্রদায়িক ; কালী কৃষ্ণ শব্দে একই ব্রহ্মের বিচিত্র প্রকাশ রামপ্রসাদ তাঁহার সংগীতে ব্যক্ত করিয়াছেন।"[২৩]

শাক্ত পদাবলী অনেকেই রচনা করেছেন তাঁদের ভাষাও অধিকাংশ স্থলে সুন্দর এবং কাব্যিক। তথাপি আমরা দেখি এক রামপ্রসাদ এবং কমলাকান্তই শাক্ত পদাবলী রচনার ক্ষেত্রে অমর হয়ে আছেন। একথা সত্য যে রামপ্রসাদ এবং কমলাকান্ত শুধুমাত্র যদি কালীভক্তই হতেন সংগীতবিদ না হতেন তা হলে এত যুগ পরেও মানুষ কখনোই তাঁদের মনে রাখতে সক্ষম হত না। কালীমির্জা যে শ্যামাসংগীত রচনা করেছেন সেগুলিও সুরে, তালে ভাষায় অতুলনীয়। তাই দেড়শত বৎসরের পুরাতন সংগীত এখনও প্রচলিত।

কালীমির্জার একটি বিখ্যাত গান,

রাগভোঁয়রো—তাল মধ্যমান।
উঠ হিমগিরিবর নন্দিনী, মা সুরাসুর
নরবর বরবন্দিনী।
কৃপাদৃষ্টি কর, নিদ্রা পরিহরি
অভয় বরদে ভয় ভঞ্জিনি ॥[২৪]

কালীমির্জার গান এখনও প্রচলিত আছে এর কারণ তিনি শ্যামাকে অবলম্বন করে সংগীত রচনা করেছেন কিন্তু শ্যামা নামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি। তিনি এরই মাধ্যমে ঠুংরী ভজন ইত্যাদি বিভিন্ন রাগকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলেছেন। তিনি নিজে সুর সঞ্চালনে অসামান্য পারদর্শী ছিলেন। শ্যামা ব্যতীত তিনি রাধা কৃষ্ণকে কেন্দ্র করেও সংগীত রচনা করেছেন।

ভৈরবী, মধ্যমান।
ওগো রাধে কি অপরাধে
শ্যামেরে হয়েছ বাম, একি সাধে সাধে।

হেন যে গোরক্ষনাথ, হয়েছে গোরক্ষ নাথ,
শিঙ্গায় ও লোকনাথ তোমায় আরাধে।
ওগো প্রিয়ে কথা মান, কর আরমান,
প্রিয়জন ম্রিয়মান হইয়ে সাধে।
বিভূতিভূষণ কায় কথা কহিব কায়,
কালি হয়ে নীল কায় তব বিষাদে।

গানের ভাষা দ্ব্যর্থবোধক সেইজন্যই অপরূপ। কালীমির্জার রাধাকৃষ্ণের গানগুলি রাধার জবানীতে লেখা হয়েছে। সেইজন্য এই গানগুলি অধিকতর মর্মস্পর্শী। প্রণয়বিষয়ক গানগুলি মনে বিশেষ রেখাপাত করে না। দোষ কবির নয়, সেই সময় এই ধরনের প্রণয়সংগীত প্রচলিত ছিল যা রাধা কৃষ্ণের ছায়াকে অতিক্রম করে উঠতে পারত না।

আমরা দেখি সংগীত জগৎ আধ্যাত্মিক জগৎকে কেন্দ্র করে বিকশিত হলেও সেই জগৎকে আশ্রয় করে স্তব্ধ হয়ে থাকেনি। তা যদি থাকত তবে সেই সংগীত হত সীমাবদ্ধ এবং সেই সীমাবদ্ধ সংগীতের আয়ুও বেশিদিন নয়। যেমন পাশ্চাত্যের চার্চ সংগীত, তেমনই ভারতবর্ষের নাম গান, পর্বাদি উপলক্ষ্যে গান। চর্যাগীতিরও একই উপলক্ষ্য তথাপি কোনও কোনও ক্ষেত্রে আমরা দেখি চর্যাগীতির ভাষা দুর্বোধ্য, ছন্দের অভাবও লক্ষিত হয় কোনও কোনও ক্ষেত্রে, অর্থও স্বচ্ছন্দ নয়, তবুও সেই গানকে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শ্রোতারা উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেন উল্লিখিত রাগ দেখে তার রূপের সঙ্গে গানের ভাব মিলিয়ে। গুরু প্রদর্শিত পথ তাঁরা নাই বা খুঁজে পেলেন, কিন্তু গানের মধ্যে প্রবেশ করলে তখনকার সমাজজীবন, মানুষের প্রকৃতি সব কিছুরই একটি পরিচয় সর্বোপরি একটি যুগের পরিচয় পাওয়া যায় তারই মূল্য অনেক।

যেমন সরহের একটি গীতি,

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সরবী বাঁশী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহ্নি সরবী গীবত গুঞ্জরী মালী॥
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী
গুছাড়া তোহোরি।
পিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী॥
উমত সবরো গরুআ রোযে।
গিরিবর সিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো
লোড়িব কইসে॥

শবরীর সাজের অপরূপ বর্ণনা, ময়ূরপুচ্ছ এবং গুঞ্জার মালা তার অলংকার ইত্যাদি অর্থাৎ শবর শবরীর জীবনযাত্রার বর্ণনা। চর্যাগীতির মিল ছন্দ এবং অর্থ মিলিয়ে অপরূপ।

কাহ্নের চর্যায় তৎকালীন বিবাহের পরিচয় পাওয়া যায় যেমন,

ভবনির্বাণে পড়হ মাদলা।
মনপবন বেণি করণ্ডকশালা ॥
জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিতাঁ।
কাহ্ন ডোম্বী বিবাহে চলিআ ॥[২০]

মাদল, দুন্দুভি, করণ্ডকশালা ইত্যাদি বাদ্যসহযোগে কাহ্ন বিবাহ করতে যাচ্ছেন। এই গীতিরচনার নমুনাটি বর্তমান কালের সংগীত রচনার অনুরূপ।

আর একটি চর্যাগীতিতে দাবাখেলার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু চর্যাগীতির বৈশিষ্ট্যই হল এটি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত। প্রত্যেকটি গানের শেষেই রহস্যময় দুটি তিনটি লাইন আছে যার সাধারণ অর্থ হয় না। এই বিশেষ উদ্দেশ্য থাকার দরুনই এইগানগুলি ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাওয়ার মুখে, শুধু খাতায় কলমে তার অস্তিত্ব, যুগযুগ ধরে মানুষের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হল না। চর্যাগীতিতে অনেক শব্দ আছে সেগুলি বর্তমানে প্রবাদ বাক্যরূপে চিহ্নিত। বিশেষ উদ্দেশ্য থাকার জন্য এর রসের স্থান ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কিন্তু এরই পাশাপাশি বাউল গান কিন্তু যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।

চর্যাগীতির মধ্য দিয়ে অনেক তত্ত্ব এবং তথ্য আমরা পাই। সেইজন্যই এই গানগুলির এত মূল্য আমাদের কাছে। কিন্তু আমরা যখন গায়ক বা শ্রোতার ভূমিকায় থাকি তখন এই গানগুলির কোনও আবেদন আমাদের কাছে থাকে না। চর্যাগীতির মধ্য দিয়ে সাধনার পথ দেখান হয়েছে, বাউল সংগীতেরও একই উদ্দেশ্য। কিন্তু চর্যাগীতি স্থায়ী হল না, অথচ বাউল গান জন্মলগ্ন হতেই জনপ্রিয়, আজও যা বহুল পরিমাণে প্রচলিত। দুইয়েরেই একই উদ্দেশ্য। পার্থক্য তাহলে কোথায় ? বাউল গানেরও একই সুর, যেকোনও বাউল গানই নিজেকে চিহ্নিত করতে পারে বাউল সংগীত রূপে, সুরে মাধুর্য আছে অথচ বৈচিত্র্য বিশেষ নেই তথাপি বাউল গান জনপ্রিয়। অধিকাংশ শ্রোতাই বাউল গান শুনতে ভালবাসেন কিন্তু তার মর্ম বোঝেন না। কিন্তু শুনতে ভাল লাগে। এখানেই নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্যতত্ত্বের সার্থকতা। কোনও উদ্দেশ্য নেই শুধু ভাল লাগার জন্যই ভাল লাগা, এই হল সংগীতের আসল রূপ। এরপর আসে পদাবলী

প্রসঙ্গ। পদাবলীর ভাষা কখনোই আঞ্চলিক ভাষা নয়। পদাবলী নামটির প্রচলন করেন জয়দেব। পদাবলী সংগীতের ভাষা অলংকারবহুল। ছন্দ, মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত ও মিশ্র। পদাবলী সংগীতের এত জনপ্রিয়তার কারণ কি ? বলা যায়,

"সুগভীর রসানুভূতি, সুনিবিড় ভাবসম্ভূতি, অকৃত্রিম আকুতি, এবং প্রকাশভঙ্গির স্বচ্ছন্দ স্ফূর্তি বৈষ্ণব কবি গোষ্ঠীর সহজাত সম্পদ।"[২৬]

বৈষ্ণব কবিদের কথা প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন "আত্মগত সাধনায় এবং ধ্যানতন্ময়তায় তাঁহারা জগৎ এবং জীবনকে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। তাই একের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা অনেকের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষায় রূপান্তরিত হইয়াছিল। ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির সমন্বয় ঘটিয়াছিল। তাই বৈষ্ণব কবিতায় লৌকিক অলৌকিকের সীমারেখা মুছিয়া গিয়াছে। তাই ব্যক্তির বেদনা জাতির চিরন্তন আস্বাদনের বস্তু হইয়া আছে।"

"পদাবলীর 'পদ' একটি বিহঙ্গম, ভাব তাহার দেহ, রস তাহার প্রাণ আর কথা ও সুর তাহার দুইটি পাখা। কীর্তনীয়ার গানে শ্রোতার মন এবং প্রাণ এই পাখায় ভর করিয়া বিহঙ্গের সঙ্গে আনন্দের শাশ্বত কল্পলোকে উধাও হইয়া যায়।" অর্থাৎ পদাবলী সংগীতের উদ্দেশ্যই হল শ্রোতাকে আনন্দ দান করা। পদাবলী কীর্তনের অন্যতমা নায়িকা রাধা, শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসার মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন নিজেকে বিলুপ্ত করে দিয়ে কীভাবে ভালবাসতে হয় এবং এই ভালবাসার মধ্য দিয়েই আনন্দ জন্ম নেয়। সেই আনন্দই অমৃত। এ শুধু কীর্তন গায়ক এবং শ্রোতার অভিজ্ঞতার কথা নয়, প্রকৃতপক্ষেই পদাবলী কীর্তন এই আনন্দের জন্মদাতা। এই সত্য প্রথম উপলব্ধি করেন শ্রীচৈতন্যদেব।

যেমন একটি গান,

"কি মোহন নন্দকিশোর
হেরইতে রূপ মদন মন ভোর ॥
অঙ্গহি অঙ্গ তরঙ্গ বিথার।
জলদপটান বরিখত রসধার।
মুখে হাসি মিশা বাঁশি বায়।
অমিয়া বমিয়া বিধু জগৎ মাতায় ॥
গলে গজমোতিমমাল।
করি বরকর কিয়ে বাহু বিশাল ॥
কুলবতি পরশ না পাই।
অনুখন চঞ্চল থির নহ তাই ॥

শুনিতে বচন সুধাখানি।
জ্ঞানদাস আশ করত সেই বাণী ॥"

অর্থাৎ কি মনোমুগ্ধকারী নন্দকিশোর। রূপ দেখিয়া মদনেরও মন মোহিৎ হয়। অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্যের তরঙ্গ বিস্তার যেন মেঘমালা রসধারা বর্ষণ করিতেছে। হাসি মিশানো মধুর বাঁশী বাজাইতেছে। চাঁদ অমৃত বমন করিয়া জগৎ মাতাইতেছে। গলে গজমোতির মালা। হস্তীর শুণ্ড সদৃশ কি বিশাল বাহু। কুলবতীগণের স্পর্শ না পাইয়া স্থির হয় না। তাই অনুক্ষণ চঞ্চল। বচন শুনিতে যেন সুধাখণ্ড। জ্ঞানদাস সেই বাণী শুনিবার আশা করেন।[২৭]

এই রকম প্রত্যেকটি কীর্তনই কাব্যসম্পদে অতুলনীয়। যথার্থ সুরে যখন পরিবেশিত হয় তখন তা সকলেরই অন্তরকে রসসিক্ত করে। মানুষের অন্তরে যে চিরন্তন রসের স্রোত বইছে, সেই স্রোতেরই একধারা হল কীর্তনের সুর। অতি সহজেই মনের সঙ্গে এক হয়ে যায়। কথা যাই হোক না কেন সুরই এর প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। তাই পরবর্তীকালের সব কবিই কোনও না কোনও ভাবে কীর্তনের সুর গ্রহণ করেছেন।

জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস এঁদের প্রত্যেকের গীত রচনার মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। প্রত্যেকের ভাষাই অপরূপ। মনে হয় তাঁরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধাকে প্রত্যক্ষ রূপে দর্শন করেছেন।

এই কীর্তন তার সুর সম্পদের জোরে এবং তার বিনম্র আবেদনে এমন ভাবে প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিল যে এর পরবর্তী লোকসংগীতগুলি এই কীর্তনের রসে পরিপুষ্ঠ হয়েই দেখা দিল। কি সুরের দিক থেকে কি ভাষার দিক থেকে। কিন্তু কীর্তন রাগের উপরই সৃষ্ট। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস তথা সমস্ত পদরচয়িতার পদের উপরই রাগের নাম নির্দেশ করা আছে। তথাপি দেখি যে তা কোনও ক্ষেত্রেই কীর্তনের নিজস্ব সুরকে অতিক্রম করে যায়নি। এরপরই আসে ব্রহ্মসংগীত ও ব্রাহ্মসমাজের প্রসঙ্গ। ব্রাহ্মসমাজকে কেন্দ্র করেই মূলত ব্রহ্মসংগীত বিকাশলাভ করেছে।

আশ্চর্যের বিষয় ব্রাহ্মধর্মের বিকাশলাভের জন্য তৎকালীন প্রত্যেক শ্রদ্ধেয় গায়ক এই উপলক্ষ্যে ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে ব্রহ্মসংগীত স্থায়িত্বলাভ করেনি এর কারণ অন্য। এখন দেখা যাক ব্রহ্মসংগীতের আবির্ভাব কখন ?

"রামমোহনের হাতেই প্রথম বাংলা গান প্রসঙ্গ বিষয় ইত্যাদি পরিত্যাগ করে কেবল বৈরাগ্য ও নিরাসক্ত ঈশ্বরভক্তি প্রচার করল। রামমোহনের যেসব শিষ্য

ভক্ত তাঁর প্রবর্তিত ধর্মসংস্কারকে নির্দিষ্ট শাস্ত্রীয় প্রণালীতে প্রচার করার দায়িত্ব নিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন সৌভাগ্যবশত গীতসংস্কৃতিবান্ পুরুষ এবং বাংলা সংগীতের সৌভাগ্যবশত তাঁরা এমন পরিবার, বন্ধুমণ্ডলী, পরিবেশ ও পরিস্থিতির সহায়তা লাভ করেছিলেন, যার ফলে ব্রাহ্মধর্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে একটি সাংগীতিক ঐতিহ্য অনায়াসে গড়ে উঠতে পারল।"[২৮]

এছাড়া আমরা দেখি নিধুবাবু, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি অনেকেই ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছেন।

এই সমস্ত রচয়িতাদের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীতগুলি সাধারণত পরিবেশিত হয়, তাও ব্রহ্মসংগীত রূপে নয়, রবীন্দ্রসংগীত রূপে। এইসব ব্রহ্মসংগীতের বৈশিষ্ট্য হল,

"বারবার ব্রহ্ম শব্দের ব্যবহার, 'প্রাণায়াম', 'চিদানন্দ', 'পতিতপাবন' প্রভৃতি ব্যবহারজীর্ণ প্রয়োগ, প্রেমের মহিমা প্রচার, নাম মাহাত্ম্য, প্রভাতকালীন ব্রহ্মসচেতনতার আহ্বান এবং অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীতের অন্ধ অনুকরণ উনিশ ও বিশ শতকের ব্রহ্মগীতগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য।"[২৯]

ব্রহ্মসংগীতের সংজ্ঞা হল

"ব্রহ্মসংগীত নিরাশার আশা, কাঙালের অমূল্য রতন, ধনীর স্থায়ী সম্পদ, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, শোকাতুরের কান্তিবারি, রোগীর অমোঘ ঔষধ। ভগবৎ সংগীতের মত এমন সর্বৌষধি আর নাই।"[৩০]

ব্রহ্মসংগীত সম্পর্কে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন,

"রাজার ব্রহ্মসংগীতগুলি বিশেষরূপে আত্মজ্ঞান সাধনের সহায়। বেদান্তের জ্ঞানমার্গ ও উপাসনানুযায়ী রচিত। ব্রহ্মের নিরাকারত্ব, নামরূপাতীত ও ত্রৈগুণ্যাতীত ভাব, সর্বব্যাপীত্ব, দ্বৈতভাববর্জন ও অদ্বৈতভাব দূরীকরণ সংসারের অনিত্যতা, শম, দম, তিতিক্ষা ও বৈরাগ্যসাধন, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, অভিমান এবং আমি, আমার ভাবত্যাগ, রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসংগীতে এই সকল উপদেশ পাওয়া যায়।" কিন্তু উপদেশের দ্বারা চালিত হলে সেই সংগীতের স্থায়িত্ব কতদূর সেই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থাকে। উদ্দেশ্যমূলক সংগীত সর্বদাই আনন্দদায়ক হয় না আবার আনন্দ না দিলে সেই সংগীতের চিরস্থায়িত্বের কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র বলেছেন,

"ব্রহ্মসংগীতকে বিশ্বসংগীত বললে অত্যুক্তি হয় না। অপর কোনও

সংগীতের সঙ্গে এর তুলনা চলে না। মুক্ত বিশাল বিশ্বের সৌন্দর্য, প্রেরণা, প্রভাব সবই যেন একটি অখণ্ড সূত্রের আকর্ষণে আমাদের চিত্তকে তার প্রতিটি উপাদানের সঙ্গে সংযোজিত করছে। আমরাও সেই অখণ্ড, এক সত্তার সঙ্গে একীভূত হয়ে যাচ্ছি। এই মহাবাণীই হচ্ছে ব্রহ্মসংগীতের বাণী।"[৩১]

কিন্তু ব্রহ্মসংগীতের বাণী সুরের থেকে পৃথক করে নেওয়া যায় যা সার্থক সংগীতের ধর্ম নয়। আবার ব্রহ্মসংগীতের বাণীও পাঁচটি গানের ক্ষেত্রে এক হয়ে যায়।

শ্রীঅরুণ বসু তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন, "ব্রহ্মসংগীতগুলিতে প্রায়শ পরমপিতা ব্রহ্মের মহিমা প্রকাশে ভক্তের আতিশয্য চূড়ান্ত হয়েছে। তাই মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের মতই এই ধর্মসংগীতগুলিতে স্বধর্মের মাহাত্ম্য জ্ঞাপন ও পরধর্ম বর্জনের মনোভাবে পর্যবসিত হয়েছে। ভক্তির সরল গভীর ব্যক্তিগত আন্তরিকতার বদলে একপ্রকার গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কোথাও কোথাও।"[৩২] এই কারণেই পাশ্চাত্যের চার্চ মিউজিক-এর মতই ব্রহ্মসংগীত ব্রাহ্মসমাজ ব্যতীত কোথাও প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেনি। এরপর রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন ব্রহ্মসংগীত। কিন্তু একমাত্র রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীতগুলিই কিছু পরিমাণে স্থায়িত্ব লাভ করেছে। কারণ রবীন্দ্রনাথের গানগুলি ব্রহ্মসংগীত পর্যায়ে লিখিত হলেও তিনি অধিকাংশ এই গানগুলির মধ্য দিয়ে তাল এবং সুরের পরীক্ষা করেছেন। ব্রহ্মসংগীতের মধ্যে তিনি যত বিভিন্ন তালের ব্যবহার করেছেন এ রকম আর কোনও গানেই করেননি। ব্রহ্মসংগীতের এক ধরনের কথায় তিনিও ক্লান্তি বোধ করেছেন। ফলে বিভিন্ন রাগের উপরে কোন তাল যুক্ত হলে ফলপ্রসূ হয় এবং অধিকতর আনন্দলাভ করা যায় তা পরীক্ষা করেছেন। আনন্দ কথাটির ব্যবহারে এই কারণে রবীন্দ্রনাথ ভক্তি উদ্রেক করাতে চাননি। কাজেই অন্তরতমের কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে তাঁর গানে আনন্দই পাওয়া যায়। এই ব্রহ্মসংগীতে প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকে অনেক নূতন রাগেরও আবির্ভাব ঘটাতে হয়েছিল। যেমন নাচারী টোড়ি, দেও গান্ধার, বৈরাগী টোড়ি, লাচ্ছাসার, ভূপনারায়ণ ইত্যাদি। এই সুরগুলি শ্রোতাদের কাছে অপরিচিত হওয়ায় এই গানগুলি শুধু ব্রাহ্মসমাজে নয় হিন্দু সমাজের শ্রোতাদের কাছেও বৈচিত্র্য এনেছে। কিন্তু সংগীতই যখন ব্যঞ্জনা তখন ভাষার দৃঢ়তা বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। তাই ব্রহ্মসংগীতের অচল অবস্থায় প্রধান বাধা হয় ভাষার বেড়াজাল। যাকে অতিক্রম করে সুর মানুষের হৃদয়ে পৌঁছায় না। শুধু কবির কতকগুলি ব্রহ্মসংগীত ব্যতিক্রম। তাই ব্রহ্মসংগীত শুধু ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন

অনুষ্ঠানে গীত হয়। হাফেজ, ওমর খৈয়াম প্রভৃতি মুসলমান কবিকে বলা হয় সূফী কবি। এঁরা একাধারে প্রেম এবং প্রকৃতির কবিতা রচনা করেছেন কিন্তু তারই মধ্য দিয়ে তাঁরা নিজেদের অন্তরকে পবিত্র করেছেন এবং এই পথেই তাঁরা ঈশ্বরের উপাসনা করেছেন। এক একজন কবি, এক একজন চিত্রকর বা কোনও কোনও ভাস্কর জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা কোনও ধর্মমতের দ্বারা, দেশ কাল পরিবেশের দ্বারা আচ্ছন্ন হন না তাঁদের রচিত শিল্প হয় সর্বজনীন। এবং তাঁদের শিল্পসৃষ্টির মধ্য দিয়েই তাঁরা পৃথিবীর সর্বপ্রকার কুশ্রীতা, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা এবং নানা রকম ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্ত হন, এবং ধীরে ধীরে তাঁদের অজান্তে সেই অনন্ত উপলব্ধির পথে পৌঁছে যান। ঈশ্বরকে একান্ত ভাবে অবলম্বন করেছেন অথচ কোনও সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে জড়িয়ে পড়েননি, কোনও সংস্কার ছিল না অথচ মনে ছিল সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ করার প্রবণতা এই প্রসঙ্গে প্রথমেই নাম করা যায় কবীরের। কবীর একান্ত ভাবে চেয়েছিলেন হিন্দু মুসলমান এক হোক, এক হোক তাদের সাধনার ক্ষেত্র, সমাজে সেইজন্য তিনি একাধারে হিন্দু মুসলমানের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তবে তাঁর মত মহাপুরুষের গতিপথে এই সমস্ত তুচ্ছ বিষয় বাধার সৃষ্টি করতে পারেনি।

তাঁর মতই ছিল

> "রাম রহীম এক হৈ নাম ধরায়া দোয়,
> কৃষ্ণ করীম এক হৈ নাম ধরায়া দোয়।
> কাশি কাবা এক হৈ এক রাম রহীম,
> ময়দা এক পকবান বসু বৈঠা কবীরাজীম।"

এই গানটি হিন্দু মুসলমানের মিলনার্থই একান্তভাবে রচিত। ঠিক সেই একই মত হল দাদুর,— দুন্যূঁ হাথী হৈব রহে, মিলি রস পিয়া নজাই। অর্থাৎ দুটি ধর্ম (হিন্দু ও মুসলমান) দুই হাত, সেই দুটি হাত একত্র না হলে রস পান করা সম্ভব নয়; একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আবার বলেছেন,

> না হম হিংদু হোহিগে না হম মুসলমান।
> ষট্‌দর্শন মেঁ হম নহীঁ হম রাতে রহিমান ॥

আমি হিন্দুও হব না, মুসলমানও হব না, ষড়দর্শনেও আমার প্রয়োজন নেই, আমি চাই সেই পরমেশ্বরকে। কবীরের মত আবার বৈষ্ণব ধর্মকেও অনুসরণ করত।

সুফী কবি কবীর অভিসারে যাবেন তিনি সজ্জিত হবেন, ভূষিত হবেন নানা অলংকারে

করলে সিঁগার চতর অলবেলী।
সাজনকে ঘর জানা হোগা ॥
মিট্টী ওড়াবন মিট্টী বিছাবন
মিট্টী মে মিল জানা হোগা।
নাহ্‌লে ধোলে সীস গুঁথালে
ফির বহাসে নহি আনা হোগা ॥
কহত কবীর সুনো ভই সাধো
দের করে পছতানা হোগা ॥[৩৩]

শিল্প সৃষ্টির আরেকটি শাখা সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়েও অনেকে পরমেশ্বরের করুণা লাভ করেছেন।

হিন্দুদের ধর্মে সংগীত অনুমোদিত। কিন্তু মুসলমানদের ধর্মে সংগীত নিষিদ্ধ। কিন্তু ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী লিখেছেন,

"আজমীর মৈনউদ্দিন চিশতীর দর্গা হইল ভারতে মুসলমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ। সেখানে মূল তোরণে প্রহরে প্রহরে নহবত বাজে। ভিতরে প্রত্যেক পবিত্র স্থানে গায়ক গায়িকারা যাত্রীদের পুণ্যার্থ সংগীত করেন ও যাত্রীরা তাহার জন্য রীতিমত দক্ষিণা দেন।"

আকবরের প্রসিদ্ধ সভাগায়ক তানসেন। তিনি একাধারে হিন্দু দেবদেবী এবং মুসলমান শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তাঁর সৃষ্ট ধ্যানমন্ত্রের মধ্যে তিনি বহু রাগরাগিনীর সংযোগ ঘটিয়েছেন এবং বিভিন্ন রাগরাগিনীর বিশুদ্ধ রূপ পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হোত তাঁর পূজা। শুধু তিনিই নন, নায়ক গোপাল, বৈজ্জু বাওরা, প্রত্যেকেই গানের মধ্য দিয়ে তাঁদের পূজা সাঙ্গ করতেন। সংগীতের সাধনা এবং ঈশ্বরের সাধনা দুইয়েরই সম্মেলন ঘটেছিল মুসলমান গায়কদের মধ্যে। তাঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন ব্রহ্মচারী এবং তাঁদের অনেকেরই ধারণা এই ছিল সৎ জীবনযাপন করে ভগবানের আরাধনা না করলে প্রকৃত সংগীতজ্ঞ হওয়া যায় না। সেইজন্য দেখা যায় যে অধিকাংশ মুসলমান গায়কেরাই বংশপরম্পরায় সুকণ্ঠ এবং সুগায়কীর অধিকারী। তানসেন এবং তাঁর দৌহিত্র বংশে এই ধারণা অত্যন্ত প্রবল ছিল। এছাড়াও গায়কদের অন্যান্য যে ধারা বর্তমান তাঁদের অনেকেই ছিলেন সাধক।

মাড়বারের মুসলমান সাধক দরিয়া সাহেব রচনা করেছেন,

মুরলী কৌন বজাই রহো
গগন মংতল কে বীচ ?
যা মুরলীকে ধূন সে
সহজ রচা বৈরাট।
যা মুরলীকী টেরহুঁ সুন সুন
রহী গোপিকা মোহী।

কাল্হ গোপী করত নৃত্যহি
চরণ বপু হি বিনা।
নৈশ বিন দরিয়ার দেখে
আনংদরূপ ঘনা॥

এই রচনায় ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রী মন্তব্য করেছেন "মুসলমান বংশে জন্মিয়া সাধক প্রবর দরিয়া সাহেব সর্বচরাচরে কৃষ্ণগোপীর যে রাস নৃত্যলীলা দেখিয়া ধন্য হইলেন, সেই লীলা দেখিবার ভাগ্য আমাদের মধ্যে আছে কয়জনের ?"

কিন্তু ভারতীয় সংগীতের উচ্চাসনগুলি নূতন নূতন রাগরাগিণী সৃষ্টির মাধ্যমে এবং সেই সঙ্গে লোকসংগীত বা দেশীয় গীতরীতিগুলিও ক্রমেই স্থান করে নিয়েছে আভিজাত্যের মণিকোঠায় এবং পরবর্তীকালে বিশেষ রীতি বা ঘরানায় পর্যবসিত হয়েছে। এছাড়াও ভারতীয় সংগীতের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল স্থানীয় অঞ্চলের দুঃখ কষ্ট, প্রেম বিরহ, পূজা পার্বণের গল্পগুলির মধ্যেও যথেষ্ট রাগরাগিণীর প্রচলন। ভজন, কীর্তনাঙ্গ সংগীতের মধ্যে জনসাধারণের নিজস্ব কথা অভিব্যক্তি দেবতার পায়ে উৎসর্গ করে কৃপা প্রার্থনার মধ্যে ধরে রাখা হয়েছে। শিবভক্ত কৃষ্ণভক্তদের সঙ্গে স্থান গ্রহণ করেছে সুফী মতবাদ। পঞ্চদশ শতাব্দীর পর হতে অনেক গায়ক নিজগুণে ধর্মমতও প্রকাশ করে গিয়েছেন। ভক্তিবাদ ভগবানকে দেখেছে পিতা, স্বামী, সঙ্গীরূপে। মানুষ এসেছে লীলাক্ষেত্রে লীলায় মত্ত হতে। জন্ম নিয়েছে রামানুজের অদ্বৈতবাদ, নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। পরবর্তীকালে দেখা গিয়েছে বল্লভাচার্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ও চৈতন্যদেবের অচিন্ত্য ভেদাভেদ।

তত্ত্ব প্রচার করে যাঁরা পথ দেখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আমরা পাই কবীর, সুরদাস, গোবিন্দদাস, তুলসীদাস ইত্যাদি সাধককে। ভগবৎ ভক্তদের মধ্যে পাই

হরিদাস, রামানন্দ, রুইদাস, মীরাবাঈ প্রভৃতি। কিন্তু এঁদের মধ্যে যাঁরা সংগীতের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে প্রাণের অর্ঘ জানিয়েছেন এবং তত্ত্বপ্রকাশ করেছেন তাঁরাই স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

নামদেব জন্মেছিলেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর দক্ষিণ ভারতে। সংগীতের মধ্য দিয়ে তাঁর সাধনার পরিব্যাপ্তি। তাঁর মতে সংগীতের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে ডাকতে হয়। তিনি সংগীত ভালবাসেন।

গানের মধ্যে কবীর নাম গান, গুরুভক্তি, সংসার বৈরাগ্য, জীবেপ্রেম, ভগবানে আত্মসমর্পণ ও ভেদাভেদ ভুলবার বাণী প্রচার করে গিয়েছেন। কবীরের এই ভজন গীতগুলি উচ্চাঙ্গ সংগীত গড়ে তোলার পক্ষে সহায়ক যত না ছিল, তার বেশি প্রভাব বিস্তার করে পববর্তীকালের কাব্যসংগীতগুলিতে। তাই কবীরের গান আজও জনপ্রিয়। শ্রোতার হৃদয়ে তার স্থান।

নানকের আদর্শ কবীরের অনুসারী। ভেদাভেদ জ্ঞান দূর করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি পরবর্তী জীবনে সংসারাশ্রমে ফিরে এসেছিলেন। নিজের মত সম্বন্ধে বলেছেন :

সাধো, মনকা মান ত্যাগো।
আস্তুত নিন্দা দৌ ত্যাগৈ
খৌজে পদ নির্বাণা।
জান নামক য়হ খেল কঠিন হৈ
কোহু গুরুমুখ জানা।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে গুজরাটের নিকট নরসি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কৃষ্ণগোস্বামী নামে আরাধনা করতেন। এঁর শৃঙ্গার মালার পদ ভাব, ভাষা, বর্ণনায় মধুর ছিল। ফলে পরবর্তীকালে মীরাবাঈয়ের কণ্ঠে এইগুলির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় এবং নৃত্য ও গীতের মাধ্যমে এইগুলি পরিবেশিত হত। গীতগোবিন্দের পদ, কবীরের ভজন সকলেরই সুর পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু সংগীত তো অন্যান্য শিল্পের মত একটি স্থির ছবি হয়ে নেই। দিনে দিনে এর রূপ পরিবর্তিত হয়। কখনও ভাষা বড় হয় কখনও ভাব বড় হয়। মানুষকে আকৃষ্ট করে এবং প্রত্যেক যুগের মানুষই আপন সুরের মহিমায় তাকে সমুজ্জ্বল করে তুলে সেই সংগীতকে এগিয়ে যাওয়ার পাথেয় যোগায়।

মীরাবাঈ তাঁর গানের মাধ্যমে হরিদাস স্বামীর প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ বাঁকে

বিহারীকে, রামানন্দ স্বামীকে, নরসিজীকে, আবার চৈতন্য প্রত্যেককে তাঁর প্রণতি জানিয়েছেন।

শিল্পের ক্ষেত্রে মীরাবাঈ তাঁর গানের জন্যই অমর হয়ে রয়েছেন। এক্ষেত্রে মীরাবাঈকে রামপ্রসাদের সঙ্গে তুলনা করা চলে। ভক্তিমতী মীরাবাঈ-এর চেয়েও অনেক বড় হলেন শিল্পী মীরাবাঈ। তাহলে আমরা দেখি যে সংগীত ধর্মকে কেন্দ্র করে এগিয়েছে কিন্তু ধর্মের মধ্যেই লয় প্রাপ্ত হয়নি। সংগীত মানুষের প্রাণের আরাধনা। তাই এর ব্যাপ্তি জগৎকে ছাড়িয়ে অতীন্দ্রিয়লোকে ছড়িয়ে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ যে বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন তা মূলত তার গানের জন্য যেমন :

"চৈতন্য যখন পথে বাহির হইলেন তখন বাংলাদেশের গানের সুর পর্যন্ত ফিরিয়া গেল. তখন এক কণ্ঠ বিহারী বৈঠকী সুরগুলো কোথায় ভাসিয়া গেল। তখন সহস্র হৃদয়ের তরঙ্গ হিল্লোলে সহস্র কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত করিয়া নূতন সুরে আকাশ ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তখন রাগ রাগিণী ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইল, একজনকে ছাড়িয়া সহস্র জনকে বরণ করিল। বিশ্বকে পাগল করিবার জন্য কীর্তন বলিয়া এক নূতন কীর্তন উঠিল। যেমন ভাব তেমনি তাহার কণ্ঠস্বর—অশ্রুজলে ভাসাইয়া সমস্ত একাকার করিবার জন্য ক্রন্দনধ্বনি।"[৩৪]

"বৈষ্ণব ধর্ম প্লাবনের সময় বিশ্বপ্রেম যেদিন বাংলাদেশে মানুষের মধ্যে সমস্ত কৃত্রিম সংকীর্ণতার বেড়া ভাঙিয়া দিয়া উচ্চ নীচ শুচি অশুচি সকলকেই এক ভগবানের আনন্দলোকে আহ্বান করিল, সেই দিনকার বাংলাদেশের গান বিশ্বের গান হইয়া জগতের নিত্য সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে।"[৩৫] এর দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে কবি বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি কোনও আকর্ষণ বোধ করেননি করেছেন এর সংগীতের প্রতি। যে সংগীত চরাচর ব্যাপ্ত করে মানুষের হৃদয়কে প্লাবিত করে দিয়েছে সেই সংগীতকেই তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। নিজের গানে কীর্তনের সুর বসিয়ে মূলত কীর্তনের সুরকেই তিনি এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। এইভাবেই সংগীত তার পাথেয় সংগ্রহ করে। কীর্তন গানে গায়কের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত। কবির কাব্য গানের রূপ ব্যাখ্যার দ্বারাই কীর্তনরূপ লাভ করে। আখরের দ্বারাই ভাব বিস্তার হয়ে থাকে।

কীর্তন আধ্যাত্মিক জগতের গান। কিন্তু অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত বলেই সুমধুর ব্যঞ্জনায় এর পরিসমাপ্তি। শেষের পরেও এর রেশ থাকে।

শব্দতরঙ্গের প্রভাব যা জীবের দেহে ক্রিয়া করে আর সংগীত তরঙ্গের প্রভাব

এক ধরনের নয়। সংগীতের শুরু তখনই যখন সংগীতের ধ্বনিগুলো শুদ্ধ হয়ে আসে। হ্যানস্লিক বস্তুবাদী সংগীতজ্ঞদের এই কথাটিই বুঝিয়েছেন। হ্যানস্লিক ভাববাদী শিল্পতাত্ত্বিকদেরও বলেছেন সংগীত স্নায়ুতন্ত্রের উপর তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি করে এ ধারণারও কোনও যুক্তি নেই এগুলি বস্তুবাদী বিপক্ষ সমালোচনার কাজে লাগতে পারে। শ্রবণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের পার্থক্য আছে। শ্রবণেন্দ্রিয় মনের উপর যে প্রত্যয় তুলে ধরে সমগ্র দেহে সে প্রভাব সঞ্চারিত হতে পারে না। সেক্ষেত্রে সংগীত রোগ নিরাময় করে এ তথ্যটিও ভুল একথা বলেছেন হ্যানস্লিক। হ্যানস্লিকের মতে সুর স্পন্দিত হয়ে শ্রবণ স্নায়ুতে প্রবেশ করে এবং একটি বিশেষ মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করে, সেই অবস্থাটি আজও অব্যাখ্যাত এবং সম্ভবত চিরকালই অব্যাখ্যাত থাকবে।

কীর্তনের প্রসঙ্গে হ্যানস্লিকের মন্তব্য আলোচনা করার অর্থ এই নয় যে যেহেতু সংগীত শ্রোতাকে অলৌকিক আনন্দদানে সক্ষম সেহেতু কেবলমাত্র কীর্তনাঙ্গ সংগীত ধ্রুপদ প্রভৃতি গানই নির্মল আনন্দ পরিবেশনে সক্ষম। প্রধান কথা কীর্তনাঙ্গ সংগীত আরও বেশি কিছু দিয়ে থাকে, মনোজগতে মনিকাঞ্চন যোগ ঘটিয়ে থাকে। তাই বাংলার যাত্রাগানে, থিয়েটারে এই কীর্তনাঙ্গ গানগুলির ভাষা সুর সবার অজ্ঞাতসারে মিশে গিয়েছে কেননা কীর্তন শুধুমাত্র একটি বিশেষ ধরনের সুর বা রীতি বহন করে না, কীর্তনের ক্ষেত্রটি বিস্তৃত ও পদাবলী সাহিত্যের মতই সুপ্রসারিত। বাংলার সংগীতের ক্ষেত্রে কীর্তন আজ দাঁড়িয়ে আছে অক্ষয় বটের মত তার অফুরন্ত রসধারা নিয়ে, সুর বৈচিত্র্যে মণ্ডিত হয়ে। 'সখী, কি পুছসি অনুভবমোয়' আখর দেওয়া হল 'কথা কইতে নারি', অনুভব ভাষায় ব্যক্ত করবার ক্ষমতাই তো প্রকাশ করবার। 'সেই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নৌতুন হয়'। এখানেও আখর 'প্রাণ আমার যাকরে কথা কইতে নারি', অর্থাৎ প্রাণের কোনও স্তরেই কিছু করবার থাকে বা প্রকাশ করবার থাকে কিন্তু ভাষার ক্ষেত্রে সেই একই অনুযোগ বা আবেদন 'কথা কইতে নারি'।

'দুইহাতে কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে' এই ভাবমূর্তিটি প্রকাশের মধ্যে কীর্তনের নৃত্যধর্মটুকু রক্ষা করেই রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব একটি নন্দনলোকের চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম। সেখানে আর তান বা আখর কিছুরই প্রয়োজন হয়নি, বাহ্যাড়ম্বর জ্ঞানেই পরিত্যক্ত হয়েছে। সংগীতের ভাষা বিশ্বজনীন (ল্যাংগুয়েজ অব্ মিউজিক ইজ্ ইউনিভার্সাল) বলে যে কথাটি প্রচলিত হয়েছে সেটি কাব্যসংগীত সম্পর্কে সত্যরূপে গ্রহণ করতে হলে ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের প্রয়োজন নতুবা ভাব ও ভাষার মাধ্যমে যে ভাব সংগীতে বিরাজিত সেটি গড়ে

তোলা সম্ভব নয়। বস্তুত হিন্দুস্থানী গানের রীতিটিরও ভাষার জন্য বাংলার আসরে স্থান লাভ করা দুরূহ হয়ে উঠছিল। রবীন্দ্রনাথের মতে বাংলায় রাধাকৃষ্ণের লীলাগান হিন্দুস্থানী গানের প্রবেশ অভিযানকে ঠেকিয়ে দিলো। এই লীলা রসের আশ্রয়স্থল একটি উপাখ্যান। সেই উপাখ্যানের ধারাটিকে নিয়ে কীর্তন গান হয়ে উঠল পালাগান, স্বভাবতই পালাগানের রসটিও নাট্যরস। অথচ হিন্দুস্থানী সংগীতে নাট্যরসের জায়গা নেই।

"কীর্তনে বাঙালীর গানে সংগীত ও কাব্যের যে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি বাঙালীর অন্য সাধারণ গানেও তাই। নিধুবাবুর শ্রীধর কথকের টপ্পা গানে, হরু ঠাকুর রাম বসুর গানে সংগীতের সেই যুগল মিলন ধারা।"[৩৭]

য়ুরোপীয় সাহিত্যে 'লিরিক' কবিতাগুলো, এইভাবেই গীত হবার যোগ্যতা অর্জন করে। তবে য়ুরোপীয় কাব্যসংগীত সর্বজনীন হবে তখনই যখন ইংরাজী ভাষায় দখল হবে অপরিমিত। সুরের দ্বারা ভাব সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু কথা ও সুরের সমন্বয়ে বোধগম্যতার সৃষ্টি হয়।

হিন্দু মুসলমানের যোগসাধনায় লোকসংগীত যে রসধারা বহন করে তা লীলার ক্ষেত্র হতে স্বতন্ত্র ও অধ্যাত্মরসের অন্তর্মুখীন স্রোত ধারায় সুললিত।

বাউল দেশ কালের বিচারে যে সংগীত রস বহন করে তার মধ্যে লোকদেবতা নানাভাবে বিরাজিত হয়ে ওঠেন। এইগুলি লোকসংগীত, এর মধ্যে সাতটি সুরই ব্যবহৃত। ক্ষেত্র বিশেষে রাগ প্রধান করবার প্রবণতা দেখা দেয় এই লোকসংগীতে।

সাধারণ লোক শিক্ষিত নয়। উচ্চাঙ্গ সংগীতের সাধনা লাভ এঁদের ভাগ্যে হয় না। এঁরা শিক্ষিত মহল হতে হয়তো কোন সংগীতরীতি শুনে থাকেন, নিজ গ্রামগঞ্জে সেই সুর আরোপ করেন নিজের তৈরি গানে। বহুদিনের পথ এটি। কিন্তু অনুকরণধর্মিতা এই লোকসংগীতে স্থান পায়নি। এই গানে থাকে প্রাকৃতিক পরিবেশ, উৎসবের পালাপার্বণ। যুগ যুগ ধরে বাউল গান সঞ্চয়ের পরিধি বাড়িয়ে চলেছে : পাথেয় তার প্রীতি ও আত্মদর্শন।

পশ্চিমবঙ্গের চড়ক এবং পূর্ববঙ্গের নীল পূজায় লোকেরা সাজ করে ঘরে ঘরে নৃত্যগীত প্রদর্শন করে চলে। এই সব সংগীত হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাউলই তৈরি করেছেন।

হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সমগ্র উত্তর ভারতে, রাজস্থানে এই ফকীর দরবেশদের সংগীত এখনও জনচিত্তে সমানভাবে আকর্ষণীয়। কারবালা প্রান্তরের ঘটনা নিয়ে জারিগান মুসলমান ফকীরদের নিকট অধিকতর প্রিয়। এই গানগুলি

সর্বজনীন না হতে পারে, কিন্তু এর আবেদন সমঝদারের কাছে অত্যধিক। ফলে এই গান কোনওদিন পুরাতন হয় না। যেমন একটি জারি গানের উদাহরণ,

> "তরাও নিজগুণে নিজেরও অধীনে
> বরকত জননী, মা আমার।
> পড়ে ভবঘোরে ডাকি বারে বারে, মা তোমায়,
> ওগো, রসুলের মেয়ে,
> ইমাম হোছেনের মা হয়ে, হলে জগত মা,
> তোমার ইমাম হোছেন কাঁদে,
> জামা দিলে পিদে, পুত্র বলে তাই,
> ওমা, খুশী হয়ে মনে, যেয়ে সেই ময়দানে,
> ইদের নামাজ করিলেন আদায়"[৩৮]

ইত্যাদি। এর পরেও গল্পটি সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে সুরেব মাধ্যমে।

বাংলাদেশের কৃষিজীবী সম্প্রদায়, মাঝি এদের মধ্যে যে গীতধারা অক্ষুণ্ন সেটি ভাওয়াইয়া এবং ভাটিয়ালী। এই গানগুলিকে ভিত্তি করে অন্যান্য বহু লোকসংগীতের সৃষ্টি হয়েছে।

গম্ভীরা গানের ক্ষেত্রও প্রশস্ত। উত্তরবঙ্গে গম্ভীরা গায়কদের প্রতিষ্ঠাও যথেষ্ট।

এছাড়াও পালাপার্বণে বাংলাদেশে টুসু পরবের গান, ভাদু উৎসবের গান, মনসামঙ্গল, যা অদ্যাবধি আনুষ্ঠানিক রূপে গীত হয়।

যেমন একটি টুসু গান,

> "এত বড় পৌষ পরবে রাখলি মা পরের ঘরে,
> মাগো, আমার মন কেমন করে।
> পরের মা কি বেদন জানে অন্তবে জ্বালায়ে মারে
> উপর পাড়ার টুসু তুমি, নামো পাড়ায় যেয়ো না,
> মাঝ কুলিতে সতীন আছে পান দিলে পান খেও না।"

গানগুলির মধ্যে এক অপরূপ ছন্দ বিরাজ করছে। ভাষার মধ্যেও আছে সুমধুর লালিত্য। তথাপি এই গানগুলি উচ্চবিত্ত সমাজে প্রচলিত নয়। কিন্তু যাদের জন্য এই গান সেই সমাজের লোক নিশ্চয়ই এই গান শুনে আনন্দ লাভ করে সেইজন্য এইগুলি আঞ্চলিক সংগীতরূপে বিশেষভাবে প্রচলিত। এইভাবে যুগ

যুগ ধরে গানের সঞ্চয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর কারণ লোকসংগীতের সুরের মধ্যে কোথাও কোনও বৈশিষ্ট্য থেকে যায় যা মানুষের মনকে একসূত্রে গ্রথিত করে। এই সংগীত অবাচীন, একঘেয়ে সহজ সরল রূপে চিহ্নিত হলে ভবিষ্যৎ সংগীত সাধকের কাছে এই সংগীতের অস্তিত্ব থাকত না। কিন্তু তার পরিবর্তে ধীরে ধীরে লোকসংগীত সংগীতের মেরুদণ্ডরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছে। তাই ত রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "একদিন বাংলার সংগীতে যখন বড় প্রতিভার আবির্ভাব হবে তখন সে বসে বসে শতাব্দীর তানসেনী সংগীতকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে প্রতিধ্বনিত করবে না, আর আমাদের এখনকার কালের গ্রামোফোন সঞ্চারী গীত পতঙ্গের দুর্বল গুঞ্জনকেও প্রশ্রয় দেবে না। তার সৃষ্টি অপূর্ব হবে, গম্ভীর হবে, বর্তমান কালের চিত্ত শঙ্খকে বাজিয়ে তুলবে নিত্যকালের মহাপ্রাঙ্গনে।"[৩২]

বর্তমান কালের এক শ্রেণীর গায়ক এবং রচয়িতা অনুকরণের পথে চলেছেন। সংগীতকে যদি বিশ্বজনীনরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তবে লোকসংগীতকে অনাদৃত করে রাখলে তা সমীচীন হবে না।

এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। পদাবলী কীর্তন ও বাউলদের ভজন বাংলার মাটিতে বহুদিন প্রচলিত হয়ে এলেও ভক্তিরসের প্রাবল্য সৃষ্টি করেছিলেন সাধক রামপ্রসাদ, একই পদ্ধতিতে গান গেয়ে যে সাধনার মার্গটি তিনি তুলে ধরলেন সেটি নিতান্ত গ্রাম্য হলেও অর্থপূর্ণ ছিল। ছিল বিষণ্ণতা, দৈন্যের মধ্য হতে মুক্তি পাওয়ার বাসনা। বাংলাগানেব নবযুগের প্রারম্ভে টপ্পা, হাফ আখড়াই-এর স্থান দেখান হয়। রামনিধি গুপ্ত, ঈশ্বর গুপ্ত অনেক রচনা করেছেন তার প্রভাব পল্লীর সুরে পরিব্যাপ্ত। সংগীতের জয়যাত্রা লোকসংগীতের মাধ্যমেই। সংগীতশাস্ত্রকারের দ্বারা বর্ণিত সংগীতের একঘেয়েমি থেকে বাঁচবার জন্যই এই শিল্পীরা শাস্ত্রকারের বিধিনিষেধের গণ্ডী উপেক্ষা করে লোকসংগীতের কথাগুলি সম্বল করে, সুর সৃষ্টি করে জনসমক্ষে উপস্থিত হয়ে শ্রোতার হৃদয়ে স্থান গ্রহণ করেছেন। উচ্চাঙ্গ সংগীত ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী ইত্যাদিরূপেই পরিচিত। তবে মার্গ সংগীতের ধারা পৌরাণিক যুগের নাট্যশাস্ত্রের সংগীত সাধনার ধারার মধ্যে ধরে রাখা সম্ভব হয়নি, এই সংগীতের ধারাটি তুলে নিতে হয়েছে জনসাধারণের সংগীতের হাট হতে। লোকসংগীতের গুণী শিল্পীরাই ধাপে ধাপে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই এই সংগীতগুলির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। ক্ষিতিমোহন সেনের মতে "মানতোমর ও আকবরের উৎসাহে যেমন লোকগীতি হইতে ধ্রুপদ মার্গসংগীতের পদ লাভ করিল, তেমনই সুলতান সার্কী

ও মহম্মদ শাহের উৎসাহে লোকগীতি হইতে খেয়ালের স্থানও মার্গসংগীতের মধ্যে উন্নীত হইল।"[৪০]

বস্তুত ভারতীয় সংগীত শিল্পীরা রাগের পর রাগ মিলিয়েই নবরাগ সৃষ্টি করে এসেছেন, সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রেরও উন্নতি ঘটেছে।

ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের মূলে ভাবের ক্রিয়া। এই ভাব যেহেতু রসাশ্রয়ী এবং নয়টি রসের মাধ্যমে বাহিত সেক্ষেত্রে ললিত কলার মাধ্যমে কোনও বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের উপস্থাপনায় লোকসাহিত্য ও লোকগীতির দায়িত্বও কম নয়। লোকগীতি সাতটি সুরই বহন করে কিন্তু কোনটাই বিশেষভাবে নয়।

এবার আমরা দেখব রবীন্দ্রসংগীত, দ্বিজেন্দ্রগীতি, নজরুলগীতি, অতুলপ্রসাদ গীতি, রজনীকান্ত গীতিগুলি কেন এত জনপ্রিয় এবং অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী। অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী আমরা সেই গানগুলিকেই বলব যে গীতবাদ্যগুলি যুগের সঙ্গে লুপ্ত হয়ে যায়নি, এবং যেগুলি আমরা শুনে কিংবা গেয়ে ক্ষণিকের জন্য হলেও নিজেকে এবং পারিপার্শ্বিককে বিস্মৃত হতে পারি।

রবীন্দ্রসংগীতকে কতকগুলি পর্যায়ে ভাগ কবা হয়েছে। পূজা পর্যায়, প্রেম পর্যায়, প্রকৃতি পর্যায় এবং বিচিত্র পর্যায় এবং স্বদেশ। এর মধ্যে প্রথম তিনটিই প্রধান। এর মধ্যে পূজা পর্যায়ের গানকে আবার আরও নানা ভাগে বিশ্লেষিত করা যেতে পারে।

কমলাকান্ত গান রচনা করেছেন, কালীই তাঁর আরাধ্য দেবতা। নানাভাবে নানা দিক দিয়ে তিনি কালীর আরাধনা করেছেন। রামপ্রসাদও কালীকেই একমাত্র দেবীরূপে বন্দনা করে সংগীত রচনা করেছেন এবং তাঁদের সংগীতের মধ্য দিয়ে কালী মূর্তি তাঁর রূপ, কখনও বা তাঁর সজ্জা এইগুলি প্রাধান্য পেয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলীর কবিরা তাঁদের প্রাণের আরাধনা জানিয়েছেন রাধা কৃষ্ণকে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজ এবং পরিবারভুক্ত। ব্রাহ্মমত ছিল মূর্তি পূজার বিরোধী। কাজেই তাঁর সংগীতের মধ্য দিয়ে কখনও কোনও মূর্তি উল্লিখিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের মতে ব্রহ্মই সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্তস্বরূপ। সেই পরমব্রহ্ম পৃথিবীতে আনন্দরূপে, অমৃতরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছে এবং বিশ্বজগৎ তাঁর অমৃতময় আনন্দ, তাঁর প্রেম। সেই ব্রহ্মকেই তিনি আস্বাদন করেছেন তাঁকে প্রার্থনা করেছেন, তবে মূর্তিরূপে নয় সখারূপে, প্রিয়রূপে, তাঁর

হৃদয়ের রাজার রূপে ইত্যাদি
যেমন :

প্রভু আমার, প্রিয় আমার, পরম ধন হে"

ওগো সবার, ওগো আমার, বিশ্ব হতে চিত্তে বিহার
অন্তবিহীন লীলা তোমার নূতন নূতন হে ॥"

অথবা

তুমি বন্ধু, তুমি নাথ, নিশিদিন তুমি আমার।
তুমি সুখ, তুমি শান্তি, তুমি হে অমৃত পাথার।

আবার
ও অকূলের কূল, ও অগতির গতি,
ও অনাথের নাথ, ও পতিতের পতি।

ইত্যাদি নানা বিশেষণে সেই ব্রহ্মস্বরূপকে ভূষিত করেছেন। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে কোনও মূর্তিই ফুটে ওঠে না যাঁকে সামনে বসিয়ে পূজা করা যায়। কিন্তু কবি তাঁকেই তাঁর প্রাণ, মন, ভালবাসা একান্তভাবে সমর্পণ করেছেন, 'ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা', 'তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী', 'বল দাও মোরে বল দাও', 'তোমারি সেবক করো হে আজি হতে আমারে।' 'আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে।' ইত্যাদি গানের মধ্য দিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ মূর্তিপূজা করেননি সত্য কথাই। কিন্তু কোনও কোনও গানের ভাষা অনুধাবন করলে এই ধারণাই হয় যে তিনি কোনও রূপকে নিজের মনের মধ্যে অন্বেষণ করেছেন বা তাঁর চেতনায় তিনি কোনও রূপকে প্রত্যক্ষ করছেন।

যেমন

'জননী তোমার করুণ চরণ খানি' বা,
'তুমি আমাদের পিতা, তোমায় পিতা বলে যেন জানি,'
বা 'চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে'
'দেবাধিদেব মহাদেব। অসীম সম্পদ, অসীম মহিমা'
'একি এ সুন্দর শোভা। কী মুখ হেরি এ।
আজি মোর ঘরে আইল হৃদয় নাথ'

এই গানগুলির মধ্য দিয়ে সেই রূপ দর্শন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির সকল উৎসবের সুরের মধ্যে একটি মিল দেখতে পাওয়া যায়, তা হল, আপামর জনসাধারণের মিলন এই উৎসবকে কেন্দ্র করে। এর কারণই হল কবির ভাষায়,

"উৎসবের দিনে আমরা যে সত্যের নামে বহুতর লোকে সম্মিলিত হই, তাহা আনন্দ, তাহা প্রেম।"

"আনন্দ কেমন করিয়া আপনাকে প্রকাশ করে প্রাচুর্যে, ঐশ্বর্যে, সৌন্দর্যে। জগৎ প্রকাশে কোথাও দারিদ্র্য নাই, কৃপণতা নাই, যেটুকু মাত্র প্রয়োজন তাহারই মধ্যে সমস্ত অবসান নাই। এই যে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র হইতে আলোকের ঝরনা আকাশময় ঝরিয়া পড়িতেছে, যেখানে আসিয়া ঠেকিতেছে সেখানে বর্ণে তানে প্রাণে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, ইহা আনন্দের প্রাচুর্য।"

হিন্দুদের ধর্মের বক্তব্য সাধনায় সিদ্ধিলাভ এবং সেই সিদ্ধিলাভেই মুক্তি। কিন্তু কবির মতে, সাধনা সত্যই তবে তা ধ্যানযোগে নয়, তা হল আনন্দের সাধনা, আনন্দকে প্রত্যক্ষ করে, তার মধ্যেই মুক্তি। কবির গানে সেই আনন্দকে প্রত্যক্ষ করার আনন্দই ফুটে উঠেছে।

যেমন :

'আজি এ আনন্দ সন্ধ্যা সুন্দর বিকাশে'
'আনন্দ তুমি স্বামী, মঙ্গল তুমি'
'জগত জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে'

ইত্যাদি অসংখ্য গানের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রাণের আনন্দই ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে।

প্রকারান্তরে কবি হিন্দু ধর্মকেই সমর্থন জানালেন। কারণ হিন্দু ধর্মেব সাধনা, জ্ঞান মার্গে, কর্ম মার্গে এবং প্রেম মার্গে। কবির মতে এই তিনটি ধারায় যে সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করেছে বা এই তিনটি মার্গের সমন্বয় সাধন যে করবে, সেই আনন্দকে প্রত্যক্ষ করবে এবং এই আনন্দের মধ্য দিয়েই তার মুক্তি।

এই তিনটি মার্গের মধ্যে কবির নিজস্ব এবং একান্ত প্রিয় হল প্রেম মার্গ। কারণ অপরকে ভালবাসার মধ্য দিয়েই জাগে প্রেম, সেই প্রেমের পরিপূর্ণতায়ই জাগে আনন্দ। মানুষকে ভালবাসার মধ্য দিয়েই সেই অনন্তকে উপলব্ধি করা যায়, তাঁকেও ভালবাসা যায় এবং ভালবাসা যেখানে সার্থক সেখানে আর কোনও সাধনারই প্রয়োজন নেই।

এই অচিন্ত্যনীয়, অধরা প্রেমকেই তিনি রূপ দিয়েছেন তাঁর অধিকাংশ গান এবং বক্তব্যের মধ্য দিয়ে

'এই তো তোমার প্রেম ওগো হৃদয় হরণ'
'প্রেমটি যেদিন জ্বালি হৃদয় গগনে
কি উৎসবের লগনে'

সেদিন সেই আলো তাঁর নিজের মুখে পড়ে না, পড়ে 'তাঁর' মুখে এবং সেই আলোর মধ্য দিয়েই 'তিনি' প্রকাশিত হন। 'তাই তোমার আনন্দ আমার পর' ভগবানের আনন্দ ভক্তের মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে।

কবির নিজের কোনও সমস্যাই নেই। কারণ তিনি তাঁর মুক্তির প্রার্থনা জানিয়েছেন তাঁর গানের মধ্য দিয়ে এবং তাঁর ব্যাকুলতা এই যে গানের মধ্য দিয়েই যেন তাঁর মুক্তি ঘটে।

'গানে গানে তব বন্ধন যাক টুটে'
'তোমার কাছে এ বর মাগি
মরণ হতে যেন জাগি গানের সুরে।'
'যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে
মিলাব তাই জীবন গানে।'

তাঁর পূজার গান শুধু পূজাই জানায় না, জানায় আরতি, জানায় ভালবাসা, জানায় প্রার্থনা, জানায় প্রাণের আকুতি, জানায় মনের দৃঢ় বিশ্বাসকে, জানায় মুক্তির আনন্দকে।

তাঁর মতে শুধু

'সবে আনন্দ করে
প্রিয়তম সাথে লয়ে যতনে হৃদয়ধামে ॥
সংগীতধ্বনি জাগাও জগতে প্রভাতে,
স্তব্ধ গগন পূর্ণ করো ব্রহ্ম নামে ॥"

প্রকৃতির মধ্য দিয়ে কবি যখন তাঁর জীবন দেবতাকে আবাহন জানিয়েছেন তখনও ভাষার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে আনন্দ।

যেমন :

"শরতে আজ কোন অতিথি এল প্রাণের দ্বারে,

আনন্দ গান গা রে হৃদয় আনন্দ গান গা রে ॥"

যেমন আর একটি গান

"আমার নয়ন ভুলানো এলে,
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে ॥
শিউলিতলার পাশে পাশে ঝরা ফুলের
রাশে রাশে
শিশির ভেজা ঘাসে ঘাসে অরুণ রাঙা চরণ ফেলে
নয়ন, ভুলানো এলে ॥"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে 'উপনিষদ'কে একান্তভাবে অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর বহু গানের মধ্য দিয়ে উপনিষদের ভাবমূর্তিই প্রকাশ পেয়েছে এবং তা এত সুন্দর ভাবে যে, শ্রোতার কাছে তা কোনও অস্পষ্টতার আড়াল রাখেনি। তা শুধু এক ভাবগম্ভীর আনন্দময় অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছে শ্রোতার মনে।

যেমন :

'আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে
আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে।

যেমন :

চলো যাই চলো, যাই চলো, যাই—
চলো পদে পদে সত্যের ছন্দে
চলো দুর্জয় প্রাণের আনন্দে।"

জগৎপিতা, জগৎবন্ধুকে উপনিষদই বলেছে আনন্দময়। কবিও তাঁর সারাজীবনের দুঃখ নানা দুর্ভাবনা সত্ত্বেও একান্তভাবে সেই আনন্দময়কেই আবাহন জানিয়েছেন। তাই তাঁর গানের সুরে সুরে জেগে ওঠে ভালবাসার সুর, আনন্দের সুর। সংগীতের প্রকৃত রূপ, যার কোনও উদ্দেশ্য নেই, একমাত্র শ্রোতার মনে আনন্দময় অনুভূতি গড়ে তোলা ছাড়া।

'বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা'
'আনন্দধ্বনি জাগাও'

'আনন্দেরই সাগর হতে এসেছে আজ বান'
'আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে।
'রহি রহি আনন্দ তরঙ্গ জাগে'

কবি তাই বলেছেন :

'শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গা রে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে।'

কবি তাই মুক্তির মধ্য দিয়েই আনন্দকে সন্ধান করেছেন। তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনাও এই আনন্দের সাধনাকে কেন্দ্র করেই। কাজেই আনন্দ তাঁর সেখানে, 'ঐ গাছগুলো বিশ্ব বাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তাহলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই প্রাণ সমুদ্রের কূলে, যে সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত, আর গভীর তলে শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম। সেই সুন্দরের লীলায় লালসা নেই, আবেশ নেই, জড়তা নেই, কেবল পরমা শক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন। 'এতস্যৈবানন্দস্য মাত্রানি' দেখি ফুলে ফলে পল্লবে : তাতেই মুক্তির স্বাদ পাই, বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নির্মল অবাধ মিলনের বাণী শুনি।

"বাংলাদেশে সংগীতের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব হচ্ছে গান, অর্থাৎ বাণী ও সুরের অর্ধনারীশ্বর রূপ।" তথাপি সংগীতে কখনও বা কথা প্রাধান্য পায়, কখনও বা সুর। কখনও বা কথায় সুরে মিলে মিশে এক হয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথের কোনও কোনও গানে যখন বাণী প্রাধান্য পায়, তখন সেই গানে থাকে ভাবময় এক গভীরতা যা মনকে আপ্লুত করে। কিন্তু গানে যখন সুর প্রাধান্য পায়, তখন সেখানে সৃষ্টি করে এক অপরূপ সৌন্দর্য। তখন গান হয়ে ওঠে কবির ভাষায় নন্দনকলা।

কবির বক্তব্য

"প্রথম বয়সে আমি হৃদয় ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি গানে, আশা করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে। পরিণত বয়সের গান ভাব বাৎলাবার জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্য। তৎসংশ্লিষ্ট কাব্যগুলিও অধিকাংশই রূপের বাহন। 'কেন বাজাও কাঁকন কন কন কত ছল ভরে' এতে যা প্রকাশ পাচ্ছে তা কল্পনার রূপলীলা।"

প্রকৃতপক্ষে সৌন্দর্যসৃষ্টির জন্যই রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি নতুন তাল সৃষ্টি করেছেন, যেমন রূপকড়া, নবতাল, একাদশী, ঝম্পক, নবপঞ্চতাল ইত্যাদি।

এর মধ্যে একাদশী তালের উপর যে গান

"কাঁপিছে দেহলতা থর থর
চোখের জলে আঁখি ভরভর।"

এর মধ্যে কবিতার যে ঢংটি প্রধানত মিলের বৈশিষ্ট্যের জন্য চোখে পড়ে তা গানের মধ্য দিয়েও ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের যে গানগুলি কাব্যগীতি আখ্যা পেয়েছে, সেই গানগুলির মধ্য দিয়ে আলাদা কাব্যিক সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে।

যেমন :

'আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে'
'আমার বেলা যে যায় সাঁঝ বেলাতে'
'এ শুধু অলস মায়া'
'ধরা দিয়েছি গো'
'প্রাণ চায় চক্ষু না চায়' ইত্যাদি

গানগুলি অপরূপ সুষমা মণ্ডিত। শুধু মন কিছু পাওয়ার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়। এরপর দেখা যাক যেগুলি রাগের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। এই গানগুলির সুরশৈলীর কথা চিন্তা করলে একথা ধারণাতে আনা সম্ভব হয় না যে ববীন্দ্রনাথ কোনও দিন হিন্দুস্থানী সংগীত শিক্ষা করেননি। শুধু ভাবটুকু মনের মধ্যে গেঁথে নিয়েছেন কাঠামোটি জেনে নিয়েছেন 'অল্প লইয়া থাকি তাই' গানটি ছায়ানট রাগের উপর একতালের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এছাড়া আরও আছে যেমন 'যদি প্রেম দিলে না প্রাণে' (পিলু একতাল). 'এরা পরকে আপন করে' গানটি ঠুংরী চালে রাগও ঠুংরী গানেরই, প্রধানত পিলুবারোয়াঁ, তালটিও দাদরা, গানটির কথাগুলিরও যথেষ্ট ওজন আছে কিন্তু এই গানটির বিশেষত্ব এই কথাকে ছাপিয়ে এর গাওয়ার ধরন এবং সুরই আগে মনকে স্পর্শ করে। রবীন্দ্রনাথের কাছে সকল বাঙালী এই জন্য কৃতজ্ঞ থাকবে যে যাদের সঙ্গে হিন্দুস্থানী সংগীতের কোনওদিন পরিচয় ছিল না, তাদের কাছে তিনি নূতন জগতকে প্রতিষ্ঠা করেছেন সুরের মাধ্যমে। কবির এই ধরনের কতকগুলি গানে কথা কিছুটা উপেক্ষিত হয়ে সুর অবলম্বিত হয়েছে উপরন্তু গায়কের গায়কীর দরুন কিছু কিছু রূপ পরিবর্তিত হয়েছে।

ঋতু পর্যায়ের প্রায় সকল গানেই কবি এমন সুর দিয়েছেন যাতে সেই সুরটিকে চিনে নিতে শ্রোতার এক মুহূর্ত বিলম্ব হয় না।

যেমন :

'একি আকুলতা আজি ভুবনে
একি চঞ্চলতা পবনে'

সুরটির মধ্য দিয়েই যেন বসন্তের আগমন চিত্রিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের যে গানগুলি সৌন্দর্যসৃষ্টি করেছে সেগুলি প্রকৃতপক্ষে মনে হয় তিনি যেন সুর দিয়ে ছবি এঁকেছেন।

'প্রভু আজি তোমার দক্ষিণ হাত রেখো না ঢাকি।'

এই গানটি কীর্তনাঙ্গের পূজাপর্যায়ের গান। তথাপি গানটি শুনলেই যে মনে ভক্তিভাব জাগায় তা কিন্তু নয়। প্রথমেই যা শ্রবণেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে তা হল এর সুর। অপরূপ সুয় যাকে সুন্দর বলা যায না, চঞ্চল বলা যায় না, গভীরতরভাব ব্যঞ্জনা মণ্ডিত, এক কথায় বিশেষণ দেওয়া যায় না, অর্থাৎ বিচিত্র।

গানে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য এবং গীতিনাট্য পর্যায়ের সখীদের গানগুলি। এই গানগুলির তুলনা হয় না। গানের নায়ক নায়িকা অনেক সময় ভাবগম্ভীর কথা বলেছে গানের মধ্য দিয়ে, কিন্তু সখীদের গান কতকগুলি আছে বিশেষ মুহূর্তের। সেগুলি সুরবৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

যেমন :

'অলি বার বার ফিরে যায়'
'এস এস বসন্ত ধরাতলে'
'আহা আজি এ বসন্তে'
'নব বসন্তের দানের ডালি'

ইত্যাদি বহু গান।

আর এক ধরনের গান আছে যেগুলির মধ্যে ছন্দ আছে সেইজন্যই গানগুলি সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে যেমন ভানুসিংহের পদাবলীর গানগুলি। এছাড়া আছে অন্য ধরনের গান, যেমন :

'ওগো বধূ সুন্দরী তুমি মধু মঞ্জরী'

'তোমায় সাজাব যতনে'
'এসো এসো তৃষ্ণার জল
কল্‌কল্‌ ছল ছল'

আরেকটি বিশেষ ধরনের গান আছে, যেমন :

'মনোমন্দির সুন্দরী ! মণি মঞ্জীর গুঞ্জরি,
স্খলদঞ্চলা চলচঞ্চলা ! অয়ি মুঞ্জলা মুঞ্জরী ।"

গানটিতে আছে শুধু যুক্তক্ষরের চমকে চমকিত বিশেষণ । সুর এক ধাঁচের কিন্তু ছন্দ এবং সুরে এক বিশেষ সাংগীতিক ঐশ্বর্য সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে ।

এছাড়া কোনও গানে দুটি তিনটি তালের সহযোগে গানটিতে এক ভিন্ন ঐশ্বর্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । এ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে যেমন :

'নৃত্যের তালে তালে' ।

একটি গানে দু'তিনটি রাগের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, শ্রী সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর তা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন ।[৪১] এই গানগুলির মধ্যে সার্থক রাগের মিশ্রণে এক অপরূপ সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে । ফলে প্রত্যেক শ্রোতার কাছেই এই গান গ্রহণীয় । এই গান শোনার জন্য রাগের বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না । যেমনই 'চক্ষে আমার তৃষ্ণা' গানটিতে সারঙ-এর সঙ্গে মল্লার ও কানাড়ার মিশ্রণ হয়েছে । 'প্রখর তপন তাপে' গানে ভিমপলশ্রী, মুলতানী ও ভৈরবীর মিশ্রণ হয়েছে । রবীন্দ্রনাথ এখানে ভাবকেই আশ্রয় করেছেন রাগকে নয় ।

বিশুদ্ধ রাগভিত্তিক গানের চেয়ে মিশ্র রাগের গানগুলিই কবির বিশেষভাবে আদরণীয় হয়েছে কারণ এই গানগুলি শ্রোতার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে বেশি । শ্রীশুভ গুহঠাকুরতা রবীন্দ্রসংগীতের ধারাকে সাল অনুযায়ী সাজিয়েছেন ।[৪২] এই তালিকা অনুযায়ী গানগুলি অনুসরণ করলেই আমরা বুঝতে পারি, কবি কি করে ধীরে ধীরে রাগ রাগিনীর বাধা, সুরের বাঁধাধরা নিয়ম, আধ্যাত্মিক চেতনা সমূহকে অতিক্রম করে ক্রমশ অনির্বচনীয় সুরের জগৎ তথা কাব্য সংগীতের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছেন । বৈচিত্র্য এসে গিয়েছে সুরে এবং কথায় । দীর্ঘ জীবনের সাধনার পরে কবি যে গানগুলি তাঁর পরিণত বয়সে রচনা করলেন দেখা গেল শ্রোতার হৃদয়ে স্থান পেয়েছে সেই গানগুলিই ।

রচনার শেষ বার বৎসরেই তিনি শ্রেষ্ঠ কাব্য সংগীতগুলি রচনা করেছেন যেমন ১৯৩১ সালে

'বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক'
'যখন মল্লিকা বনে প্রথম ধরেছে কলি'
'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে'

এবং আরও অনেক গান
১৯৩৩ সালে

খরবায়ু বয় বেগে—সারী গানের সুরে,
ডাকব না ডাকব না—বাউল সুরে ইত্যাদি

১৯৩৪ সালে

'মায়াবন বিহারিণী হরিণী'
'হে সখা বারতা পেয়েছি'
'দূরের বন্ধু সুরের দূতীরে'

এর পর ১৯৩৭ সাল, ১৯৩৯ সাল শ্রেষ্ঠ গানের সমন্বয় এই বৎসরগুলি।[৪৩] বোঝা যায় কবি তখন সংগীতের স্বরূপকে উপলব্ধি করেছিলেন। যে গানগুলি সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন হয় পরিণত ধারণা সৃষ্টির আকুলতা এবং কল্পনা।

কবির প্রথম যৌবনের কতকগুলি গানে কবি নিজ সৃষ্টিতে পরিতৃপ্ত হতেন এরকম কতকগুলি গান

'আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে'
'মরিলো মরি'
'তোমার গোপন কথাটি'
'কাঙাল আমারে কাঙাল করেছ'
'বড়ো বেদনার মতো বেজেছ
'আমার মন মানে না'

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই গানগুলির মধ্যে কাব্য সৌন্দর্যই বেশি। যদিও 'তোমার গোপন কথাটি' গানটি কীর্তনাঙ্গের তথাপি। অর্থাৎ কবি কাব্যসৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন সুরের মাধ্যমে এবং এই ধরনের গানগুলিই জনচিত্তে স্থান

পেয়েছে অধিক পরিমাণে। কবির গানের বৈশিষ্ট্যই যেখানে যে গান এবং তার সুর তাঁর কানে এবং প্রাণে সাড়া জাগিয়েছে সেই সুরই তিনি সংযোজন করেছেন তাঁর গানে এবং কবিতায়।

অতুলপ্রসাদ প্রভৃতি গীতি কবিদের সমালোচনা করেছেন পূর্বতন সংগীত রসিক এবং গবেষকরা।

অতুলপ্রসাদ ছিলেন ভক্ত। রাধাকৃষ্ণের প্রতি ছিল তাঁর ভক্তি আবাব ব্রাহ্মধর্মের প্রতিও ছিল তাঁর ভক্তি সেই সঙ্গে ছিল এই ধর্মের প্রতি অচল নিষ্ঠা কিন্তু সেই ভক্তির কোনও ছাপ বা প্রভাব তাঁর গানে পড়েনি। তাঁর গানে ভক্তিভাব ও প্রেমভাব দুইই বিরাজ করে, কিন্তু তাঁর প্রেমের গানগুলিই অধিকতর জনচিত্তহারী কারণ প্রেমের গানগুলি তাঁর বিশেষ মানসিক অবস্থায় সৃষ্টি।

বিনয়েন্দ্র দাশগুপ্ত বলেছেন,

"অতুলপ্রসাদ হৃদয়বান ও আকুতিপূর্ণ ভাবুক আর অধ্যাত্ম ভাবনা পুষ্ট, রবীন্দ্রনাথ মিষ্টিক ও নিরন্তর তত্ত্বপিপাসু।"[৪৪] ধূর্জটিপ্রসাদের মতে অতুলপ্রসাদের গানে ঠুংরী, গজল, বাউল, কীর্তন, ভাটিয়ালী অথচ সকলের মধ্যেই হিন্দুস্থানী রাগ রাগিণীর ছোঁওয়া।

অতুলপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ সকলেই লোক সংগীতকে বিশেষভাবে আশ্রয় করেছিলেন। এ বিষয়ে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন,

অতুলপ্রসাদের প্রথম যুগের গানগুলিতে বাঙালীর টপ খেয়ালের, রবীন্দ্রসংগীতের ও বাউল, কীর্তন, রামপ্রসাদী, ভাটিয়ালী প্রভৃতি বাংলার লোকসংগীতের সুরগুলির প্রভাব যথেষ্ট। টপ খেয়ালের 'সোহাগে মৃণালভুজে' এই গানটির সুরে ও ঢঙে 'কেন যে গাইতে বলে' গানটি বাঁধেন।'[৪৫]

শ্রী অরুণ বসু বলেন,

'তাঁর কাব্যসংগীতগুলি একদিকে উনিশ শতকের নিধুবাবু, হরু ঠাকুর, শ্রীধর কথকের প্রীতিগীতি, ব্রাহ্ম গীতকারদের ভক্তি সংগীত এবং রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের রোমান্টিক কাব্যসংগীতগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত।"[৪৬]

শ্রীদিলীপ রায় বলেছেন :

"বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখিপাতে' নামক বেহাগ গানটিতে যে রসটির পরিচয় পাই তা এত করুণ মধুর হয়ে উঠেছে প্রধানত এইজন্য যে তার মধ্যে বাংলার কবিত্ব ও বৈষ্ণব কবির চিরন্তন চিরতম বিরহ গানের সুরের সঙ্গে খাঁটি হিন্দুস্থানী বেহাগের এক অপরূপ মিলন সাধন করা হয়েছে।[৪৭]

শ্রোতারা অধিকাংশই হিন্দুস্থানী গান এবং লোকসংগীতের সুরের অন্তর্নিহিত ভাবের সঙ্গে পরিচিত নন। কিন্তু অতুলপ্রসাদ ও নজরুলের মত একাধারে গায়ক এবং রসজ্ঞ ব্যক্তি'রা অপরিচিত সুরের সঙ্গে নিজেদের কাব্য ক্ষমতার মণিকাঞ্চন যোগ ঘটিয়েছেন ফলে তাঁদের গানের সুর সর্বজনীন হয়ে উঠেছে।

নজরুলের ক্ষেত্রে কথাকটি আরও বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। নজরুলের ছিল বৈরাগ্য সুলভ মনোভাব। চলার পথের প্রতিটি সুরকে তিনি নিজের মধ্যে গ্রহণ করে বাংলা গানের ঐশ্বর্য বাড়িয়েছেন। যদিও নজরুল বহু গান কালীকে উপলক্ষ্য করে লিখেছেন তথাপি নিঃসন্দেহে বলা যায় তাঁর কাব্য সংগীতগুলিই অধিকতর মনোহরণকারী তার কারণই হল কথা ও সুরে একাত্মতা।

যেমন একটি গান :

সাপুড়িয়া রে ! বাজাও বাজাও
সাপ খেলানোর বাঁশী,
... ...

শন্ শন্ শন্ শন্ পূব হাওয়াতে
তোমার বাঁশী বাজে বাদলারাতে
মেঘের ডমরু বাজাও গুরু গুরু বাঁশীর সাথে,
... .)
একি বাঁশী বাজালে কালা সর্বনাশী।

গানটির কথার ভাবে বুঝা যায় তিনি কৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন। কিন্তু ভক্তিরস এখানে অনুপস্থিত তার পরিবর্তে লোকসংগীতের সুরে গানটি যেন এক গ্রাম্যসৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলেছে এবং সেই সৌন্দর্যটুকুই এই গানের প্রাণ। এই সৌন্দর্য কোনদিনই ফুরিয়ে যায় না।

অতুলপ্রসাদের পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত ছিল তাই সংগীত ছিল তাঁর প্রাণ। রবীন্দ্রনাথ এবং অতুলপ্রসাদের যেমন ভগবৎ প্রেম এবং মানব প্রেম একাকার হয়ে গিয়েছে গানের ক্ষেত্রে, নজরুলের কিন্তু তা নয়। নজরুলের ভক্তিগীতি বিশেষভাবে সুরে এবং কথায় চিহ্নিত। নজরুলের সহজ ছন্দে এবং সুরে কবিতার ধরনে যে গানগুলি গীত হয়েছে সেইগুলিই জনপ্রিয় হয়েছে বেশি। সুরের পরীক্ষায় তুলনামূলকভাবে রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ এবং নজরুলের মধ্যে নজরুলই সফল।

এঁদের তিনজনের থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক। তাঁর

কাব্যসংগীতগুলি অধিকাংশই প্রকৃতির সবুজরস আহরণ করে নিজেরা চিরসবুজরূপে প্রতিষ্ঠিত। বাংলার কাব্যসংগীতই যে একদিন বেঁচে থাকবে একথা বলেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর এবং রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন যে তাঁদের কাব্য সংগীতগুলি কালজয়ী হবে. আশ্চর্যের বিষয় রবীন্দ্রনাথ. অতুলপ্রসাদ. নজরুল. দ্বিজেন্দ্রলাল সকলেই শ্যামাসংগীত রচনা করেছেন। কেউ কম কেউ বেশি।

দ্বিজেন্দ্রলালের শ্যামাসংগীতের সঙ্গে নজরুলের শ্যামাসংগীতের কোনও মিল নেই। নজরুল প্রধানত মায়ের রূপ বর্ণনা করেছেন কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার ভঙ্গি ছিল অন্য।

যেমন :

'এবার তোরে চিনেছি মা আর কি
শ্যামা তোকে ছাড়ি ?
ভবের দুঃখ ভবের জ্বালা পাঠিয়ে
দিচ্ছি যমের বাড়ী।"

দ্বিজেন্দ্রলালের উল্লেখযোগ্য রচনা হল হাসির গান। হাসির গানও যে রসোত্তীর্ণ এবং কালোত্তীর্ণ হতে পারে তার প্রকৃষ্টতম প্রমাণ হল দ্বিজেন্দ্রলালের গান। সেই সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রহণ করেছেন পাশ্চাত্য সুর।

এ বিষয়ে দিলীপ রায় বলেছেন :

"দ্বিজেন্দ্রলালই প্রথম আমাদের সংগীতের মধ্যে বৈদেশিক প্রাণশক্তির নিবিড়তায় রসদ্যুতি আবাহন করে ভারতীয় আত্মিক সুরের সঙ্গে বৈদেশিকী ওজঃশক্তির সমন্বয়ে এক অপূর্ব রসের সৃষ্টি করেছিলেন যার ফলে তাঁর সুরের নানা বৈদেশিকী চলাফেরাকে অচেনা মনে হয় না তাই নয়, বিদেশীরাও তাঁর সুর শুনে বলতে বাধ্য হয়।

'একি ! এসব অচিনসুরও যে আমাদের কণ্ঠে সহজেই বলে।"[৪৮]
দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যগীতিগুলিও অসাধারণ।

যেমন :

'আমি সারা সকালটি বসে বসে এই সাধের মালাটি গেঁথেছি'
'আমরা এমনি এসে ভেসে যাই'

ইত্যাদি বহু গান।

বাংলার সুরে অনুকরণের ঢেউ বয়ে গেলেও এই গানগুলি তার নিজের জায়গায় ধ্রুবতারার মতই অম্লান থাকবে।

দ্বিজেন্দ্রলালের ভক্তিগীতিগুলি অন্য ধরনের, মনে হয় তিনি যেন ক্লান্ত অবসন্ন, প্রকৃতই তিনি যেন সেই পরমসত্তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে চান যেমন :

'আঁধার ছেয়ে আসে ধীরে, বাহু দিয়ে নাও মা ঘিরে,
ঘুমিয়ে পড়ি এখন আমি মা তোমার ঐ বুকের মাঝে।

আর একটি গান,

'নীলাকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেল চাঁদের আলো'

সবার শেষে

'এখন বড়ই শ্রান্ত আমি ও মা কোলে তুলে নে না,
যেখানে ঐ অসীম সাদায় মিশেছে ঐ অসীম কালো'

রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, নজরুল, দ্বিজেন্দ্রলাল এঁরা প্রত্যেকেই 'মা'কে উদ্দেশ্য করে গান রচনা করেছেন তথাপি আমরা দেখি রামপ্রসাদের যেমন 'মা' ধ্যান এবং জ্ঞান সেই রকম এঁরা কিন্তু কেউই ভক্তিগীতি রচনার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেননি। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে এঁরা স্বচ্ছন্দও হতে পারেননি, যদিও কথা অতুলনীয়। প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত চারজনই ছিলেন সৌন্দর্যের উপাসক। সৌন্দর্যের মধ্য দিয়েই আনন্দপ্রাপ্তি একথা তাঁরা কেউ কেউ সজ্ঞানে উপলব্ধি করতেন কেউ কেউ অবচেতনে তবে তাঁদের সৃষ্টিই তাঁদের পরিচয়।

প্রকৃত পক্ষে ভক্তিগীতির মধ্য দিয়ে কিছুটা সমাদৃত হয়েছেন রজনীকান্ত। একান্তভাবে আত্মসমর্পিত গানগুলির মধ্য দিয়েই তিনি নিজেকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছেন। রজনীকান্ত ঈশ্বরকে সম্বোধন করেছেন। তবে 'মা' এর চেয়ে তিনি পুরুষাকারকেই আশ্রয় করেছেন এবং সেই করুণাময়ের কাছে এবং তাঁরই ছায়াতলে বার বার আশ্রয় গ্রহণ করবার বাসনা জানিয়েছেন। রামপ্রসাদের মত রজনীকান্তও প্রতীক শব্দ ব্যবহার করেছেন। তবে প্রতীকের ব্যবহার তাঁর কবিতাতেই বেশি। প্রতীক অল্প ব্যবহারের জন্যই রজনীকান্তের গানের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধুমাত্র ভক্তিগীতি শুধুমাত্র ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদন সে রকম গানও তো বহু আছে কিন্তু সব গানই তো যুগোত্তীর্ণ হয় না। কিন্তু রজনীকান্তের

গানগুলি তাঁর নিজের সময় সীমাকে ছাড়িয়ে নতুন যুগেও সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে, তার কারণ কবি একাধারে অবিমিশ্র ভক্ত, কবি অথচ রসিক, অনুভূতিশীল ও ভাবপ্রবণ। যে গুণগুলির দ্বারা নিজের সৃষ্টিকে কালোত্তীর্ণ করা যায় সেই গুণগুলি তাঁর ছিল। সকল দেশেই স্বদেশী গানগুলি উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহৃত হয় ও কিছুদিন পরেই লয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু রজনীকান্তের স্বদেশী গানগুলি তা নয়। যেমন 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' এই গানটি। এই গানটি সম্বন্ধে তৎকালীন কঠোর সমালোচক সুরেশ সমাজপতি মহাশয় বলেছেন, "যে গান দৈব বাণীর ন্যায় আদেশ করে এবং ভবিষ্যদ্ববাণীর মত সফল হয়, ইহা সেই শ্রেণীর গান।"

আর একটি উদাহরণ হল :

'তব চরণনিম্নে উৎসবময়ী শ্যাম ধরণী সরসা' ইত্যাদি। এই গানটির মধ্য দিয়ে সমগ্র বাংলা দেশের রূপটি ফুটে উঠেছে।

ভক্তিগীতিতে রজনীকান্ত স্বতঃস্ফূর্ত। প্রধান কথা সেই পরম অস্তিত্বকে যে, যে রূপেই দেখুন, প্রকৃত পক্ষে সৌন্দর্য উপলব্ধিই চরম কথা।

রজনীকান্ত যখন বলেন "যে দিন তোমারে হৃদয় ভরিয়া ডাকি,
শাসন বাক্য মাথায় করিয়া রাখি ;

অথচ সবার শেষে কিন্তু সকলেরই এক বক্তব্য
সুন্দর, তব সুন্দর সব
যেদিকে ফিরাই আঁখি।"

রজনীকান্তও দ্বিজেন্দ্রলালের মত 'মা'কে সম্বোধন করে গান রচনা করেছিলেন। ফললাভ তাঁদের দুজনের ক্ষেত্রে একই। ভক্তিগীতি আর শ্যামাসংগীত যে এক নয় তা এঁদের গান অনুধাবন করলেই বোঝা যায় আবার এঁরা যে 'মা' বলতে সর্বক্ষেত্রেই শ্যামা রূপটিকেই বুঝিয়েছেন তাও নয়।

রজনীকান্তের একটি গান

'চরণ ধরে আছি পড়ে একবার চেয়ে দেখিস্ না মা'

এই গানের ভাবরূপটি দ্বিজেন্দ্রগীতির অনুরূপ।

এঁদের পরেই সুরস্রষ্টা রূপে বিশেষ ভাবে শ্রীদিলীপ রায়ের নাম উল্লেখ করা যায়।

হিন্দী ভাঙ্গা বাংলা গান পরিবেশনে এবং রচনায় শ্রীদিলীপকুমার রায়ের নাম একটি ইতিহাস। যেহেতু তিনি হিন্দুস্থানী সংগীতের একান্ত অনুরাগী ছিলেন

সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলালের গানে তান সংযোগ করার পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকেরই আপত্তি থাকায় তিনি সেই কাজে সফল হননি। অবশ্য তার কোনও প্রয়োজন ছিল না। কারণ কিছুকাল পরেই স্বরচিত গানে তান, টপ্‌পা, আখর সব কিছুরই আবির্ভাব ঘটালেন। আশ্চর্যের বিষয় তাঁর প্রত্যেকটি গানই সুরে ও ভাষায় এক অসামান্য ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে যা শোনামাত্র শ্রোতার মনে দোলা দেয়। তাঁর মতে ইন্দিরাদেবী ধ্যানমগ্না অবস্থায় বহু গান করেছেন যেগুলি সেই সময়ে ইন্দিরাদেবীর আয়ত্তাধীন ছিল না। দিলীপ রায় সেই সব গানেরও বাংলা অনুবাদ করেছেন। অনেক গানের আক্ষরিক অনুবাদ না হলেও ভাবানুবাদ আছে। তাঁর হৃদয়ের ভক্তি ও শৈল্পিক প্রকাশ দুইয়েরই অপরূপ সংযোগে বাংলার সংগীতের ইতিহাসে নিজের চিরস্থায়ী আসন আপন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর গানের সৌন্দর্যের অংশও তাঁর পূর্বসূরীদের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়।

পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক জাতির মধ্যেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়, জাতীয় সংহতি শক্তিশালী করতে সংস্কৃতি মূলক ক্রিয়াকলাপের স্থান অগ্রগণ্যরূপে ধরা হয়। কিন্তু সচরাচর দেখা যায় এই প্রতিষ্ঠানগুলি কলাক্ষেত্রে প্রচারমূলক হয়ে দাঁড়ায়। কলাশিল্পের আবেদন জনমানসে অনস্বীকার্য, কিন্তু এর জন্য শিল্পসৃষ্টির স্বাধীনতা হরণ যেমন চিন্তাক্ষেত্রে দৈন্যের পরিচায়ক তেমনই এগুলি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় জাতীয় সংহতিকে জোরদার করে গড়ে তুলবার জন্য অব্যর্থ করে তোলার প্রয়াসও অপ্রশংসারযোগ্য। দেখা যায় বহু ক্ষেত্রেই সৃজনধর্মী প্রতিভা প্রচলিত শাসন ও সমাজ ব্যবস্থায় সমালোচনার পাত্র হয়। রাশিয়ায় সামাজিক চিন্তাধারার সঙ্গে যোগসাধন করতে বাধ্য করে অনেক শিল্পীকে নিগৃহীত করা হয়েছে।

কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে মধ্যপন্থা বলে কিছু নেই। সৃষ্ট কর্মের পুরোধায় দাঁড়িয়ে শিল্পীকে জাগ্রত মনিসপটে আবেদন পৌঁছে দিতেই হয়। ভারতের বর্তমান আধুনিক সংগীত যা বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার ফসল, তাতে বিদেশী বাদ্যযন্ত্রের প্রভূত ব্যবহারের জন্য সমালোচনা দেখা যায়। কিন্তু ভারতের নৃত্যগীতের ক্ল্যাসিক্যাল ভাবধারা বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি গৃহীত হচ্ছে যেমন বিদেশী সমাজে, সেই সময় বিদেশী রীতিনীতি ভারতবর্ষ গ্রহণ করলে তাতে দোষের কিছু নেই। দেশীয় মূলধন সম্বল করে, শুধুমাত্র চিরন্তনী সংগীত প্রথারই উৎকর্ষসাধন করতে হবে, শিল্পীর পক্ষে এরকম কোনও নিয়ম মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তাই শিল্পক্ষেত্রে স্বাধীনতা কথাটি মানতেই হয়। দুঃখ দৈন্য হতাশাকে অঙ্গের ভূষণ করেই শিল্পীকে এগিয়ে দাঁড়াতে হয়।

চিরন্তন রীতিনীতি মেনে চলতে হয়, গতানুগতিককেও সুষ্ঠুরূপে তুলে ধরতে হয় এইগুলি প্রাথমিক কর্তব্য। কিন্তু আধুনিকতার পথ সর্ব নিয়ম লঙ্ঘনকারী, তাই এই পথে সার্থক শিল্পী হতে হলে চাই প্রখর বুদ্ধি ও জ্ঞান। রবিশংকর, উদয়শংকর প্রভৃতি বিদেশে ভারতীয় সংগীতের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু ভারতের মৃত্তিকায় বিদেশের প্রভাব আজও অবহেলিত, অস্পষ্ট। সেই দূরকে নিকট করবার বিদেশীয় সম্পদ নিজের প্রাণের সম্পদরূপে গড়ে তোলার দায়িত্ব ভারতীয় শিল্পীদেরই। শুধু যে ভারতীয় সংগীতে পাশ্চাত্যের রীতির মিলন ঘটাতে হবে তা নয়, ভারতের সংগীত সাধনার ক্ষেত্রে অনেক ক্রিয়াকৌশলই লুপ্ত প্রায়, সেই লুপ্ত ভাবধারাকেও সঞ্জীবিত করে তুলতে হবে বৃহত্তর প্রাণপ্রতিষ্ঠায়।

সংগীত কাব্য এবং কবিতার সঙ্গে জড়িত। শব্দ বা সুর ইন্দ্রিয়ানুভূতি দ্বারা প্রকাশ্য। কবিতার ছন্দ, সংগীতের তাল, উচ্চারণধ্বনির সুস্পষ্টীকরণ প্রয়োজনীয় যাতে রস ও ভাব বিকাশযোগ্য হয়ে ওঠে।

কাব্যচিন্তার মধ্যে যে সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হয় সংগীতে তা অনুপস্থিত। অর্থ তুলে ধরাও গৌণ বৃত্তি। শব্দসমূহের দ্বারা মধুর বাক্যাবলীও সংগীত প্রকাশ করে না। পক্ষান্তরে ভরতমুনির ভাষায়,

"ন চ তানি প্রযোজ্যানি হতশোভানি তানি হি
যাস্য এ প্রতিসিদ্ধানি গীতকে তানি যোজয়েত।"

অর্থাৎ কবিতার মধ্যে যেগুলি অলংকার লঙ্ঘন খণ্ডিত হয়, সেগুলিই সংগীতের উপাদান। সংগীত শুধু কর্ণের তৃপ্তিদায়ক নিমিত্তমাত্র নয়, ভাব উদ্দীপনা প্রকাশের সৌন্দর্যানুভবের মধ্যে লুপ্ত হয়ে যাওয়া যা ভাষায় প্রকাশের অসাধ্য।

'বাণি বাক্যোস্তু ন ব্রয়াত্তানি গীতেরুদাহরেত'

কাব্যে বা কবিতায় সুরে উচ্চ নীচ আবৃত্তিতে ভাবের এক একটি প্রতীক নিঃসৃত হয়। সুতরাং ভাবের ধারণাগুলি এক একটি চিহ্ন দ্বারা বিবেচিত হয়। কবিতায় বহিঃপ্রকাশ এবং উদ্দেশ্য যুগপৎ জড়িত। কল্পনা জড়িত মনই সেইগুলি ধারণা করতে সক্ষম হয় এবং তাদের মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় কিন্তু সংগীতের সুর সহজেই ভাবপ্রকাশী মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে। এর মধ্যে কোনও চিহ্ন বহনের প্রকাশ নেই আছে মর্মোদ্ঘাটন। অন্তরের আবেগ হৃদয়ের তলদেশ থেকে উত্থিত হয় কোনও ধ্যান ধারণার অপেক্ষা না করেই। তাই শুধু কবিতা কেন, ভাষা ব্যতীত স্বরেও সংগীত আপনাকে ফুটিয়ে তোলে। কবিতায় যে আলোড়ন সম্যক দরদ সৃষ্টি করতে সক্ষম, সেখানে দরদীও একই পথের হন, তার মন বুদ্ধিদীপ্ত,

চিন্তাকুল থাকে প্রকাশ বেদনা বুঝবার জন্য। কিন্তু সংগীত যে প্রাণ মাতানো বন্যা বইয়ে তোলে তাতে নিমজ্জমান হওয়ার জন্য সর্বকালিক অভিজ্ঞতা, প্রথা নিরপেক্ষ হয়ে ওঠে। তাই সংগীতের দ্বারা শিশুও বশ হয়, বন্য পশু সুতৃপ্ত নয়ন তুলে ধরে, বিষধর সর্পও নতমস্তক হয়। তাই শৈবাগম শাস্ত্রে সংগীতে সমস্ত শব্দেরই শেষ পরিণতি স্বর সংযোগে উত্তীর্ণ। সমগ্র বিশ্বই পরম শক্তির সহিত সংশ্লিষ্ট। বিশ্বপিতা বহুকে একত্রীভূত করে বিরাজিত।

উচ্চারিত স্বরধ্বনি (বাচক) এবং যে বস্তুসমূহের আকর্ষণে সেই শব্দ উচ্চারিত (বাচ্য) এই উভয় শক্তির দ্বারাই বিশ্ব বিভাজিত। বাক্যই এখানে বিবেকের আলোকে প্রকাশিত হয়, বাচক এখানে স্বতন্ত্র বিমর্ষ। সৃষ্টিতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব এবং নন্দনতত্ত্বের ওতপ্রোত সম্পর্ক এবং প্রভাব যেখানে সেই বিশ্ব, প্রতিবিম্ববাদ তত্ত্বে একথা বিবৃত হয়েছে। আর্শীতে কোনও একটি বিশেষ বিম্বের অবিকল প্রতিবিম্বই ধরা পড়ে। কোনও বিশেষ ভাবের, জ্ঞানের বা সৃষ্টির সমষ্টিগত ঐক্যই বিশ্বের কল্পনীয় পরম আধার রূপ। নন্দনতত্ত্ব বিচারের ক্ষেত্রে এই বিম্ব প্রতিবিম্ব মতবাদ কোনও বিশেষ সুখ দুঃখের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে। উদ্দেশ্য হল পূর্ণভাবে উপলব্ধির ফলপ্রাপ্তি যা পাশ্চাত্যের বিশোধক ক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অভিনবগুপ্ত শৈবমতবাদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্বাতন্ত্র্যের কথা ব্যক্ত করেছেন কেননা সেই পরম (আল্টিমেট) হল অবিভাজ্য এবং গতিশীল। সেই পরম হল স্বতন্ত্র, অস্তিত্ববিহীন। দুঃখ বা হর্ষকে যখন আমরা গ্রহণ করি তখন তাকে ব্যক্তিস্বাধীনতার বাইরে রেখে বিচার করতে পারি না। নিরাসক্তভাবে উপাদান এবং উদ্দেশ্যসমূহ গ্রহণ করতে পারলে এবং মুক্তরূপ দৃশ্যজগতের বিষয়বস্তু গ্রহণ করলে তখন শিল্পে বিশেষ করে সংগীতে যে কল্পনা জাগায় তা থেকেই বিশ্বচেতনায় প্রকৃত আনন্দের স্বাদ জাগরিত হয় দাতা ও গ্রহীতার চিত্তাকাশে, হৃদি মাঝে সংগীতের শিশুরূপ তখনই প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে।

'আমি আকাশে পাতিয়া কান
শুনেছি শুনেছি তোমারই গান'

অভিনবগুপ্ত তাই জানিয়েছেন,

"গীতাদি বিষয় স্বাদানম সৌ খ্যৈকতাত্মনঃ
যোগিন স্তম্ভয়স্তেন মনোরূয়েস্তদাত্মতা ॥"

নাদসমূহ তিন অবস্থায় থাকে। পশ্যন্তি, মধ্যমা এবং বৈখরি। অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম ও পরা (ট্রানসেনডেন্টাল)। এই ভাবে নাদব্রহ্মবাদের সৃষ্টি।

পশ্যন্তি ও মধ্যমার সহযোগে সংগীতের যে সূক্ষ্মরূপ প্রকাশমান হয়ে ওঠে সে

ক্ষেত্রে একটি মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া পদ্ধতি সক্রিয়রূপে দেখা দেয়। আগ্রহ ও ইচ্ছা গায়ককে গভীর হতে গভীরে টেনে নেয়, সুর বৈখরির সূক্ষ্ম ক্রিয়াকলাপের দ্বারা সংগীত হতে থাকে। গায়ক এবং শ্রোতার অভীষ্টলাভের পথ সুগম হয়। সংগীত তখন অন্তিম অবস্থা উপলব্ধি করায় এবং আনন্দোপলব্ধি ঘটিয়ে তোলে। কাণ্ট এই অবস্থাটিকেই কারণে (রিজন) বা অন্তিমের রাজ্যে (কিংডম অব্ এণ্ডস্) পৌঁছান বলেছেন।

ইওরোপীয় সংগীতে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। ব্যারাক সংগীত ধারার গবেষণা বর্তমানে অস্তি-নাস্তি বিচারমূলক পদ্ধতিতে (ডায়ালেকটিক্যাল) এসেছে। বিটোফেন হতে শোয়েনবার্গ পর্যন্ত এই বিবর্তন প্রাচীনকালের বহু রীতিতে পরিবর্তন ঘটিয়েছে এবং প্রকাশই সংগীতের উদ্দেশ্য এই মতবাদটিও প্রচলিত হয়েছে। শিল্পীরা নিজেদের কর্মে বহু পরিবর্তন সাধন করেছেন। হেইদেন-এর সংগীত সৃষ্টি এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক, জগতের সম্পর্ক নূতন করে দেখানোর প্রয়াস ঘটিয়েছেন শিল্পীরা নিজেদের ধারণাসম্ভূত কল্পরূপ দিয়ে। মার্কসের দর্শন অর্থাৎ রোমাণ্টিসিজ্যম্-এর পরবর্তী যুগে ঐতিহাসিক নিমিত্তবাদ (হিসটোরিক্যাল ডিটারমিনিজম্)-এর ব্যাখ্যাও সংগীতশাস্ত্রে এসেছে এবং প্রকাশের ব্যুৎপত্তিতে আলোড়ন জাগিয়েছে।

রাশিয়ার একজন প্রধান সংগীত স্রষ্টা স্বর্গীয় ডিমিটি শোস্টাকোভিচ্ বর্তমান যুগে সিমফনির মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে সংগীত বিপ্লব এনেছেন। সোভিয়েত চিন্তাধারায় জনগণের অবস্থাকে উপজীব্য বিষয় বলে গণ্য করা হয়।

শোস্টাকোভিচ্ ব্যঙ্গ বিদ্রূপের সুরে দেশের অবস্থা ফুটিয়ে তুলেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে লেনিনগ্রাড-সিমফনী সৃষ্টি করে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিলেন। শোস্টাকোভিচের চিন্তাধারা হেগেলের মতানুবর্তী নয়, অর্থাৎ তাঁর মতে শিল্প যে বিবেককে পূর্ণতার পথে এগিয়ে নিয়ে যায় তা নয়। তাঁদের মতে সংগীত সৃষ্টিকল্পে সৃষ্টিতত্ত্ব যে অংশ গ্রহণ করে তাকে তাঁরা বলেন ঐতিহাসিক এবং শ্রেণী সচেতনতার (হিস্টি এ্যাণ্ড ক্লাস কনশাসনেস্) উপর নির্ভরশীল।

কিন্তু ইতিহাস তো সমাজকেই তুলে ধরে। সমাজের ধর্মতত্ত্ব, লৌকিক আচার ব্যবহার সংগীত হতে বিচ্যুত হলে আবেগ সমূহর রূঢ়রূপে দেখা দেওয়াই সম্ভব। ইতিহাস বিকৃতভাবে ফুটে উঠতে পারে এবং সৌন্দর্য বিচারে নিকৃষ্ট বিবেচিত হতে পারে। শিল্পীর সৃষ্টি তো মানুষের ভোগসুখের আকর সৃষ্টি করা নয়, প্রকৃতির মধ্যেকার বিষয়কে অপ্রাকৃত করা। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা সমাপন।

শিল্পকর্মের সর্বজনীন রূপসজ্জায় অপরিহার্য শিক্ষণীয় বিষয় হল বিনিময়

পদ্ধতি। কোনও সংগীতই এখনও পর্যন্ত জাতিধর্মনির্বিশেষে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে নি। বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজের আচরণ বা স্বভাব দ্বারা গঠিত মানব সমাজ একত্রিতভাবে ক্রিয়াটির কোনও বিশেষ দিক মনে গেঁথে নেন এবং সামগ্রিকভাবে যে মনোভাব প্রকাশিত হয় তাকে বলা হয় সমাদর। সমাদর কথাটি ভাল, মনোরম বা সুন্দরের পরিভাষাগত শব্দার্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যাবে না। শিল্পীর নিকট শিল্পসাধনার মর্ম জানা থাকলে সর্বজনীন ক্ষেত্রে সাড়া জাগাবেই। ভাল বা মোটামুটি মনোরম বা সুন্দরভাব কিংবা ব্যর্থতাবোধ এই মানসিকতার কাছাকাছি মনোভাব জাগিয়ে তুলবে।

যে শিল্পসৃষ্টি রীতি বা গুণসম্পন্ন নয়, অতি সহজেই বা ইচ্ছাকৃতভাবে অভিজ্ঞতাসমূহ অর্বহেলায় ধরা যা চটকদার, নারকীয়ভাবে বিরস সৃষ্টিকারী বা ক্ষণিকের চিত্ত সুখ সৃষ্টিকারী বা উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে প্রযুক্ত তা ভিন্ন পরিবেশে বা ভিন্ন শিল্পগোষ্ঠীর নিকট সহজেই ধরা পড়ে এবং সেই সৃষ্টি অনাদৃত হয়।

সমাদৃত বা অনাদৃত শব্দ যুগ্মের মধ্যে বিউটিফুল বা আগলি, সুন্দর বা অসুন্দর প্রভৃতি প্রচলিত স্তুতি নিন্দা শব্দ সমূহের ঐক্য বা মতানৈক্য দেখান উদ্দেশ্য নয় শুধু মাত্র একটি সহজসত্য সংস্থাপনের প্রয়াস। কারণ এখনও পর্যন্ত শিল্প শুধুমাত্র শিক্ষিত সমাজের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়রূপেই গণ্য হয়ে চলেছে।

আধুনিকেরা এই যুক্তি নিয়ে এগিয়েছেন শিল্প একটি আকার (ফর্ম) লাভ করে যেহেতু সেই আকার হল জীবনের ছাঁচ (ফর্ম অব্ লাইফ)। কিন্তু জীবন ছাড়াও সূর্য, চন্দ্র, তারকা পরিবর্তনশীল প্রকৃতি ইত্যাদি কি জীবন পরিচালনার সহকারী নয়?

আকাশ ভরা সূর্য তারা রয়েছে তবেই রয়েছে বিশ্বভরা প্রাণ। কবি এর মধ্যে অবাক বিস্ময়ে কিছু দেখতে চান শুনতে চান। এখানে সৃষ্টিকর্তার চিন্তা কে অস্বীকার করতে পারে? সৃষ্টিকর্তার চিন্তা যদি সমাদৃত না হয়, সেক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাসমূহ সম্পূর্ণ অবহেলিতরূপে ধার্য করা হবে ফলে চিন্তাপ্রসূত সৃষ্টিও হবে অনাদৃত।

প্রাচ্যের দল যখন সৃষ্টকর্মে প্রণোদিত হবার জন্য এগিয়ে দাঁড়ান তাঁদের বোধশক্তি, উচ্ছ্বাস বা বিরাগ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়, প্রকাশের ভাষা বা রীতি প্রকরণ তখন বাহুল্যবর্জিত করেই, কার্যকরী করে তুলতে চেয়েছেন জনচিত্তে। প্রতীক ছেড়ে চিহ্নকে তাঁরা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু প্রতীকের প্রয়োজনেই চিহ্ন, চিহ্নের প্রয়োজনে প্রতীক নয়। ফলে তা প্রাথমিক ভাবে অনাদৃত হয়। কিন্তু একদিন আসে যখন অবাঞ্ছিতরা সরে যাবেই। বিশুদ্ধ শিল্পকর্মের পথ আপনিই

প্রস্তুত হবে, সমাদর লাভের যোগ্য হয়ে উঠবে। শিল্পাশ্রয়ী না হলে সেই সমাজের মুক্তি নেই। সমাদরই শিল্পকে অন্তিম পথে পৌঁছে দিতে সক্ষম।

কোনও কর্ম সমাদৃত করতে হলে কর্মকে মোটামুটি ভাল. কিংবা খুব ভাল স্তরে উন্নীত করা চাই। দেখা যায় প্রকৃষ্ট কর্ম শিল্পীর বুদ্ধির পরিমাণগত শক্তির উপর নির্ভর করে। অতি বিচক্ষণ, বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও ঝোঁক দেন সাধারণ্যে আদৃত কর্মের দিকেই। শেষ বিচারে খুব ভাল কর্ম লোকসমক্ষে তার লুক্কায়িত কৃত্রিমতা নিয়ে দেখা দিতে পারে। আবার নিত্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রে দৈনন্দিন ক্ষুধাতৃষ্ণা মিটাতে মানুষকে সংগ্রহ ক্রিয়ায় মনোযোগ দিতে হয়। অন্যের অপছন্দকর কোনও আবেগ তাকে বর্জন করতেই হয়, তার আচরণের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে হয় সেই মনোভাব যা অপরের নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হতে পারে। সভ্য মানুষই সভ্য সমাজ সৃষ্টি করতে সক্ষম। আদিম সমাজ যত সভ্য হয়ে উঠছে তার লালিত কর্মপটুতা ক্রমান্বয়ে তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়েছে। লুপ্ত হয়েছে অগ্রহণীয়, অধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন যা কিছু কোনও প্রয়োজনভিত্তিক তাগিদায়। সমাজ জীবনে এই রসের খেলা চলে অবিরাম যা লোপ পাবে তার লুপ্তি ঘটিয়ে মনুষ্য সমাদৃত সৃষ্টিকর্ম বা রীতি পুরাতনের স্থান গ্রহণ করে।

প্রত্যেক শিল্প কর্মই রক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। প্রতি শিল্পকর্ম নির্দেশ করে কোনও কালের ইতিহাস বা দর্শন। মানুষের শিক্ষার কাজে লাগবে বলেই ধরে রাখা। প্লেটোর কথায় নাগরিকের দেহ ও আত্মার কাজে লাগবে। (ফর্ দি সোলস্ এ্যাণ্ড বডিস্ অব্ দি সিটিজেন্স্) মিউজিয়মের বস্তুসমূহ পুরাতনের স্মৃতিরক্ষার জন্য এবং নূতনের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে তুলবার জন্য সুরক্ষিত। বুদ্ধি এবং উপলব্ধি উপরন্তু সম্পূর্ণ শিক্ষাই ত শিল্পসৃষ্টির পথ।কুমারস্বামী বলেছেন শিল্পকর্ম হচ্ছে বুদ্ধির, দৈহিক ক্রিয়াসম্ভূত নয়, সেইজন্যই আকর্ষণীয় দিক থাকে শিল্পের যা সৌন্দর্যের মাপকাঠিতে নিরূপিত হয় এবং অপরকে উপায় স্বরূপ হয়ে অন্তিমে তুলে ধরতে সাহায্য করে। সুন্দর শিল্প এই ভাবেই ভাব বিনিময়ে সহায়ক।

আবার কোনও ভাল, মনোরম বা সুন্দর ক্রিয়াই ভাব প্রকাশের পূর্ণ দাবীদার হতে পারে না যদি না সমঝদার সর্বস্তরেই শিল্পকর্ম সমাদৃত করে না চলেন কোনও একটি অন্তিম পথ উদ্দেশ্য করে। শিল্পকর্মের গুণগত বিচারবৈশিষ্ট্য নির্ণয়ন শিল্পীর পক্ষে আর সম্ভব নয়। এ সম্পদ সমঝদারের। সমঝদারের কাছ হতেই তখন শিল্প চিন্তা গ্রহণ করতে হয়। গ্রীক ভাষায় এই সমঝদারদেরই এস্থেটেস বলা হয়েছে। এস্থেটিক অভিজ্ঞতার পরিচয় কোনও শিল্পীর চিন্তা বুদ্ধি পেরিয়ে সর্বজনীন আদরণীয় সম্পদরূপে শিল্পে স্বীকৃত হয়ে চলেছে।

ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির বিষয়ে পূর্বে আলোচিত হয়েছে। শিল্প যদি সর্বকালেই সমাদৃত হয়, কোনও একটি সৃষ্ট কর্ম যদি যুগে যুগে একই সুন্দর রূপে প্রতিভাত হয় তবে পূর্ণ পরিণতির আশা কোথায় ?

জন্মান্তরবাদ যদি সত্যি বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে এরকম আশা করা অন্যায় হবে না যে প্রতিভাবান ব্যক্তি আরও সম্পূর্ণ হয়ে পরবর্তীকালে জন্মগ্রহণ করে নিজের আরব্ধ কার্য সমাধা করতে পারতেন।

জন্মান্তরবাদের সত্যতা প্রমাণ বিজ্ঞানভিত্তিক নিয়ম শৃঙ্খলার উপর নির্ভরশীল। ভারতের প্রাচীন সাহিত্য শিল্পকলার মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অবিনশ্বরতাকে স্বীকার করেছে। মহাকাল, মহাকাশের জ্যোতির্ময় রূপে অবস্থান করে বিশ্বচরাচর নানা দিক হতে প্রভাবিত করে চলেছেন এই সত্যের উপর বহু শিল্পকলার ভিত্তি স্থাপিত এবং আপামর জনসাধারণের কাছে আজও সেগুলির সার্থক রূপায়ন সমাদৃত। ঐতিহাসিক, পৌরাণিক নাটকগুলিতে দৈববাণী যে আমোঘ শক্তি সম্প্রসারিত করতে সক্ষম, তার পরিচয় দেন শিল্পীরা। এইভাবে নাট্যশিল্পকে তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছেন ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপে। মাটির মানুষ যোগ বলে লাভ করেছে অতীন্দ্রিয় বিদ্যা, ধ্যান শক্তিতে ভূত ভবিষ্যত নির্ণয়ে সক্ষম। স্থিত কালের কর্ম প্রণালীতে যুক্ত করেছেন সেই ধারাবাহিকতা যাতে মানুষ যে কাজেই লিপ্ত হোক না কেন তাতে ঈশ্বর প্রেরণা লাভ করতে পারে, লাভ করে সদানন্দ চিত্ত।

প্রয়োজনের আশু তাগিদে উদ্দেশ্য মাতোয়ারা বিষয়সূচী নিয়ে কর্মতৎপর হওয়া যা বর্তমান কালের মনস্তত্ত্বে প্রকাশ পায়, সেই অস্থির চঞ্চল আবেগ প্রবাহ বইতে হত না পুরাকালের ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতিসম্পন্ন শিল্পীদের। প্রাচীন কার্যের সত্যতা ও যথার্থতাই আজও সমাদৃত।

সমাদৃত অর্থে বুঝঁতে হবে মনোজ্ঞতা (অ্যাক্সেপটিবিলিটি) যাতে দ্ব্যর্থ বোধের অবকাশ না থাকে। সমাদর হল মুগ্ধতা বা মনোজ্ঞতার প্রতীক। সেই প্রতীক ব্যবহারে কোনও অপরিচয়ের দূরত্বের অবকাশ নেই যার বিশ্বজনীনতা অনস্বীকার্য যেমন তারযন্ত্র অর্থেই সংগীতের পরিচায়ক, পায়রা হল শান্তির দূত।

বৃটিশ এস্থেটিক জার্নালের সাম্প্রতিকতম কয়েকটি রচনায় কয়েকজন পাশ্চাত্যের শিল্প বিশেষজ্ঞ যে ভাবে জীবনের রীতি (মোড় অব্ লাইফ) প্রকাশ করতে উপলব্ধি (অ্যাপ্রিসিয়েশন্) কথাটির প্রয়োগ করেছেন সমাদর সে অর্থে গ্রহণযোগ্য নয়। উপলব্ধি না ঘটলে কোনও শিল্পকর্ম সমাদৃত হতে পারে না। কিন্তু এই উপলব্ধি শিক্ষা ব্যতীত সম্ভব নয়। সাধারণ শ্রোতা ভাল লাগা হেতু, যে

মানসিকতার পরিচয় দেন, তাও উপলব্ধিজাত কিন্তু শিক্ষা বা জ্ঞান ব্যতীত কোনও ধারণার পূর্ণ উপলব্ধি সম্ভব নয়, ফলে সাধারণ শ্রোতা ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য হন না। কিন্তু উপলব্ধি অনুভূতিকে অতিক্রম করে নয় বা আবেগের প্রভাব মুক্তও নয়, প্রকৃষ্ট ভাব পরিস্ফুট যেখানে সেখানে মন ও ক্রিয়া একত্রিত। শিল্প সেখানেই সমাদৃত বলা হয়। কিন্তু সমাদৃত কথাটির অর্থ এখানে সম্পূর্ণ সার্থক হল না। কাজেই আমার মতে যে সংগীত বা যে শিল্প প্রখর সমঝদারের পূর্ণ উপলব্ধির দ্বারে আঘাত করে আবার নিকৃষ্ট শ্রোতার অন্তরে কণামাত্রও তরঙ্গ তুলতে সক্ষম হয় সেই শিল্প সমাদৃত বলে গণ্য হয় এবং সেই সংগীত তথা শিল্প চিরন্তনের পথে অগ্রসর হয়। প্রাচীন সাহিত্য সমূহে দেবদেবীর মূর্তি মনুষ্যাকার হয়েও যে মানুষের মত হবে না এই চিন্তাধারার পিছনেও পরামানসিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। তাই দেবদেবীর মূর্তি আজও সমাদৃত। সাহিত্যে মহাকাব্যে আমরা পাই পুষ্পকরথের পরিচয়, সমুদ্রের সেতুবন্ধনের বর্ণনা, সমুদ্র মন্থন, মারণাস্ত্রের বর্ণনা, তাছাড়া নায়কদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা যা সাধারণ মানুষের চিন্তাধারার সঙ্গে মিলেও মিলে না। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অতি মানসিকতা বা অতিরঞ্জকতার পরিচয়। জন্মান্তরের সঙ্গে কোথায় যেন এদের সম্বন্ধ থেকে যায়। তাই জাগতিক শত সহস্র পুষ্পকরথের কোনটিই মহাকাব্যে বর্ণিত পুষ্পকরথের সমতুল হবে না। বিশ্বাত্মা বহু আত্মার সমষ্টি। বহুজনের অপূর্ণ মানসিকতার ফলশ্রুতিই কোনও একজনের পরিপূর্ণতার আধার বহন করে। তাই চেতনার মূলে সত্যদ্রষ্টার প্রজ্ঞা থাকলেই যথেষ্ট এবং কালে তাই সমাদৃত রূপে চিহ্নিত হয়।

বর্তমান কালে প্রাচীন শিল্পরীতির চর্চা ও শিল্পে বিবর্তন সাধনের একটি প্রয়াস দেখা যায়। একই সঙ্গে পুরাতন এবং গতানুগতিক পন্থা বহির্ভূত বিপ্লবাত্মক রীতি প্রতিষ্ঠার উদ্যমও সমভাবে প্রকাশিত। মানুষ কি চায়? ধ্রুপদীরীতি, আধুনিকতা, দেবোদ্দেশ্যে প্রেম ভক্তিরসের প্রসার না তার ঘরোয়া দেশজ রীতির যোগ্য প্রতিষ্ঠা? বস্তুত স্থান কাল নির্বিশেষে সর্বত্রই এই দাবী যুগে যুগে বিবেচিত হয়েছে।

ভারতে ভাষার ক্ষেত্রে প্রচলিত ছিল সংস্কৃত ভাষা, দেশীয় ভাষাও কিঞ্চিদধিক প্রচলিত ছিল। দেশীয় ভাষা সমূহ ক্রমশঃই সমৃদ্ধ হয়েছে। সংস্কৃত গ্রীক্ ল্যাটিনের মত কথ্য ভাষা থেকে বিচ্যুত হলেও দৈনন্দিন জীবনে প্রভাবশালী ভাষারূপে এখনও জীবিত। সংগীত রীতিতে 'মার্গ' রীতি ছিল অনুসরণীয়। গন্ধর্বেরা দেশীয় রীতিকে আত্মসাৎ করে যে গান্ধর্ব পথ খুঁজবার প্রয়াস

পেয়েছিলেন তার মধ্যেও মার্গরীতি আত্মরক্ষায় সমর্থ ছিল। ফলত গান্ধর্ব রীতি ইতিমধ্যেই মার্গীয় রীতি দ্বারা প্রভাবিত হতে লাগল। ভরত নিজে দেশীয় রীতিকে সবিশেষ স্থান দেননি। পরবর্তীকালে সেই দায়িত্ব পালন করেছেন অর্থাৎ দেশীয় রীতির গুরুত্ব প্রদান করেছেন কল্লিনাথ, অভিনব গুপ্ত ইত্যাদি।

শিল্পসৃষ্টির মূলে সংস্কৃতজ্ঞ ও দেশীয় ভাষাভাষীদের সংযুক্ত সাধনা তাই লক্ষণীয়। এই দেশীয় রীতিই গ্রাম্যরীতি। যে নিয়ম ভারতে পালিত হয়েছে বিশ্ব সমাজের সর্বত্রই সেই একই ধারাবাহিকতা।

এই মার্গীয় রীতিতেই শুক্রনীতিসারে প্রদর্শিত হল দেববিগ্রহ নির্মাণ কৌশল। শৈবাগমগুলিতে দেখান হল ভাস্কর্য রীতি। পুরুষ গণ্য হয়েছিল উচ্চ পর্যায়ের শিল্প কর্মের অধিকারীরূপে এবং স্ত্রীলোকের স্থান ছিল দেশীয় রীতিনীতি পালনের ক্ষেত্রে। মনুসংহিতাকার মনুকেই শুধু অনেকে সমালোচনা করে থাকেন, স্ত্রীলোকের আচার আচরণ নির্দেশনার জন্য। কিন্তু অপরাপর মুনিরাও যে উদার ছিলেন একথাও বলা যায় না। স্বয়ং ভরত শিল্পচর্চায় স্ত্রীলোকের স্থান গৌণরূপে দেখিয়েছেন।

নাটকে স্ত্রীলোকের অংশ গ্রহণের অনুমতি দেওয়ার জন্য ভরতকে সাধুবাদ দেওয়া হয়। কিন্তু এই স্ত্রীলোক উচ্চবংশজাত হবে একথা তিনি কোথাও বলেননি। কিন্তু শিল্পের স্বরূপ ভরতের কাছে উদঘাটিত হয়েছিল। তাই স্ত্রী ও পুরুষ মিলিত না হলে নাটক যে কোনও দিন শিল্পরূপে পরিগণিত হবে না বা সমাদৃত হবে না একথা ভরত অনুধাবন করেছিলেন কিন্তু জৈমিনীর গ্রন্থেও স্ত্রীলোকদের শিল্পচর্চা বৃথা স্বরূপ সূচিত করা হয়েছে। বৌদ্ধশাস্ত্রেও স্ত্রীলোক আচরিত শিল্প প্রচেষ্টাগুলি নিছক আমোদ প্রমোদমূলক রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই বৌদ্ধযুগে বহু নটী ছিলেন যাঁরা অসাধারণ নৃত্যগীত পটিয়সী কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁরা কোনও দিন শিল্পী আখ্যা পাননি। কিন্তু মানুষের অন্তর কোনওদিন 'শিল্পী' নামের উপর নির্ভরশীল হয়ে সমাদর করে তাকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে এরকম দেখা যায় না। তাই বৌদ্ধযুগের নটী এত যুগ পরেও বেঁচে আছেন মানুষের হৃদয়ে, আজও তাঁদের উপলক্ষ্য করে বহু কাহিনী রচিত হয়। যা মানুষের হৃদয়ের শ্রদ্ধাই উৎসারিত করে ঘৃণা নয়।

সেই সময় থেকেই দেখা যায় ভারতীয় শিল্প সাধনার ধারা গুরুশিষ্য পথ ধরেই কালানুক্রমিক ভাবে চলে এসেছে এবং সেইজন্যই মার্গ রীতি স্বর্গীয় ভাবধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলা হয়।

মার্গরীতি পবিত্র ও প্রাচীন। মার্গরীতির ধারাবাহিকতা ভারতীয় সংগীত

শাস্ত্রের মূলে। যদিও সংগীতের মধ্যে মাগরীতিকে পৃথকভাবে খুঁজতে চাওয়া কষ্ট সাধ্য। যেমন দেশীয় ভাষা সমূহের মধ্যে সংস্কৃতের প্রভাব অনস্বীকার্য কিন্তু সংস্কৃতকে পৃথক করে নেওয়া অর্থহীন। সেইরকমই ভারতীয় সংগীতের মূলে মাগরীতি তার কায়া ও ছায়া নিয়ে আজও সংগীতের ভাব রস জাল সৃষ্টির কাজে মূলধন যুগিয়ে চলেছে।

শিল্পাদির সমাদর ক্ষেত্রে পূর্বে শিক্ষিত গুণী মহাজনদের স্থান ছিল উপরে, অজ্ঞ অভাজনদের স্থান ছিল গৌণে। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে রস বিচারে আর ধনী, তথাকথিত শিক্ষিত এবং সুবিধা প্রাপ্তদের প্রাধান্য ধরা পড়ছে না। একাজে অজ্ঞ এবং সহজেই ভাবালু হয়ে পড়েন এমন জনসাধারণের সংখ্যাও কম নয়। সমগ্র শিল্পচর্চার মূলেই এখন সাধারণ মধ্যবিত্তেরা এগিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। শিল্পকলার মূল উদ্দেশ্য যা নান্দনিক বা এস্থেটিক তাই সমাদৃত হয়ে চলেছে। ধনী, দরিদ্র মানুষের মনের কোন্ ঐক্যভাব এই সমাদর ক্রিয়ায় উদ্যোগী তা এক কথায় প্রকাশ করতে হলে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে হয় 'ভাল লাগা'।

মার্গসংগীতের উপাসক যাঁরা ছিলেন তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষভাবে প্রত্যেকেই বিশ্বাস করতেন আত্মা অমর। পরমাণু তত্ত্ব বিশ্লেষণেও দেখা যায় জগতে বস্তু ও শক্তির বিনাশ নেই, শুধু পরিবর্তন ঘটে। আধুনিক বিশ্লেষক যাঁরা শিল্পতত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করেন তাঁরা নিরপেক্ষ এবং নিরাসক্তভাবেই করে থাকেন। কিন্তু প্রাচীনকালে যাঁরা সংগীতের দেশীয় রীতিতে পরিবর্তন ঘটাতে অগ্রসর হয়েছিলেন তাঁরাও প্রকারান্তরে নিরপেক্ষ এবং নিরাসক্ত পথ অবলম্বন করেছিলেন।

প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী ভাগনার (wagner) সাধারণ লোক এবং তাঁদের সংগীত (ফোক সঙ্) বলতে বুঝেছেন, যে সাধারণ লোকেরা ঐক্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের দৈনন্দিন এবং সমষ্টিগত অভাব (কমন অ্যান্ড কলেকটিভ্ ওয়ান্ট) তুলে ধরতে পারে। শিল্পীরা সেই অভাবকে শান্ত করতে বদ্ধ পরিকর ছিলেন। অণুপরমাণুর সংঘর্ষে অস্থিরতা প্রকাশ পায় প্রলয় ঘটে।

বর্তমান কালে যে সব কবিতা, গান, নাটক, চিত্র আমাদের সম্মুখে উপস্থিত তার অল্পসংখ্যকই মধ্যযুগের ধর্মীয় চিন্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে গড়ে তোলা হচ্ছে। মানসিকতার বিশেষ পরিবর্তন সাধিত না হলেও রুচি পরিবর্তিত হচ্ছে তাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আমাদের দেখতে হচ্ছে, বিচার করতে হচ্ছে, জগতের একটি সমষ্টিগত অভাব যা বিক্ষুব্ধভাবে স্বস্তি, শান্তি খুঁজতে ব্যগ্র। ললিত কলায় অধিকার সংস্থাপনে সাধারণ মানুষের এই প্রয়াসের সঙ্গে অমৃতের

জন্য দেবতাদের সঙ্গে অসুরের দ্বন্দ্বের তুলনা করা যায়।

নৈতিকতার উপর যে কলার প্রতিষ্ঠা হল তাতে ছিল মানবিকতা। বিদগ্ধ সমাজ ও সাধারণ লোকের সহাবস্থানের দ্বারা 'ভাল লাগা' কাজগুলি সমাদৃত হল যে তার প্রধান কারণ আবু সঈদ আইয়ুবের ভাষায় 'জীবন মরণের সঙ্গী' লাভের প্রত্যাশা শিল্পকর্মের মধ্যেই যার অবস্থান।

তাঁর ভাষাতেই "......তাতে এমন কিছু থাকে যার স্পর্শে জগৎ ও জীবনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক, আমাদের ভাবনা ও বেদনা, আমাদের আশা ও নৈরাশ্য, অল্পবিস্তর রূপান্তরিত হয়ে উঠে, সত্যতর হয়ে উঠে।"[৪৯] পুরাকালের শাস্ত্রজ্ঞ মুনিঋষিরা শিল্পক্ষেত্রটিতে শাস্ত্রীয় মতবাদ আর দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে পারেননি। তাঁদের এই বহু ধর্ম ও জাতি সমন্বিত ভারতবর্ষের জনগণের সঙ্গে একটি মিলনসূত্রে আবদ্ধ হতেই হয়েছে। শিল্পেরও রূপান্তর ঘটেছে। শ্রী আবু সয়ীদ তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন কবি ইএট্স্, রবীন্দ্রনাথ সকলেই 'আত্মশুদ্ধি'র পরিচয় দিয়েছেন 'কঠিন সত্য'কে চিনতে চেয়েছেন সাধারণের দরবারে যেখানে দলবদ্ধভাবে শিল্পকর্ম সমূহ হতে লোকেরা তাদের জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রসসম্ভার জীবনের সঙ্গীরূপে গ্রহণ করতে এগিয়ে দাঁড়াচ্ছে। কুমার স্বামীর মতে পরিবর্তনের সূত্রে যে সংঘর্ষ চলেছে তাতে অংশ নিয়েছেন (১) ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণেরা (২) হিন্দু এবং ভিন্নধর্মীয়েরা এবং সকলেই বিশ্বাস করতেন আত্মা অমর।

এই সংঘর্ষের ফলেই (১) ধ্রুপদী রীতির প্রবর্তন (২) সমাজে শিল্পের স্থান সর্বসাধারণের জন্য উন্মোচন।

এরপর 'শেষ পারানির কড়ি' হিসাবে কণ্ঠে গান নিতে বাধেনি কারুরই। কীর্তন, বাউল, সূফী ও বৈষ্ণব ধর্মীয়দের গান দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে রাগরাগিণী সমন্বিত হয়ে।

ভারতীয় সংগীতকে যদি বিশ্বজনীন রূপে প্রতিষ্ঠিত করতেই হয় তবে বর্তমানকালে বিভিন্ন পল্লীগীতি, লোকগীতি, ধর্মীয় গীতি যেগুলির সঙ্গে জনসাধারণের ভাললাগা ভাব জড়িত যেগুলি জীবন মরণের সঙ্গী সেগুলির আরও উন্নতি সাধন প্রয়োজন। এর জন্য শুধু দেশী বিদেশী সুরই গ্রহণীয় এবং বর্জনীয় তা নয়, দেশী বিদেশী বাদ্যযন্ত্র সমূহেরও প্রয়োগ পদ্ধতি পরীক্ষা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত শাস্ত্রীয় সংগীত সমূহের বিকাশ ঘটানোর জন্য সেইগুলির পুনর্বার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিভাবান শিল্পীদের এগিয়ে দাঁড়াতে হবে।

তৃতীয়ত কীর্তন, পদগীতি, রাগগীতি সমূহের চর্চা এবং প্রসারের দিকে সর্বতোভাবে ঝোঁক দেওয়া প্রয়োজন. কেননা সমাজে পুরাতন শাস্ত্রীয় সংগীতের অঙ্গবাহীরূপে এই জাতীয় সংগীত মার্গ সংগীত অপেক্ষাও জনগণের নিকট অধিকতর পরিচিত ও সমাদৃত হয়ে চলেছে। আমাদের লোকগীতি, পল্লীগীতি, ধর্মীয় ও কাব্যগীতি সমূহের জনপ্রিয়তার জন্যও এই শ্রেণীর গীতিসমূহ অধিকতর কার্যকরী।

চতুর্থত আধুনিক বা লঘুসংগীত দেখা যায় জনগণের সুখ-দুঃখ হতাশা, আনন্দ বা কোনও বিষয় প্রকাশে অসফল। মনে হয় বিষয় বিমুখ। কোনও ক্ষেত্রে উৎকটরূপে দেশী-বিদেশী সুরের সংমিশ্রণে কোনও ঢং সৃষ্টির প্রয়াস। যা মানসিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে যেন প্লট বিহীন নাটক, অর্থ বিহীন কাব্য। না পাওয়া যায় হেগেল স্বীকৃত আনন্দ, না প্রকাশিত হয় মার্কসীয় বস্তুবাদ। অথচ এই গানগুলি সংগীতের মেরুদণ্ডরূপে কালে পরিচিত হওয়ার সুযোগ আছে। তাই এই গানগুলির আরও গবেষণার প্রয়োজন, শুধু গীত নয়, নৃত্য নাটক সকলের ক্ষেত্রেই এক সমস্যা। সর্বাঙ্গে সৌন্দর্য বিকৃতির লক্ষণ ভারাক্রান্ত হয়ে মানুষের মন থেকে দূরে সরে যায়। সৌন্দর্যতত্ত্ব নিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে কম গবেষণা হয়নি। তবে বিদ্বান ও পণ্ডিতদের আলোচনা পুঁথিগতই হয়ে রয়েছে। শিল্পী ও সাধক যাঁরা তাঁরাই পথিকৃৎ। শিল্পীদের ক্রিয়া ও অভিমত সমূহ যুক্তি ও নীতিবোধ দ্বারা আচ্ছন্ন নয়।

সভ্যসমাজে শিল্পকলাকে আরও সম্যকরূপে আদরণীয় করে তুলবার জন্য জ্ঞানী গুণী প্রতিভাবানদের সঙ্গে সাধারণ প্রতিভাবানদের অবদানও কলারসিকদের গ্রহণ করা কর্তব্য, অন্তত প্রাথমিক পর্যায়ে।

ধর্মের অবদান গণ্ডীবদ্ধ রইলেও সংস্কৃতির অবদান কখনও স্থির থাকে না। সেটি গতিশীল জগতের সঙ্গে সর্বদা দেশ, কালানুসারে নিজেকে সজ্জিত করে অগ্রসর হয়।

সৃষ্ট ক্রিয়া সমূহ দ্বিবিধ রূপে অবস্থান করে। যদিও সমগ্র ক্রিয়ার মধ্যেই জীবনের উদ্দেশ্য সমূহ তুলে ধরবার প্রয়াস দেখা যায় তবুও দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্যও লক্ষিত হয়।

সৃষ্ট কর্ম বিশ্বজনীন, নৈর্ব্যক্তিক। এর সার্থক পরিচয় আমরা দেখি দর্শনীয় সৃষ্ট কর্ম সমূহে যেমন চিত্র, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, নৃত্য। চিত্র, ভাস্কর্য, নৃত্য অনেক ক্ষেত্রে প্রতীকাকারে সম্প্রসারণ করলে বোধগম্য হয়ে থাকে। কিছু শিল্পক্রিয়া রয়েছে যা

প্রতীকাকারে দেখান সম্ভব নয়। অনেক ক্ষেত্রে দর্শক সেই ক্রিয়াকে স্পর্শের সাহায্যে অনুভব করেন।

তবুও ভারতের শিল্পকলার ক্রমবিকাশের ধারায় 'প্রতীক' আকারে দর্শনীয় শিল্প অধিকতর সার্থক দেখা যায়। প্রতীক অনেক ক্ষেত্রেই দ্ব্যর্থবোধকতা দূর করে।

যে সৃষ্ট কর্ম শ্রবণীয় যার সত্য ও আনন্দময় রূপ প্রতীকাকারে সঠিকরূপে গ্রহণযোগ্য করে তোলা সম্ভব নয় তখন ক্রিয়াসমূহের সামগ্রিক ঐক্যবোধের (ইউনিফর্মিটি) উপর দৃষ্টি দেওয়াই সঙ্গত। ঐক্যবোধই এক সংস্কৃতির সঙ্গে ভিন্ন সংস্কৃতির পারস্পরিক যোগ ঘটাতে সক্ষম। কাব্য, সংগীত এই ঐক্যবোধের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

যে সৃষ্টি সমূহ একাধারে দর্শনীয় এবং শ্রবণীয় তাতে প্রতীক গ্রহণও করা যায় ঐক্যবোধও সৃষ্টি করা চলে। তেমনই আচারনিষ্ঠবাদীরা (ফর্মালিস্ট, এক্সপ্রেশনিস্ট) শিল্পের সামগ্রিক ঐক্য স্থাপনের জন্য চিত্র ও ভাস্কর্য ইত্যাদি থেকে প্রতীক ব্যবহার তুলেও দিতে পারেন। তাঁরা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন প্রতীক রীতির অপসারণ প্রয়োজনীয় কি না। অবশ্য সেই সমস্ত প্রতীক এবং চিহ্ন সমূহ সর্বদাই বর্জনীয় যা দেশ কাল জয়ী নয়।

শিল্পীরা গবেষণার ভার মুক্ত হয়ে যে শিল্পকে তুলে ধরবেন তা যদি স্থায়ী হয় তাকেই বলা হবে প্লেটোর ভাষায় ঐশ্বরিক, হেগেলের আনন্দ, ক্রোচের প্রজ্ঞার প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সুন্দরের আবির্ভাব ঘটানো।

সংগীত প্রসঙ্গে ক্রিস্টোফর সি নরিস-এর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন সোভিয়েট সিম্ফনিতে পাশ্চাত্যের ধারাবাহিকতার বিপরীত চিত্র ফুটে উঠেছে। পাশ্চাত্য সংগীতে চিরাচরিত রীতির অনুসরণ চলেছে, উদার ব্যক্তিত্ববাদও স্বীকৃত নয়। শোস্টকভিচ সেক্ষেত্রে একটি সামগ্রিক ঐক্য খুঁজতে প্রয়াসী হয়েছেন যেখানে ব্যক্তিত্ববাদ প্রচণ্ডরূপে ফোটে, ব্যক্তির গুপ্ত স্বভাব এবং রূঢ় তুচ্ছ ঘটনাদিও প্রকাশ পায় সিমফনিতে। শোস্টকভিচ তাঁর চেম্বার মিউজিকেও ব্যক্তির গোপনতা উদ্‌ঘাটনের উপরই অধিকতর ভরসা করেছেন।[৫০] লেখক সি নরিস বিপ্লবাত্মক দৃষ্টিবাদী উইটজেনস্টাইনকে শোপেনহাওয়ারের অনুগামী বলেছেন। শোপেনহাওয়ার ছিলেন রোম্যানন্টিক অধ্যাত্মবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত। যুক্তি যদি বস্তুর সত্য দিক ঘিরেই গড়ে ওঠে এবং শুধুমাত্র কালজয়ী বোধশক্তিকেই মূলধন করা না হয় তাহলে প্রকাশবাদী এবং ধারাবাহিকতায় আশাবাদীদের উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি মিলনসূত্র স্থাপন করা যায়। প্রতিনিধিত্ব

মূলক শিল্পের রসাস্বাদনেও কান্ট পূর্ব পরিচিতির কথা বলেছেন।

অনেক শিল্পতাত্ত্বিক মনে করেন, শিল্পরসিক বাইরের অশান্ত পরিমণ্ডল হতে নিজেকে তুলে নিয়ে সৃষ্টরূপ শ্রবণ করেন বা দেখেন। এইভাবেই শিল্পকর্ম অন্য নিত্যকর্মগুলি হতে পৃথকভাবে চিহ্নিত হয়। কান্ট সুন্দর ক্রিয়া এবং শৈল্পিক ক্রিয়ার মধ্যে যেমন প্রভেদ দেখিয়েছেন তেমনই মনোরম এবং আনন্দদায়ক পরিণতি বুঝাতে রুচির কথা তুলেছেন। রুচিতে শুধু শৈল্পিক ক্রিয়ার আবেগসমূহ ধরা পড়ে। তাই সব নাটক, চিত্র, সাহিত্য এবং কাব্যই শিল্পরূপে সমাদৃত হয় না। ভাবের ঘরে চুরি, রুচিবান সমঝদার সহ্য করেন না। হালকা প্রমোদ চিত্র বা সংগীত বা কবিতা উপভোগের বাসনা সীমিত লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যায় ক্ষণস্থায়ীরূপে। কান্ট সুন্দরের উপভোগে আনন্দের প্রতিফলন দেখেছেন, আর আমোদের ক্ষেত্রে আনন্দের উপভোগ। নাটকের ট্র্যাজেডি যে ক্ষেত্রে মুখ্য উপজীব্য সেখানে শ্রোতা বা দর্শক যে আবেগ দ্বারা অভিভূত হন, অনুরূপ আবেগ তো কোনও বিশেষ সংগীত বা কাব্য পাঠেও জন্মাতে পারে। শিল্পের সমাদর মানসিক পূর্ব পরিচিতি ব্যতীত সম্ভব নয়। শিল্পরীতি এক প্রাণ হতে আরেক প্রাণে বয়ে নিতে হবে, তুলে ধরতে হবে, 'আরও আলো, আরও আলো'র দরবারে নিয়ে আসতে হবে। ক্রমান্বয়ে সামগ্রিক ঐক্যবোধের দ্বারা বিশেষকে সামান্যে পৌঁছে দিতে হয়। বার্ডসলে তাঁর প্রবন্ধে মতামত জানিয়েছেন সামগ্রিকভাবে গ্রহণযোগ্য না হলে বুঝতে হবে ঐক্যের গাঁথুনি শক্ত নয় অর্থাৎ বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণ শিল্পে জটিলতা মুক্ত হয়ে উঠতে পারেনি ফলে তা সমাদৃত হওয়ার পরিবর্তে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

জগৎব্যাপী মানুষের ভাষা এবং রুচিবোধ বিভিন্ন তাই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগরের চিত্র, আগুনের লেলিহান শিখার ছবি, খোদিত প্রস্তর, মরু প্রান্তরের রক্ষিত স্থাপত্য কলা, সংগীতের সুর বিভিন্নদেশে বিভিন্নরূপে সমাদৃত হয়। যুক্তিদ্বারাই শিল্পতত্ত্বের ব্যাখ্যা যুক্তিসংগত। এই যুক্তির প্রয়োগ মনস্তত্ত্বে, ঐতিহাসিক নিমিত্তবাদে অস্তি নাস্তি বোধের বিচার বিশ্লেষণে, ধর্ম ও নৈতিক রীতিনীতি সংস্থাপন এমনকি অলৌকিক ঘটনাও যুক্তি দ্বারাই ব্যাখ্যা করা কর্তব্য।

শিল্পজগতে শিল্পী যেমন পুরাতনের জট খুলে ধরেন, তেমনই তাঁকে জটিল পরিস্থিতির মধ্যেই আবার বুনতে হয় শিল্পের রসজাল। চটকদার কৃত্রিম সৃষ্ট কর্ম শিল্পক্ষেত্রে ধস নামিয়ে তোলে।

স্বাধীন সমাজের সৃষ্ট আইন বা নির্দেশ দ্বারা কোনও শিল্পের গণ্ডী সংস্থাপন সম্ভব নয়, তাতে শিল্পী পরোক্ষভাবে পরিচয় দেবে ব্যক্তিশক্তির যা দৈবশক্তির

বিপরীত। শিল্পীকে স্বাধীনভাবে খোলা মনে সংগ্রহ করতে হবে আরব্ধ কর্মের উপকরণ। এর জন্য প্রচলিত রীতিনীতির পরিবর্তন সাধন যদি প্রয়োজনীয় হয় তবে তা অবশ্যকরণীয়। বিপ্লবাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি শিল্পসমঝদারের পথ উন্মুক্ত করতে অক্ষম। চিরাচরিত নিয়মের মধ্যেই অনুশীলনের অগ্রগতি রক্ষা করা বিধেয় যদি শিল্পীর নিজস্ব স্বাধীন চিন্তার পথ রুদ্ধ না করে দেওয়া হয়। এর জন্য শিল্পী কোনও বাধ্যতামূলক রীতি গ্রহণ বা কোনও কৃত্রিমতার আশ্রয় নিতে যেমন অস্বীকৃত হবেন তেমনই কোনও শাসকবর্গ কিংবা কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যস্ত কোনও গোষ্ঠী দ্বারা ক্রীত ব্যক্তিও হয়ে উঠবেন না। অভিজ্ঞতা ক্ষুণ্ণ হতে দিলে সৃষ্ট কর্ম অনাদৃত হতে বাধ্য এই চিন্তাবোধ যেন তাঁর মনে কাজ করে।

পৃথিবীতে মানুষের অধিকার সর্বত্র সমান স্বীকৃত। শিল্পকর্মে সেই সাম্যবোধকে তুলে ধরতে হবে যা স্থান বা কালজয়ী রূপে স্বীকৃত বা সমাদৃত হতে বাধ্য। সব শিল্পের শেষ শিল্প হল সংগীত শিল্প। সব নদী যেমন সাগরে পৌঁছায় মানুষের সব আকাঙ্ক্ষার শেষ হল সংগীতে। সংগীতের দ্বারা মানুষের মন এক মুহূর্তের জন্যও অন্তত অনিষ্ট চিন্তা হতে মুক্ত হয়। দৈনন্দিনজীবন ধারণের গ্লানি থেকে মুক্ত হয়। জীবনের ক্ষেত্র হয়ে যায় অনেক বড়, মানুষ নিজের মধ্যে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না আপনাকে ব্যাপ্ত করে, ছড়িয়ে দেয় বিশ্বের মধ্যে। তাই কবি লিখেছেন :

'আমার আপন গান আমার অগোচরে
আমার মন হরণ করে,
নিয়ে সে যায় ভাসায়ে সকল সীমারই পারে' ॥

সংগীত সর্বাপেক্ষা ক্ষণস্থায়ী, সর্বাপেক্ষা চঞ্চল কিন্তু চিরস্থায়ী ছাপ রাখে মনের মধ্যে। তাই যাঁরা সংগীত সাধক তাঁরা প্রকৃতই সাধক, ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী। ধর্মকে আশ্রয় করেই সংগীত গড়ে উঠেছে। কিন্তু ধর্মের বন্ধনে কোথাও বাঁধা নেই সংগীত। বাঁধতে চাইলেও বাঁধা যায় না, নিজেকে মুক্ত করে নেওয়ার ক্ষমতা সংগীতের নিজেরই আছে, যা আর কোনও শিল্পের নেই। এই হল সংগীতের স্বরূপ সেইখানেই তার স্বাধীনতা। নিজের শিল্পমূল্য সম্পর্কে সংগীত যথেষ্ট সচেতন, তাই নিজেকে কখনও সে মলিন হতে দেয় না। যা কিছু মলিন, যা তার কাছে ভারবাহী তা সে কখনও বহন করে না। সব সাধনার শেষ সাধনা সংগীত। তাই জীবনের মূল্যে সমগ্র সঞ্চয়ের মূল্যে সংগীতকে পাওয়া যায়। যে শিল্পের মূল্য একশত বৎসর পরে নির্ণীত হবে সে শিল্পের সঙ্গে সংগীত

শিল্পযুক্ত হয় না। তার পাওনা হাতে হাতে। সংগীত অকৃপণ হস্তে নিজেকে বিলিয়ে দেয়, ধনী নির্ধন কেউই বঞ্চিত হয় না, কে গ্রহণ করল কে গ্রহণ করতে অক্ষম হল তা নিয়ে তার মাথাব্যাথা নেই। তার শিল্পমূল্য এবং শিল্পরূপ সম্বন্ধে সে একাধারে সচেতন এবং অচেতন। তাই তার ক্ষণস্থায়ী রূপই তার চিরস্থায়ী রূপ। একে অগ্রাহ্য করবার শক্তি ইহজীবনে কোন মানুষেরই নেই কারণ তাহলে পৃথিবীর অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

উৎস নির্দেশ

প্রথম অধ্যায়

১। Leonard B. Mayan. 'Emotion and meaning in music', "To be characterised as moods than as emotions in ordinary sense of the term."

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কথা ও কাহিনী'
"গানভঙ্গ"

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'গীতবিতান'

৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কথা ও কাহিনী'
"গানভঙ্গ"

৫। Huge Ricman:
That practise and good will are required for the understanding of a great and complicated musical work of art.

৬। British Journal of Aesthetics: Autumn 1974.
Intention and interpretation in literature.

৭। A. K. Coomar Swamy: 'The transformation of nature in art.'

৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সংগীতের মুক্তি'

৯। E. F. Carritt: 'An introduction to Aesthetics.
"The general theory is that in ages of optimism, confidence, vitality, art will be realistic, naturalist vital; in ages of pessimism, disillusion, fear, it will geometrical and abstract. The first is humanist, the second mystical, religions or ascetic."

১০। E. F. Carritt: 'An introduction to Aesthetics.

"Between beauty and sublimity, reason and Sentiment, Greek and Gothic, classical and romantic, rule and nature, regularly and serpentine, grand and picturesque, the Roman and the rococo."

১১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — সংগীত চিন্তা

১২। Becthonen: "You will ask me where I get my ideas; that cannot tell you with certainty, they come unsummoned, directly, indirectly. I could seize them with my hands out in the open air, in the moods, while walking, in the silence of the nights, at dawn, excited by moods which are translated by the poet into words, by me into tones that sound and rear and storm about me till I have set them down in notes."

১৩। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী।

১৪। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী।

১৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সংগীত' আত্মজীবনী পর্যায় থেকে।

১৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগীতের মুক্তি।

১৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সংগীত' আত্মজীবনী পর্যায় থেকে।

১৮। Gerardus Van Der Leenw: Secred & Profane Beauty. "Art needs the world of phenomena, it lines off it. The painter and the Poet both need images. Music is a direct objectification of the will, as immediate as the World itself."

১৯। Gerandus Van Der Leenw: Secred & Profane Beauty.

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। সাধন ভট্টাচার্য : এ্যারিস্টট্‌লের পোয়েটিক্‌স এবং সাহিত্যতত্ত্ব।

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শাপমোচন।

৩। সাধন কুমার ভট্টাচার্য শিল্পতত্ত্ব।

৪। অভয় গুহ সৌন্দর্যের শ্রেণীবিভাগ।

৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতবিতান।

৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সঞ্চয়িতা।

৭। জীবনানন্দ দাশ কাব্যগ্রন্থ।

৮। জাঁ পল সার্ত্রে : What is Literature.
"It is one thing to work with colours and sound and another to enpress oneself by means of words."

৯। সাধন কুমার ভট্টাচার্য শিল্পদর্শন ও সাহিত্য সমালোচনা।

১০। যামিনীকান্ত সেন আন্তর্জাতিক রূপতন্ত্র।

১১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতবিতান।

১২। E. B. Havell: Art heritage of India.
"Only the images of the Gods should be made, for they canfer heaven and happiness; but the images of man and others shut the door of heaven and bring ill fortune."

১৩। Sidney Finkelstin: How music expresses idea.

১৪। The British Journal of Aesthetic: Winter 1975.
Joel. J. kupperman: Art & Aesthetic experience.

১৫। সাধন কুমার ভট্টাচার্য শিল্পতত্ত্ব।

১৬। K. C. Pandey: Aesthetics.

১৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সঞ্চয়িতা।

১৭ক। "Poetry is not like reasoning, a power to be enerted according to the determination of the will. A man cannot say, 'I will compose poetry.' The greatest Poet even cannot say it for the mind in creation is as a fading coal, which some invisible influence like an inconstant wind, awakens to transitory brightness, this power arises from within, like the colour of a flower which fades and changes as it is developed, and the conscious portions of our natures are unprophetic either of its approach or its departure....., Most glorious poetry that has ever been communicated to the World is probably a feeble shadow of the original conception of the poet."

১৭খ। "The landscape painter should not limit himself to the representation of enterior surfaces of the earth and the physical phenomena which are there to be found. He should ever find in the fact some passion which dominates him and should develop in painting, a feeling suitable to the subject. The true painter of

nature is he who like Albert Durer feels the breath of divinity shudder out of nature under his brush when he lowers heaven on to his canvas and makes the blossoming images of spring or the harsh aspect of winter descend."

১৭গ। "You will ask me where I get my ideas. That I cannot tell you with certainty, they come unsunmoned, directly, indirecly—I could seize them with my hands out in the open air, in the woods, while walking, in the silence of the nights, at dawn, excited by the moods which are translated by the poet into words, by me into tones that sound of roar and storm about me till I have set then down in notes."

১৭ঘ। "If poetry does not come as naturally as the leanes to the tree it had better not come at all."

১৭ঙ। "A mystery which a kind of reverential diffidence will scarcely permit me to attempt to unravel."

১৭চ। "It is possible to do something to induce the emergence of the original impetus. The significance of the implicit units of the impulsine experience is rather that it is genuine "

১৭ছ। "Individual differences of temperament, of the particular kind of medium employed may also contribute something to the quality of the inpulsine experience as regard its excitement aspect.
This is perhaps especially likely in the case of music, since almost all composers seem to find something inexplicable in the emergence of their conceptions."

১৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্য।

১৯। Harold Osborne: Aesthetics and Criticism.

২০। Harold Osborne: Aesthetics and Criticism.

২১। সাধন ভট্টাচার্য : শিল্পতত্ত্ব।

২২। R. G. Collingwood: The principles of art.

২২ক। "In art makes explecit to himself what he is, Art has no stir our senses, our feelings, our emotions."

২২খ। "We delight in melody because it expresses

dispositions, and rhythm because it moves us in a regular way."

২২গ। "What matters to the musician is not the physical connection between notes but the compatibilities and in compatibilities in the responses of emotion and attitude which they excite."

২২ঘ। "The science and art of the rhythmic combination of tones, vocal of instrumental, embracing melody and harmony for the expression of anything possible by this means, but chiefly emotional."

২২ঙ। "In a World where everything seems to come out desperately wrong, good music comes out exquisitely right. It is the logic of sound. But the logic is not that of a textbook or an argument. It is an order of vitality, a rich dream of sound become organised and crystallised."

২২চ। "As the highest of the fine arts, as the one which more than anyother ministers to human welfare."

২২ছ। "Give me beauty in my inword soul. My highest aim is to find within, God whom I find everywhere without."

২৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—গীতবিতান।

২৪। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়—পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পের কাহিনী।

২৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সঞ্চয়িতা।

২৬। Dr. Sudhir Nandy: An enqiury into the nature and function of art.
"But Rolland was quite conscious of this universal element in Art. It is this element that makes aeceptable to us the work of the master artists of the old such as Homer, Kalidasa, and Picasso. The mode of living which was theirs in give long since the World in which they lined is no more. But art and literature of these days are still living."

২৭। Sri Aurobindo: The Significance of Indian art.
"Great art is not satisfied with representing intellectual truth of things which is always their superficial or enterior truth. It seeks for a deeper and original truth

which escape the eye of the mere sense or the mere reason, the soul in them the unseen reality which is not of their form and the process but of their spirit."

২৭ক। "In its fullness only to the unsealed vision of the poet and artist in man who can seize the secret significane of universal poet and artist, the divine creator who dwells as their soul and spirit in the form he has created."

২৮। The British Journal of Aesthetics Vol-14.
Berel Leng: Intertional fallacy revisited.

২৯। The British Journal of Aesthetics Vol-14.
A. J. Ellis: Induction and interpretation of Literature.

৩০। শ্রী মলুক রাজ আনন্দ Hindu View of art.

তৃতীয় অধ্যায়

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—চণ্ডালিকা।
২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—চিত্রাঙ্গদা।
৩। তারকচন্দ্র রায়—পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস।
৪। তারকচন্দ্র রায়—পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস।
৫। Ruth Reyna—Reincarnation and Science.
"Death then is the final existential link with the dimensions of futurity and conclusively implements the individuals past and present."
৬। Ruth Reyna: Reincarnation and Science.
"It is simply the nonsensical destruction of all human possibilities, the absurd annihilation of the human self. Far from imparting any meaning to the human life, death rather reveals most clearly that life in its totality is absurd."
৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শান্তিনিকেতন পর্ব।
৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'সঞ্চয়িতা' "বসুন্ধরা"।
৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'সঞ্চয়িতা' "বসুন্ধরা"।

১০। সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা' "শ্রী অরবিন্দ তথ্য তত্ত্ব ও সাহিত্য।"

১১। অমিয়কুমার মজুমদার 'রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা', "উপনিষদে আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তা"।

১২। Ruth Reyna: Renicarnation and Science.
"Time is not motion but is a kind of number and is, the substratum of motion."

১৩। Ruth Reyna: Reincarnation and Science.
"In the relativity theory the concept of field is applied and the basic picture in that of continuous process taking place in the continuum of space and time."

১৪। বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলী তৃতীয় খণ্ড।

১৫। বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলী তৃতীয় খণ্ড।

১৬। শ্রী রমা চৌধুরী—রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা।

১৭। বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলী—তৃতীয় খণ্ড।

১৮। সাধন কুমার ভট্টাচার্য—সাহিত্যতত্ত্ব।

১৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বিচিত্র প্রবন্ধ।

২০। আবু সয়ীদ আইয়ুব—অমঙ্গলবোধ ও রবীন্দ্রনাথ।

২১। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—আত্মার অবিনাশিতা।

২২। E. B. Havell: Art heritage of India.
"Yogas was not and is not practised merely as a spiritual exercise leading to the beatifie vision. It claims to be a psychological process of drawing into oneself the dynamics or the logos which controls the Universe and to be adaptable for all kinds of mental and physical activity. It inspired the artist, poet and musician as well as the mystic who sought spiritual enlightenment. It gave the craftsman his creative skill and the Soldiers perfect control over his weapons, the statesman his farseeing vision, the seer and inspired thinker his supernatural powers."

২৩। E. B. Havell: Art heritage of India.
"Indian art is essentially idealistic mystic, symbolic and transcendental. The artist is both priest and poet."

২৪ । Croce: Aesthetics.

২৫ । Mrs. Sussane K. Langer: Mind: An essay on human feeling
"Words are our most powerful symbols; their use is universal, constant, as natural to man as walking on only two limbs; nothing can hold him to an unchanging standard of verbal expression, as long as he finds that he can, in fact, use words in highly unusual ways and still be understood."

২৬ । সুকুমার সেন : চর্যাগীতি পদাবলী

২৭ । Vinoytosh Bhattacharyya: An Introduction to Buddhist Esoterism.

২৮ । Richard Ogden: Meaning of meaning.
"Thus any reference to human activities which are neither theoretical nor practical tends to be symbolised by the word aesthetic and derivatively anything which we are not merely concerned either to know or to change tends to be described as beautiful.

২৯ । Richard Ogden: Meaning of meaning.

৩০ । Maxmiller: I believe that it would really be of the greatest benefit to mental science, if all such terms as impressions, sensations, soul, spirit and the rest could for a time be banished and not be readmitted till they had undergone a thorough purifications.

৩১ । Mathew Arnold (Richard Ogden: Meaning of Meaning).
"Terms thrown out, so to speak, at not a fully grasp object of the speakers consciousness."

৩২ । Russell: The problem of meaning of the word is reduced to the meaning of images."

৩৩ । Sri Aurobindo: The essence of poetry.
"In thought for instance, there is the intellectual idea, that which the inlelligence makes precise and definite to us into nearness of identity with the whole reality of the thing expressed. Equally in emotion, it is not the mere emotion itself the poet seeks, but the soul of the emotion, that is it fot the delight of which the soul in us

and the world desires or accepts emotional experience."

৩৪। ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্ত—কাব্যালোক।

৩৫। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—দ্বিজেন্দ্রগীতি।

৩৬। শ্রী বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়—সাহিত্য দর্পণ।

৩৭। Mrs. Sussane Lenger: Mind, An essay on human feeling.
"This last fallacy is most serious Artistic import requires no interpretation; it requires a full and clear perception of the presented form, and the form sometimes needs to be construed before one can appreciate it. To this end interpretation of verbal material of representational compositions may be useful even necessary. But the vital import of a look of art need not and cannot be derived by any exegesis, such a process, destroys one's perception of import."

৩৮। Arnold Schoenberg: Style & Idea.
"So direct and unpolluted and pure a mode of expression is denied to poetry, an art still bound to subject matter."

চতুর্থ অধ্যায়

১। E. B. Havell: The art heritage of India.

২। শ্রী ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী—ভারতে হিন্দু মুসলমানের যুক্তসাধনা।

৩। শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বিচিত্র প্রবন্ধ।

৪। শ্রী রাজ্যেশ্বর মিত্র—মুঘল ভারতের সংগীত চিন্তা।

৫। শ্রী বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়—পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পের কাহিনী।

৬। শ্রী বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়—পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পের কাহিনী।

৬ক। Mrs. Sussane Langer : Reflections on art.
"Each work of art is based on the original contract between form and content, which is mastered and brought to rest by the artist."

৭। শ্রী নন্দলাল বসু—শিল্পকথা।

৮। Herbert Read: The meaning of art.
"Our homage to an artist is our homage to a man who by his special gifts has solved our emotional problems for us."

৯। শ্রী সাধনকুমার ভট্টাচার্য—নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা।
১০। শ্রী অজিত ঘোষ—নাটকের কথা।
১১। Aristotle: Plot, Character, Direction, Thought, Spectacle and Melody.
১২। Shri Manomohan Ghosh: On the origin of Hindu Drama.
১৩। শ্রী অজিত ঘোষ—নাটকের কথা।
১৪। শ্রী সুধীর নন্দী—নন্দনতত্ত্ব।
১৫। শ্রী অজিত ঘোষ—নাটকের কথা।
১৬। Compton Rickett:
"Sense of mystery, ennberant intellectual curiosity, an inistinct for the elemental simplicities of life."

১৭। Slegel: Dramatic Literature.
"All contrarieties, nature and art,....spirituality and sensuality, terestrial and celestial, life and death, are by it blended together in the most intimate combination."

১৮। সাধনকুমার ভট্টাচার্য—নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা।

১৯। Nicoll: The Theory of Drama.
"Tragedy then, we may say has for its aim not the arousing of pity, but the conjuring up of a feeling of awe allied to lofty grandene."

২০। Gerardus Van Der Leeuw: Secred & profane beauty.
"Kier Kegaard saw the perfection of art in its growing free of space in order to turn to time; in other words art is the mare perfect the mare purely if in movement, progressing from space to time, sculpture becomes painting. Music done has time as an element, but it is lost, since it has no ground on which to stand.....Thus poetry is perfect art because unlike painting, it does not have to limit itself to the moment; but neither does it vanish with time, as does music."
২১। A.K. Coomarswamy: Christian and Oriental Philosophy of art.

২২। The British Journal of Aesthetics.

A.J. Ellis: Intention and Interpretation in literature.

What would happen if we were to discover that our reading of a poem was in general completely at variance

with that of the author, that there was no connection between the way poets intended their poems to be read and the way their readers did in fact read them?

২৩। Briish Journal of Aesthetics.
Ina Loewenberg: Intention: The speaker and the artist.

২৪। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতবিতান।

২৫। The British Journal of Aesthetics.
Howard Davis: Poetry and the voice of Michael Oabeshott.

২৬। Michael Oabeshott: The voice of poetry in the conversation of mankind.

২৭। Shri Kanti Pande: Comparative Aesthetics.

২৮। F.E. Halli day: Fine arts.
"Discipline, synthesis, dignity and the subordination of parts to the whole. Its appreciation will encourage a sense of realism anddiscourage sentimentality without freering the fancy or nipping playful impulses. Its enjoyment is inseparable from a realization of the pleasures and merits of craftsmanship which however, it will encourage the student to see as means not ends.

২৯। Shri Kanti Pande: Comparative Aesthetics.

৩০। Shri Kanti Pande: Comparative Aesthetics.

৩১। Shri A.K. Coomarswamy: Christian and oriental Philosophy of art.

৩২। Edward J. Dent: The future of music.
"The essential Joy of music was destroyed by knowledge"

৩৩। Wagner on Music & Drama: Selected by Albert Goldman and Evert spring chorn.
"She can set moods and feelings side by side but not evolue one mood from out another by any dictate of her own necessity she lacks the moral will."

৩৪। F.E. Halliday: Fine arts.

৩৫। A.K. Coomarswamy: Christian and Oriental Philosophy of art.

৩৬। শ্রীনন্দলাল বসু : শিল্পকথা।

৩৭। Edward J. Dent: The future of music
"From the Historian's point of view everything in worth preserving as historical document, but if we judge works of art from a purely aesthetic standpoint can we honestly say that the art of the past has any value for us?

৩৮। Mrs. Susane Langer: Reflections on art.
"Each work of art is based on the original contrast between form and content, which is mastered and brought to rest by the artist."

৩৯। Edward J. Dent: The future of music.
"As music becomes more and more one of the moral delights of cultural life, it becomes less and less of a mystery and more of a conscious art."

পঞ্চম অধ্যায়

১। Shri Kshitimohan Sen: The medieval mysticism of India.
"Indian natural devotion and love of God received a rude shock from the political power of Islam and this shock together with its new kind of aggresive monotheism and struck faith,brought awakening to the indigenous natural love and devotion and the monotheism that already inisted in the land from a heavy antiquity."

২। Shri Kshitimohan Sen: The medieval mysticism of India.
"The soul of India is as it were, changing body after body and is taking new forms as a part of its quest of salvalion by this Sadhana."

৩। বিবেকানন্দ রচনাবলী দশম খণ্ড।

৪। বিবেকানন্দ রচনাবলী দশম খণ্ড।

৫। বিবেকানন্দ রচনাবলী দশম খণ্ড।

৬। বিবেকানন্দ রচনাবলী দশম খণ্ড।

৭। E.B. Havell: Art heritage of India.

৮। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস।
৯। A.A. Bake: The appropriation of Siva's attributer by Devi.
(Bulletin of school of oriental and African studies, University of London).
"Siva emerges first as a recognised divinity, and he rules alone. It is fascinating to see how, subsequently Devi gradually usurps his powers and prerogatives. Siva without Sakti is said to be but an incert mass. Overlordship is only possible to Siva when united with Sakti."
১০। সুকুমার সেন—চর্যাগীতি পদাবলী
১১। সুকুমার সেন—চর্যাগীতি পদাবলী
১২। সুকুমার সেন—চর্যাগীতি পদাবলী
১৩। শশীভূষণ দাশগুপ্ত—ভারতীয় শাক্ত সাহিত্য ও শক্তিসাধনা।
১৪। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—বাংলার বাউল ও বাউল গান।
১৫। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—বাংলার বাউল ও বাউল গান।
১৬। শ্রীউপেন্দ্রকুমার দাস—ভক্ত কবীর।
১৭। শ্রীউপেন্দ্রকুমার দাস—ভক্ত কবীর।
১৮। শ্রীমণিলাল সেন—বাংলায় সংগীতের ইতিহাস।
১৯। শ্রী শশীভূষণ দাশগুপ্ত—ভারতীয় শাক্ত সাহিত্য ও শক্তিসাধনা।
২০। শ্রী শশীভূষণ দাশগুপ্ত—ভারতীয় শাক্ত সাহিত্য ও শক্তিসাধনা।
২১। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—সাধক কমলাকান্ত।
২২। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—সাধক কমলাকান্ত।
২৩। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—সাধক কমলাকান্ত।
২৪। শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—গীতিলহরী।
২৫। সুকুমাব সেন — চর্যাগীতি পদাবলী।
২৬। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—পদাবলী পরিচয়।
২৭। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—পদাবলী পরিচয়।
২৮। শ্রীঅরুণ বসু—রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা (মাঘ—চৈত্র ১৩৭৯) ব্রহ্মসংগীত—ব্রাহ্ম সমাজ
২৯। শ্রীঅরুণ বসু—রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা (মাঘ—চৈত্র ১৩৭৯) ব্রহ্মসংগীত—ব্রাহ্ম সমাজ

৩০। শ্রীকাঙালীচরণ সেন—ব্রহ্মসংগীত স্বরলিপি চতুর্থ খণ্ড।
৩১। শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র—বাংলার গীতিকার ও বাংলা গানের নানাদিক।
৩২। শ্রীঅরুণ বসু—রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা (মাঘ-চৈত্র) ব্রহ্মসংগীত ও ব্রাহ্মসমাজ।
৩৩। শ্রীক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী—ভারতে হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা।
৩৪। রবীন্দ্ররচনাবলী—চতুর্দশ খণ্ড (সংগীত)।
৩৫। রবীন্দ্ররচনাবলী—চতুর্দশ খণ্ড (সংগীত)।
৩৬। রবীন্দ্ররচনাবলী—চতুর্দশ খণ্ড (সংগীত)।
৩৭। রবীন্দ্ররচনাবলী—চতুর্দশ খণ্ড (সংগীত)।
৩৮। আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলার লোকসাহিত্য।
৩৯। রবীন্দ্ররচনাবলী—সংগীত।
৪০। শ্রীক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী—ভারতীয় সংগীতে হিন্দুমুসলমানের যুক্ত সাধনা।
৪১। শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর—রবীন্দ্রনাথের গান।
৪২। শ্রীশুভ গুহঠাকুরতা—রবীন্দ্রসংগীতের ধারা।
৪৩। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ—রবীন্দ্রসংগীত।
৪৪। বিনয়েন্দ্র দাশগুপ্ত—অতুলপ্রসাদ।
৪৫। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অতুলপ্রসাদের জীবন ও সৃষ্টি
রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা।
৪৬। শ্রীঅরুণ বসু—রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা—কবি অতুলপ্রসাদ সেন।
৪৭। শ্রীদিলীপ রায়—সাংগীতিকী।
৪৮। শ্রীদিলীপ রায়—দ্বিজেন্দ্রগীতি।
৪৯। শ্রীআবুসঈদ আইয়ুব—বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন ১৩৮১।
৫০। The British Journal & Aesthetics:
Christopher C. Norris: Music & Pure thought
The symphonies of shostakovich, especially the more recent ones, are evidence enough of the paradoxically private complications of empression which ensure from the acceptance or imposition of any such limiting aesthetic programme. Dialectical thinking must allow, on the contrary, for the mediation of cultural history both by the present forms of critical reflection and by the past,

contributory structures in which its grov th is mirrored. From the diagnostic point of view Soviet music would provide a separate and ironic chapter of the critical project.